হীরক রায়

পরম সুহৃদ্বরেষু

অন্যের সুখে যিনি সুখী

অন্যের দুঃখে দুঃখী

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের আর একটি উপন্যাস

সতী অসতী

তিন সম্পাদ

১৯৫৭ সালের গ্রীষ্মে বেতার জগতের সম্পাদক সুভাষ বসু বাড়ি এসে একদিন উপন্যাস চাইলেন। শারদীয়ার জন্যে। খুব আন্তরিকভাবে। একটা ফর্মে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হল। অন্য শেষ রজনী এখন যা—শারদীয়ার জন্যে তার প্রায় অর্ধেক লিখেছিলাম। বিবিধ ভারতীর বিজ্ঞাপনে আমার নাম বলা হতে থাকলো। আমি লিখছি।

তারপর একদিন সুভাষ বসু ডাকলেন। বললেন, এ উপন্যাস ছাপতে পারবেন না। চলতি একটি নাটকের অভিনেতা, অভিনেত্রী নাকি আমার লেখার চরিত্র হয়ে উঠেছে। এমনকি নাটকের গান এ উপন্যাসে এসেছে।

বললাম, তা কি করে হয়? ব্রহ্মার মত দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড ক'জন বানায়? লেখক অনেক জিনিস দেখে। লেখার ভেতর গিয়ে তা অন্য জিনিস হয়। সিমলেস পাইপের মত। কোথায় জোড়—কেউ খুঁজে পাবে না। ও গান তো বিনোদিনীর। বোধহয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বেধেছিলেন।

দেখাতে চেয়েছি—উঠতি চাকায় চড়ে গ্রুপ থিয়েটার যখন সাফল্যে পৌছোয়—তখনি চাকা পড়তির মুখে। সেটাই শেষ রজনীর দিকে যাত্রার শুরু। মঞ্চের নাটকের চেয়েও নাটকের মানুষগুলো নিয়ে গ্রীণরুমে আরও বড় নাটক হয়ে যায়। সে নাটকের নায়ক স্বয়ং নিয়তি।

বুঝলাম, এত কথা সরকারী সম্পাদককে বলা অর্থহীন। সুভাষ বসু বলেছিলেন, তিনি একসময় মোরারজী দেশাইয়ের প্রেস-বিষয়ক সচিব ছিলেন। ভদ্রলোক নস্যি নেন। কথা আনুনাসিক। আমার তো খুব আন্তরিক মনে হয়েছিল গোড়ায় গোড়ায়।

বেতার জগতে নাম দিয়ে বিজ্ঞাপনও বেরিয়ে গিয়েছে। কি করা যায়? পাণ্ডুলিপি নিয়ে ফিরে এলাম।

তখন জরুরী অবস্থা সবে জারি হয়েছে। আমি কলকাতার গায়ে একটা নতুন জায়গায় ধান চাষে নেমেছি। রোজ তাই নিয়ে ব্যস্ত। আগেকার খামারেও কাজ চলছিল। কৃত্তিবাস পত্রিকার জন্যেও খুবই ব্যস্ত থাকতে হোত। ধান রোয়ার সময় কাজের ওপর নজর রাখতে রাখতে অনেকদিন গাছতলায় টেবিল চেয়ার পেতে বসে লিখেছি। স্টেজের ধুলো সামান্যই মেখেছি। সেটুকু সম্বল করেই এ লেখা। শীতলদের বাগানে।

একদিন পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে অবাক। সুভাস বসু আমাকে না বলে যত্রতত্র লাল কালি দিয়ে কেটেছেন। উপবস্তু শব্দ পাল্টে দিয়েছেন।

নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। ভগ্যিস এ অবস্থায় লেখাটি ছাপা হয়নি। হলে বিপদে পড়তাম। সুভাষ বসুকে ফোন করলাম। তিনি বলেছিলেন, বোঝেনই তো—এমারজেন্সি—

চুমু কেটে চুম্বন করেছেন কেন?

আমাদের ম্যানুয়ালে তাই হল নিয়ম। সারা লেখায় আপনি একবারের বেশি ফ্রি লাভ প্রিচ করতে পারবেন না। বলেছিলাম তো শ্যামলবাবু—সেক্স্, পলিটিক্স্ বাদ দিয়ে একটা ফুরফুরে মিষ্টি প্রেমের গল্প লিখে দিন।

কি আব বলব! এরকম লোক নানা জায়গায় বসে আছে। আমার উপন্যাস তো সরকারী ফাইলের নোট কিংবা পরীক্ষার প্রিসি রাইটিং নয় যে, লাল কালি দিয়ে কেটে বিষয়বস্তুর উন্নতি ঘটানো যাবে। ইন্দিরা গান্ধী বেতার জগতের সম্পাদক হলে নিশ্চয় এ-কাজ করতেন না। এরকম কত সুভাষ বসু কত জায়গায় বসে আছে। এরাই তো এক একটা সরকারকে ডোবায়। আমার গেছে পাণ্ডুলিপির ওপর দিয়ে। অন্য অনেকেব তো প্রাণ দিয়ে দাম দিতে হয়েছে। আমার এখনো ইচ্ছে আছে, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বলি—কি সব লোক বসিয়ে রেখেছিলেন—কেমন অবলীলায় এরা উপন্যাস খুন করে।

স্কন্ধকাটা পাণ্ডুলিপিটা পড়েই ছিল। ১৯৫৭ নানা কারণে খুব খারাপভাবে দেখা দিল। সে-সময় সাপ্তাহিক অমৃতের শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্র রায় মহাশয়কে ফোনে লেখাটির কথা বলি। তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠাতে বললেন। তারপর একদিন ফোনে জানালেন ছাপছি—বাকিটা লিখে ফেলুন। দুঃসময়ে তাঁর এই সহানুভূতির জন্যে আমি চির-কৃতজ্ঞ। লেখা—লিখি। লিখে থাকি। ছাপাও হয়। বই হয়। এটা কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু সেইসময় মণিদার এই সহানুভূতি ও স্নেহ আমাব খুবই দরকার ছিল। সেদিন তিনি এই বুস্টার না দিলে আমি এ-লেখা নিয়ে আবার বসবার কথা ভাবতে পারতাম না। সেই খারাপ সময়ে তিনি ছাড়া আর কেউ আমার জন্যে এগিয়ে আসেন নি।

এর কিছু পরেই অবশ্য শ্রদ্ধেয় মধুসূদন মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে এই সুভাষ বসুরই আরেক কীর্তির জন্যে ঘনিষ্ঠ হলাম। সেকথা পরে অন্যে বলছি।

কাটা সৈনিকের দশা পাণ্ডুলিপিকে সজুত করতে ভয়ঙ্কর ভুগেছি। ভুগেছে, অদ্ভুত। ভুগেছেন ব্রজকিশোর মণ্ডল। বই আকারে ছাপতে গিয়ে। তবু আমার আসল পাণ্ডুলিপির খানিকটা আর উদ্ধার করতে পারিনি। কারণ, এরই ফাঁকে সে

—'দোষ কি! একটা আন্‌ক্যানি ব্যাপার তো বটে অডিয়ান্স আলাদা স্বাদ পায় তো—'

—'আপনার মুখ তখন স্বয়ং ডেথ। স্থির নিষ্পলক চোখ। অমোঘ নিয়তির মত। কোন নিস্তার নেই।'

তারপর থেকে সোস্থাল বইতে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় হেয়ার স্টাইল পালটে দিয়েছে। দু'টো কলারবোনের মাঝখান থেকে সিধে উঠে যাওয়া তাগড়াই গলা, কালো কোঁকড়া চুলের মাথাটা কম রোবাস্ট—কিছু নরম আর ঘরোয়া দেখাবার জন্যে সামান্য কুঁজো, ধীরস্থির ভঙ্গীটা রীতিমত প্র্যাকটিস করে রপ্ত করতে হয়েছে অমিয়কে।

পরাজিত পিতা এবার অডিয়ান্সের দিকে পুরো চোখ তুলে তাকালো। আজ টুয়েলফথ নাইট। মুখে ডায়ালগ। জায়গামত পজ। আবার সংলাপ। একটু থেমে থাকা। অ্যাকশন। হেরে যাওয়া ফেরিওয়ালার চোখ একেবারে শেষের সারিতে। গরমে ঘামের একটি বড় ফোঁটা পাথুরে চিবুকের একদম নিচে এসে টলটল করছে। যে কোন সময় বৃষ্টি হয়ে টুপ করে স্টেজে খসে পড়বে।

ফাঁকা চেয়ার। শুধু ফাঁকা চেয়ার। আর পারা যায় না। খুব বেশি দু'শো সিট ভর্তি হয়েছে। এগঝস্ট্ পাখা এই ক'টা লোকের নিঃশ্বাসও ভালোমত বের করে দিতে পারছে না। নামেই ওপেন এয়ার। মাথার ওপর ত্রিপল। অডিটোরিয়াম জুড়ে মানুষের নিঃশ্বাসে নিরেট গুমোট। এখনো ছ'টা সিন। পাছে অন্যমনস্ক হয়ে যায় এই ভয়ে অমিয় আবার ফেরিওয়ালায় মগ্ন হয়ে গেল।

ডায়ালগ বলতে বলতে অমিয়র পরিষ্কার মনে পড়ল—বাইরে গেটের মাথায় হোর্ডিংয়ে বড় বড় করে লেখা আছে—

ফেরিওয়ালার মৃত্যু

নাটক ও নির্দেশনা

অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

তার নিচে কন্ট্রাস্ট রঙে গ্রুপের নাম লেখা—

পঞ্চমুখ

নগর-

বারো রাতেই স্যুটের ক্রিজের দফারফা। ঘাম, গরম। ভাল করে আয়রন করা হয় নি। শো-এর পর কোনরকমে ভাঁজ করে আর পাঁচটা ড্রেসের সঙ্গে স্টিলের ট্রাঙ্কে ঠেসে ভরে নিয়ে পাশের উলের দোকানীর ঘরে জমা রেখে যেতে হবে। ফার্স্ট নাইটের পর তিনটি রিভিউ বেরোলো তিনটি কাগজে। ভালও বলে নি। বিশেষ মন্দও বলে নি। এখনো বিষ্ণু দত্ত অবশ্য লেখে নি। বলেছে, একশো নাইট হলে তবে লিখবে। এখন লিখলে সবাই বলবে বন্ধুকৃত্য। বন্ধু হলে যে কত সাবধানী হতে হয়। ভালবাসলে যে কত কশাস হতে হয়। কিন্তু আর কবে লিখবে! রোজ তো টিকিটের সেল ফল করছে। রবাতে আর বিশেষ নাইট নেই কিন্তু বিষ্ণু! এখন আলো নিবিয়ে বেরিয়ে যাবারও উপায় নেই। দশ জনের অডিয়েন্স হলেও শেষ সিনের শেষ ডায়ালগটিও বলতে হবে। তারপর ড্রপসিন। নয়ত দশ আর দু'শ টিকিট বিক্রি হওয়া একই। ভাড়া উঠবে না হলের। তারপর প্রেস পাবলিসিটির খরচ তো আলাদা। টিফিন আছে। বাসভাড়া আছে। রিহার্সেলের খরচ ভুলে যাওয়াই ভালো।

শেষ সিনের পরেও প্রায় দু'ঘণ্টা। আলো, ড্রেস, টেপের বাক্স ঠেলায় চাপিয়ে চণ্ডীদাকে ভজিয়ে দিয়ে বেরোতে বেরোতে অমিয়র সেই লাস্ট বাস। ডবল ডেকারের দোতলায় জানলার পাশেই অন্ধকার ময়দান। খোলা বুকের ভেতরে হাওয়া ঢুকতে পেরে পাঞ্জাবি এখন একদম বেলুন। বাসটা এখন পালতোলা নৌকোর মতো চলে।

বাস থেকে নেমে তিন মিনিট। তিনের পাঁচ মহেন্দ্র রোড। উল্টো দিকে কলকাতার সেই বিখ্যাত প্রাস্তিক খাল। এখন অন্ধকারে তার নীল জল দেখা যাবে না। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে লীলাকে জাগাতে হল না। জেগেই ছিল। চাঁদ থেকে একটা মেটে আলো ঝুলবারান্দা অবধি এসে পড়েছে। সেখানে মাদুর পেতে বসেছিল লীলা। অমিয়কে ওপর থেকেই দেখতে পেয়েছে। উঠে এসে দরজা খুলে দিল। সুইচ টিপে আলো জ্বালালো।

একখানা বড় ঘর। পাশেই ছোটমত ঘর। সরু ফালির করিডর। তার গা দিয়ে কলঘর, গ্যাসের উনুন, কাঠকয়লা, ঘুঁটের বস্তা, আলনা, টেবিলের ওপর লীলার স্কুল থেকে আনা দেখা-খাতার বাণ্ডিল। সব। সব কিছু এই এক ফালি করিডরে ঢাকতে হয়।

বড় মেয়ে অনু এবার এইট। মাঝে ছেলে। বিন্টুর সেভেন চলছে। ওরা পিঠোপিঠি। তারপর ছোটোন। পিতৃমুখী মেয়ে। একদম অমিয়র মুখখানা বসানো। তিন প্রাণীই ঘুমোচ্ছে।

কোন শব্দ না করে ছোট ঘরখানার মেঝেতে দু'জনে খেতে বসল। শুধু এই সময়টা লীলার সঙ্গে অমিয়র দেখা হয়, কথা হয়। খাওয়ার অর্ধেকটা পার হয়ে লীলার মুখে যে-প্রশ্ন উঠে আসছিল তা আর লীলাকে কষ্ট করে বলতে হল না। অমিয় নিজেই বলল, 'এ নাটকও তুলে দিতে হবে।' তারপর কী ভেবে বলল, 'কোথায় গণ্ডগোল বুঝতে পারছি না। কেন পাবলিক নিচ্ছে না জানি না—'

—'আজ দুপুরে তোমার খাতা খুলে পড়েছি।'

অমিয় প্রায় লাফিয়ে উঠলো, 'পড়লে কেন ? ওতে আমার লেখা আটকে যায়।'

লীলা তা জানে। লেখা শেষ না হলে অমিয় কাউকে দেখায় না। সে সব নাটকের বেলাতেই। এই 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' লিখে ছিল পনর দিনে। একটানা। একটা বিদেশী গল্পের আদলে। খানিক লেখে আর ডায়ালগ আওড়ায়।

—'আটকাবে না গো। তোমার এই নাটক পাবলিক খুব নেবে, দেখো।'

—'আর নেবে ! নাটক নামানোর আর পয়সা পাব কোথায় ?'

—'হয়ে যাবে। দেখো তুমি।'

—'হুঃ ! আর তো তোমার গয়না নেই। ভাল কথা—আজ রেশন আনলে কি দিয়ে ?'

—'তেতলার দাশদা নিজের রেশন আনতে যাবার সময় আমাদের রেশন কার্ড, থলে নিয়ে গেলেন। তুমি টাকা দিয়ে যাও নি ? আমি ভেবেছি—'

—'না তো।'

—'দেখেছো। কী কাণ্ড !'

খাবার পর সিগারেটে সুখটান দিয়ে বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অমিয় অন্ধকারে খালের জল দেখতে চেষ্টা করছিল। লীলা পাশে এসে দাঁড়াল। 'তোমার এ নাটক খুব জমবে। আমি বলে দিচ্ছি।'

—'টাকা না হয় আবার ধার করে জোগাড় হল। অবিশ্যি এবার কে ধার দেবে জানি না। আজ যদি চাকরিটা থাকত।'

—'থেকেও লাভ ছিল না কোন। তোমার শোয়ের দিন ঠিক আবার কাটা-নগর নয়ত বনগাঁয়ে ডিউটিতে পাঠাতো।'

—'পাঠালেও গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ভেঙে আমার নাটক নামাতে

পারতাম। আবার গ্যাম্বেল করতাম। এখন কে আর দেড় হাজার টাকা মাইনের ওষুধ কোম্পানীর চাকরি আমায় দেবে বল। দেড়শো টাকার চাকরিই জুটছে না লোকের।'

—'তাতে কি। আমার তো চাকরি আছে। অবিশ্যি দশ বছর না হলে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে হাত দেওয়া যায় না স্কুলে—'

কথা বলতে বলতে লীলা কখন অমিয়র পিঠে হাত রেখেছে। গা কিছু গরম। বিশ্রাম খুব কম পায় মানুষটা। আগের চাকরিটার পি এফ, গ্র্যাচুইটি ভেঙে সালকিয়ায় 'শীশমহলে' নাটক নামিয়ে ছিল। বারো হাজাব টাকা দেনা হয়ে যেতে বেরিয়ে এল।

তখন লীলা ভাগ্যিস পার্মানেন্ট হয়ে গেছে স্কুলে। নয়ত—

নিজের মনে মনেই চোখ বুজে ফেলল লীলা। 'তুমি এই নাটক ধর এবারে।'

—'তার আগে যদি ব্যবসার টাকাগুলো বাজার থেকে তুলতে পারতাম—'

—'ও টাকা আর তুমি পাবে না।'

—'কেন যে লোকে দেয় না।'

—'অনেকগুলো টাকা। তাই না!'

—'হুঁ।' মনে মনে হিসেব করে দেখছিল অমিয়। শীশমহল থেকে বেরিয়ে এসে কিছুদিন ব্যবসা করেছিল। আলতা, লেখার কালি, ফিনাইলের ব্যবসা। বাকিতে দিয়ে আসতে হত দোকানে দোকানে। বিক্রি হলেও দু'টাকা পাঁচ টাকা করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিত। শেষে ক্যাপিটাল শর্ট। অনেকগুলো টাকা পড়ে আছে। পাওয়া গেলে নতুন নাটক স্বচ্ছন্দে নামানো যেত।

লীলা বলল, 'টাকা না হয় পেলে। কিন্তু অমন মেয়ে পাবে কোথায়?'

—'সবটা পড়েছো? এখনও তো শেষ হয় নি লেখা।'

—'হুঁ। করতে পারলে কিন্তু লোক ভেঙে পড়বে। দেখো তুমি।'

—'কিছু বলা যায় না।'

—'এ-নাটক তোমার হিট হবেই। হিরোইন বেসড্ নাটক। জীবনের রোলে তুমি নামবে। পাবলিক যত বিরক্ত হবে তোমাকে দেখে—নাটক তত হিট হবে। আর সব সিমপ্যাথি গিয়ে পড়বে সুজাতার ওপর। হোক না খারাপ মেয়ে। ওর জন্যেই কষ্ট হবে পাবলিকের। কিন্তু ওই রোলের অ্যাকট্রেস পাবে কোথায় তুমি?'

অমিয় ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'খানা হাত ধরল লীলার। 'তোমার মত মেয়ে কি

পাবার কথা ছিল আমার! চাকরি নেই আমার—সংসার চালাচ্ছো তুমি: গয়নাগাটি বিক্রমপুর ভাণ্ডার। উঃ! অত ভরি সোনা! আজ থাকলে কত টাকা? এখন ভরি কত করে গো?'

—'জানি না।' বলতে বলতে লীলা তার মাথা অমিয়র বুকে নামিয়ে নিয়ে এল। চাঁদ তার আলোর পাওয়ার একটুও বাড়ায় নি। খালের গায়ে করাতকলের মোটা গোলাইয়ের নম্বরী গাছের কাণ্ড সব থাকে থাকে সাজানো। কাল ভোরে লরি এসে এসে কোথায় তুলে নিয়ে যাবে। অনু শাড়ি ধরেছে আজকাল। এখন যদি উঠে এসে দেখে—অন্ধকার ঝুল বারান্দায়—কী লজ্জা! যে-কথাটা মনে এসেছিল—সে-কথা তাই মনে মনে নিজেকেই শোনালো লীলা, আরো থাকলে আরো দিতাম।

সেদিন শুয়েই ঘুম এল না অমিয়র। লীলা কিন্তু শুতে না শুতে কাদা। কত দিন বউকে আদর করে নি অমিয়। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল—কি কি কাজ বাকি আছে। কাল ভোরে উঠেই একখানা বর্ণপরিচয় কিনতে হবে। অ আ ই ঈ—আবার স্বর করে পড়তে বসবে। আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ শিখতে হবে। বাচনভঙ্গী অভিনয়ের অনেকখানি। বড়বাবুর সামনে কে যেন বলেছিল—শরৎবাবুর দেব্‌দাস। বড়বাবুর সে কি ঘুরে তাকানো! তখন আর তিনি স্টেজে নামেন না। হসন্ত কোত্থেকে এল? কথাটা তো বলতে হবে—দেবোদাস। যেমন—বিষোবৃক্ষ উচ্চারণ হবে। বিষ্‌বৃক্ষ তো নয়।

বড়বাবুর অভিনয় দেখেছে অমিয়। মাত্র একবার। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটুটে। ষোড়শী। জীবানন্দের রোলে। সেই প্রথম—সেই শেষ বার। বড়বাবুর যা-কিছু জানে অমিয়—তার অনেকটাই শোনা।

মোগোলদের কোন্ রোলে নেমে দুর্গাদাস একবার খুব কাঁধ ঝেড়ে শ্রাগ করেছিলেন। পাবলিকের ক্ল্যাপ পড়ল। বড়বাবু বলেছিলেন, 'ইতিহাসটা পোড়ো দুর্গা। ইংরেজ আগে—না, মোগোলরা এদেশে এসেছিল আগে! মোগোল কেন শ্রাগ করবে? সে কি ও জিনিস জানতো!'

মধ্যদেশ স্ফীত হচ্ছে—এই এক চিন্তা অমিয়র। আলু ছেড়েছে এক বছর হল। চায়ে চিনি বন্ধ। রোজ ভোরে পনের মিনিট আসন করে। তখন মাথাটা এত সাফ লাগে। যদি গান জানতো—তাহলে কী ভালই হত। অন্তত গুনগুন করেও নিজেকে শোনাতে পারত। আর স্টেজে তো কথাই নেই। যে-

কোন মিউজিক্যাল বই ধরতে পারত। সাহস করে ট্র্যাডিশনাল রোল করে দেখত। কবিয়াল কিংবা তরজা গাইয়ের চরিত্র করে দেখত। বড় ইচ্ছে করে। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে।

মনে মনে অন্ধকার সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল অমিয়। আজকাল হাসিটা তার ধাতে এসেছে। মুচকি হাসির বেশি সে আগে সাহস পেত না। এখন অট্টহাসি জলভাত। ইন্টিমেট সিনে হাসি মিশিয়ে কথা বললে অডিয়ান্স অনেক বেশি ভজে যায়। হাসি একটা অ্যাসেট। গাম্ভীর্য একটি থান ইট। বিষ্ণু দত্ত বলে আমার অন্যমনস্ক মুখে মৃত্যু এসে বাসা বাঁধে। লোকটা এমন এমন কথা বলে যার অনেক মানে হয়। ভেতরটা জাগিয়ে দেয়।

কত যে লাইট দরকার। সাউণ্ডের কিছু যন্ত্রপাতি। গ্রিনরুমে দু'খানা আয়না। নিজেদের একটা টেবিল ফ্যান হলে আর ঘামতে ঘামতে মেকআপ নিতে হয় না। সেই কতদূর থেকে গিয়ে রিহার্সেল রুমে শুধু মুড়ি আর বোঁদে। পেটের ভেতরটা কুই কুই করে তখন।

অমিয় জানতেও পারে নি—কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

যখন ঘুম ভাঙলো—তখন তো সে অবাক। পরনে শাহী আদ্দির পাটভাঙা পাঞ্জাবি। সরু আলিগড়ি চোস্ত পাজামা। লক্ষ্মীবিলাস দিয়ে ড্রেসার তার মাথার কোঁকড়া চুলের ঢাল সুন্দর করে আঁচড়ে দিয়েছে। ঈগল নাকের নিচে কালো গোঁফ। পাথুরে চিবুকের নিচে ঘামের বড় ফোঁটা টলটল করছে না। এয়ারকুলার বসানো বিরাট হল। ফুটলাইটের দিকে এগিয়ে গেল অমিয়। আটশো পঁয়ত্রিশটা সিটের সব ক'টি ফুল। সাড়ে দশ টাকার রোয়ে গুচ্ছের একস্ট্রা চেয়ার দিতে হয়েছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার—সব কটা সিটে একই লোক বসে। একস্ট্রা চেয়ার ধরে প্রায় ন'শোজন বিষ্ণু দত্ত বসে। সাড়ে পাঁচ টাকার রোয়ে প্রায় তিনশো বিষ্ণু দত্ত একসঙ্গে ক্ল্যাপ দিচ্ছে। সাড়ে দশ আর তিন টাকার সিটের বিষ্ণু দত্তরা মুগ্ধ নয়নে ঝুঁকে বসে আছে—দৃষ্টি স্টেজে।

তিনজন মিউজিক হ্যাণ্ডের মাঝের জনের কাঁধে বেহালা। তার ছড়ের টান-টোনে মঞ্চে লোক ঢুকছে। বেরিয়ে যাচ্ছে।

বছর বারো-তেরোর একটি ছেলে মেডেল হাতে ছুটতে ছুটতে স্টেজে ঢুকলো। 'দাদু, আমি মেডেল পেয়েছি। দাদু—'

অমিয় ছেলেটিকে চিনতে পারল। আরে এ তো সে নিজে। অমিয়

বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাস এইট। জুবিলি স্কুলে সরস্বতী পুজোর নাইটে স্টেজ বেঁধে 'মুকুট' হয়েছিল। গোবিন্দমাণিক্য সেজে মেডেল পেয়েছে।

দাদু স্টেজে ঢুকে মেডেলটা দেখল। তারপর হাতে নিল। নিয়েই কয়লার গাদায় ছুঁড়ে দিল। 'পড়াশুনো নেই? নাটক হচ্ছে!'

স্কুলের অমিয়র সামনে দিয়ে দাদু যেমন এসেছিল তেমন এগজিট নিল। নেবার সময় একবার ফিরে তাকাল শুধু। অমিয়র দিকে নয়। স্টেজের বাঁদিকে কোণে চেয়ার পেতে টেবিলে বসে একজন মহিলা মনোযোগ দিয়ে কি লিখছিলেন। তার টেবিলল্যাম্পের আলোও খুব মৃদু।

তার দিকে তাকাতেই মহিলা ঘুরে তাকালো। মাথার ঘোমটা খসে পড়ল। এগজিটের মুখে দাদু সেই মহিলাকে বলল, 'এ জন্যে তুমিই দায়ী। তুমিই উসকেছো।'

মহিলা বললেন, 'আমি?' তারপর থেমে কারো দিকে না তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'হবে!'

ততক্ষণে দাদু স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেছে।

মহিলা ডাকলেন, 'দাদুভাই—'

অমিয় এগোলো না। টু শব্দটি না করে বড় অমিয় সবই দেখছিল।

—'না দিদু। তোমার কাছে যাচ্ছিনে। তুমি এখন কবিতা লিখছো তো! ও আমি বুঝিনে।'

—'তুই বুঝবি সবচেয়ে বেশি। দেখিস একদিন। রাগ হয়েছে?'

—'না।'

—'হুঁ। হয়েছে। দাড়া।' বলতে বলতে দিদিভাই কয়লা গাদায় নেমে পড়ল। মেডেলটা কুড়িয়ে এনে অমিয়র সামনে দাঁড়াল, হাত দু'খানা গলার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলল—'এই মেডেল নিয়ে আমি হারের লকেট করলাম। খুশি?'

ছোট অমিয় হাসল, 'খুব মানিয়েছে তোমায়।'

—'মানাবেই তো। কার মেডেল! একটা কথা বলি তোকে। দু'রকমের মাছি আছে জানিস?'

—'কি রকম?'

—'এক হল গিয়ে ময়লার মাছি। আরেক হল গিয়ে ফুলের মাছি।'

স্কুলের অমিয় অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে বড় অমিয়র হাসি পেল। শব্দ না করে মনে মনে বলল, এসব তো আমার জানা। তুমিই বলেছিলে দিদি-

ভাই। কী আশ্চর্য! মরে গিয়ে ফিরে এলে কি করে। কামিনী ফুলের গন্ধ পাচ্ছি যেন। চারদিক ভরে যাচ্ছে গন্ধে।

ছোট অমিয়কে দিদিভাই তখন বলছিল, 'তুই হবি ফুলের মাছি। জানিস তো, মানুষের ভেতর নিরানব্বুই ভাগ হল গিয়ে জন্তু। বাকি একভাগ মানুষ। তুই তাই হোস। বুঝলি কিছু! তোর বাবা না কেমিস্ট। কি সব মিশিয়ে কি সব বানায়। অনেক জিনিস মিশে গিয়ে নতুন জিনিস হয়। তুই সে-রকম নতুন জিনিস হয়ে যা—'

সারা হল জুড়ে সব বিষ্ণু দত্ত একসঙ্গে ক্ল্যাপ দিয়ে উঠলো।

বড় অমিয় নিজেকেই বলল, 'কি টাইমিং!'

॥ দুই ॥

মর্নিং স্কুল।

আঁচ ধরিয়ে ভোরের চা দেয় সন্ধ্যা।

আজ নিজে উঠে চা করল লীলা। শুধু নিজের জন্যে। এক কাপ। অমিয়র ঘুম ভাঙাবে না। মুখে হাসিব মত কি একটা জিনিস মাখিয়ে ঘুমোচ্ছে। বিছানা থেকে উঠবার সময় জানলা-দবজা ভাল করে ভেজিয়ে ঘরটা অন্ধকার করে দিয়ে এসেছে। পাছে অমিয়র চোখে আলো পড়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

অনু আর বিণ্টু সাঁতারে গেছে। ওরা ফিবলে বাবার সঙ্গে জলখাবার খাবে। অনুই দিতে পারবে। বড় মেয়ে এখন বড হচ্ছে। ছোটোনের ঘুম ভাঙবে সবার পরে। তখন ছুটকির বায়না সামলাবে দু'জনে। তার বাবা আর তোলা কাজেব লোক সন্ধ্যা।

লীলা আজ একটু আগেই পৌছালো স্কুলে। হনস্টলমেণ্টে যে ছেলেটি দিদি-মণিদের শাড়ি দিয়ে যায়—সে আজ খুব ভোর ভোর আসবে। বোর্ডের ডি-এর টাকা আজ পাওয়ার কথা। পেলে সেও একখানা শাড়ি নেবে। ডুরে। কালো. আর লাল ডোরা। ইনস্টলমেণ্টে নেবে। অনুর জন্যে। অনুর একদম নিজের কোন শাড়ি নেই। চান্স পেলেই তার শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

শাড়িওয়ালা ছেলেটি বেশ বলে কিন্তু। আপনার মিস্টারের অ্যাকটিং আমি দেখেছি। ছেলেমানুষ। একদম বয়স না ছোকরার। চব্বিশ-পঁচিশ হবে। বিশ-বাইশখানা শাড়ি নিয়ে হাজির হয় এক একদিন স্কুলে। ছোট্ট পুঁটলী। টিচার্স রুমের মেঝেতে যখন মোট খুলে বসে—একদম পাকা দোকানী যেন।

তার কাছ থেকে কোনদিন কেনা হয় নি লীলার। এমনভাবে লীলার দিকেই তাকিয়ে ফি-বার শুকনো মুখে ফিরে যায়। আজ কিনবেই সে। যা হয় হোক।- ভাল কথা! তেতলার দাশদাকে রেশনের টাকাটা তো দিতে হবে।

অমিয়র ঘুম ভাঙালো অনু। সুইমিং কস্টুম তারে টাঙিয়ে দিয়েছে। নিজেরটা আর বিণ্টুরটা।

অমিয় তখনো শুনতে পাচ্ছিলো, 'তুই ফুলের মাছি হোস্।'

কি আশ্চর্য! দিদিমা সেই আগের মতই আছে। একটুও পাল্টায় নি। স্বপ্নে মানুষ একরকমই থাকে। টসকায় না।

অমিয় জানলা খুলে দিয়ে রোদ নিয়ে এল ঘরে। রোজ সকালটা তার কাছে একটি করে নতুন দিনের শুরু। বড় ভাল লাগে এই সময়টা। সন্ধ্যে হলে মনে হয়—একটি দিন ফুরিয়ে গেল। খরচের খাতায় উঠে গেল।

ছুটকির সঙ্গে জলখাবারের বাটি নিয়ে বসে অমিয় তাই-না-না করে নিজে মুড়ি খেল। মেয়েকে খাওয়ালো। এই মেয়েটি তার মুখ পেয়েছে একদম। চুপ করে থাকলে বিষাদ এসে ওর সারা মুখে থানা দিয়ে বসে। তখন ওর চোখ মেলে তাকানো একদম বয়স্ক লোকের মত।

—'বাবা। আজ সকালে তুমি নাটক লিখবে না?'

—'লিখব মা-মণি। তুমি কি করবে এখন?'

—'ছবি আঁকব। স্কুলের দিদিমণির ছবি। মায়াদির ছবি—'

—'মায়া মিসকে তোমার বুঝি খুব ভাল লাগে?'

—'আমায় খুব ভালবাসে বাবা। তোমার 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' দেখেছে।' ছুটকি নিজেও দেখেছে। মায়েব সঙ্গে বসে। ফার্স্ট নাইট। নতুন নাটক নামলে লীলা দেখতে যায় পয়লা নাইটে। বিষ্ণু দত্ত যায়। বিষ্ণুর বউও যাবে।

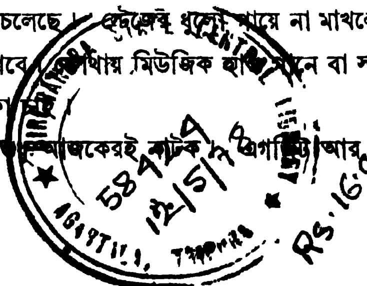
ছুটকি রঙের বাক্স নিয়ে মাদুরের কোনে বসল। অনু আর বিল্টু এতক্ষণে পাশের ঘরে পড়ার টেবিলে বসেছে। ওরা কি পড়ছে—তা আর দেখতে হয় না। এই একটা সুবিধে অমিয়দের। নে পড। পডতে বস। বলে সারাদিন পেছনে লেগে থাকতে হয় না।

খানিকক্ষণ ডট্‌পেন দিয়ে কাটাকুটি আঁকতে আঁকতে অমিয় দরকার মত জায়গায় তার পছন্দসই ডায়ালগ পেয়ে গেল।

'আমি সবসময় ভুলতে চাই—আমি কে?'

নতুন নাটকে সেই খারাপ মেয়ের মুখে লাইনটা বসালো অমিয়। লাস্ট সিন। ভীষণ টেন্স। এ সব জায়গায় সে নিজেকে নাটকের কুশীলবের একজন ভেবে নেয়। না হলে তার কলম দিয়ে হরফ ফুটতে চায় না। জীবনের রোলে সে নিজেকে ভেবেই লিখে চলেছে। স্টেজের ধুলো গায়ে না মাখলে নাটক লেখা যায় না। কোথায় লাইট লাগবে, কোথায় মিউজিক [illegible] বা সংলাপে সুর মেলাবে এর একটা আন্দাজ থাকা চাই।

আজকের নাটক শুধু আজকেরই নাটক। এগজিট আর এন্ট্রান্স দিয়েই হয়



না। প্রথম বিশ রাত সংলাপ বলতে বলতে ওয়ার্ডিং পাল্টে যায়। স্টেজকে অমিয় এই সিনে দুভাগে ভাগ করেছে। আজকাল আর মোশন মাস্টারদের দিন নেই।

ফুর্তিবাজ, আমুদে বড়লোকের বখাটে ছেলে জীবন স্টেজের ডানদিকটায় উঁচুমত বারান্দায় দাঁড়িয়ে। পাশেই শোবার ঘরের পর্দা—আলনার জামা-কাপড় দেখতে পাবে অডিয়ান্স। সুজাতা সুটকেস গুছিয়ে চলে যাবার মুখে ঘুরে দাঁড়াবে। বলবে—

'আমি সবসময় ভুলতে চাই—আমি কে? আর তুমি সবসময় আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছো—আমি কি?'

লাইনটা পুরো ক'রে অমিয় নিজেই মনে মনে বিড়বিড় করে নিল। মানে আউড়ে নিল। খারাপ মেয়ে-মানে সঠিক কারণেই যার বদনাম—এমন মেয়ে বিদায়ের মুহূর্তে সুটকেস হাতে ঝুলিয়ে এই সংলাপ দেবে। জোর পড়বে দু' জায়গায়। 'আমি কে?' আর 'আমি কি?' এই দু'জায়গায়। এই 'কে' এবং 'কি' যেন অডিয়ান্সের বুকে গিয়ে বিঁধে যায়—তবেই না সাকসেস। নইলে মাঠে মারা হবে। কিন্তু এ ডায়ালগ বলবার মত মেয়ে কোথায়! কোথায় পাওয়া যাবে? লীলা ঠিকই বলেছে। এই রোলের ওপর নাটক দাঁড়াবে। এই রোল ঝুলে গেলে নাটক ঝুলে যাবে।

আরেকটি লাইন লিখলো অমিয়। জীবনের মুখে লাইনটা বসালো।

'কেন যে অত বাড়াবাড়ি রকমের বউ বউ সাজতে গেলে। নাহলে তো কোন অসুবিধেই ছিল না।'

কেউ শুনতে না পায় এমনভাবে ডায়ালগটা বলল। মুখ তখন থাকবে অডিয়েন্সের দিকে। সুজাতা চোখের জল চেপে বারান্দার নিচে দাঁড়ানো। ভোররাতে কলকাতার ট্রেন ধরবে। তখন সে জীবনকে বলবে, 'কেউ খোঁজ করলে বলবে—সুজাতা মরে গেছে।'

আর এগোতে পারল না অমিয়। গ্রুপের একজন একজন করে এখন এই সময়টায় সবাই আসে। বিশেষ করে যেদিন শো থাকে। ছোটখাটো আলাপ-আলোচনা যা থাকে—তা সকালেই ওদের সঙ্গে সেরে রাখে অমিয়।

লম্বা চওড়া ফ্ল্যাটবাড়ি। ঘরে ঘরে পড়াশুনো। রান্নাবান্না। দাশদা বাজার নিয়ে ফিরলো। দু'হাতে দুটি ব্যাগ। একটি অমিয়দের দরজায় নামিয়ে দিয়ে যাবার সময় বলে গেল 'সন্ধ্যা বাজার নামিয়ে রেখো।' অমিয় বসে বসেই সব

দেখল। দাশদাকে ডেকে থামাতে পারত। থামালো না। লোকটা বাজার করে দিচ্ছে। রেশন আনিয়ে দিচ্ছে। একবার অমিয়কে বললো না। অমিয় কতখানি অপদার্থ—তা জেনে গেছে।

শংকর এসে হাজির। শংকর দত্ত। পঞ্চমুখের কর্মসচিব। গ্রুপের ইংরেজি প্যাডে লেখা আছে : একজিকিউটিভ সেক্রেটারি। সরু পাজামা পরে। ওপরের পাঞ্জাবি ওর ভুঁড়ি ঢাকতে পারে নি।

অমিয়র চেয়ে শংকর বছর দশেকের ছোট। স্টেজে অসম্ভব মোবাইল। অমিয় ওর জন্যে নতুন নাটকে বড় একটা রোল ভেবে রেখেছে। তার গলায় গান আছে, পায়ে নাচ আছে। ফোর্থ সিনে ড্রপ পড়ার মুখে শংকর লম্বা টানের একটা গান ধরবে। সেই টানের সঙ্গে ড্রপ পড়বে আর অন্ধকার অডিটরিয়ামে আলো জ্বলে উঠবে।

—'তোমার কথামত দৌড়োচ্ছি কিন্তু দাদা।'

—'কিরকম ?'

—'রোজ সকালে বরানগর থেকে প্রায় দৌড়ে আসছি তোমার কাছে। ফিরছিও দৌড়ে। ট্রামবাসের ইউজ ছেড়ে দিলাম।'

—'ভাত খাচ্ছিস ?'

—'শুধু একবার। দুপুরে। একশো গ্রামও হবে না। শো না থাকলে বেলেঘাটার লেকে গিয়ে সাঁতরাচ্ছি। যদি স্লিম হতাম !'

—'কি হত ?'

—'অনেক কিছুই হত।'

—'না। এই বেশ আছিস। আরেকটু কমলে অবশ্য ভাল। তোমার নাচ-গান রসিকতার ঢংঢাঙ অডিয়েন্স খুব নেয় শংকর। একটা চরিত্রের ছাপ পড়ে ওদের মনে। ছিমছাম হলে সেটা হত কিনা সন্দেহ। তুই কি চাস ? গ্ল্যামার ? গলায় হেমন্তর গান ! উত্তমের চেহারা ! বড়ুয়ার ডেলিভারি। দুর্গাদাসের ঘুরে দাঁড়ানো ? সে রকম রেওয়াজ কোথায় শংকর ? স্টেজ বড় ক্রুয়েল জায়গা। বই লিখলে একদিন না একদিন কেউ লাইব্রেরিতে পাতা উল্টে দেখবে। ছবি আঁকলে দেওয়ালে টাঙানো যায়। ছবিতে নামলে অন্তত রিলের ভেতর নেগেটিভে বেঁচে থাকা যায়—প্রিন্ট করিয়ে প্রোজেকটরে লাগিয়ে ঘোরালে আবার বেঁচে ওঠা যায় পর্দায়। কিন্তু নাটকে ?'

—'দাদা তুমি কি বলছো ?'

—'ঠিক বলছি রে। স্টেজে ভাল করলি তো ভাল। দর্শকের মনে জায়গা পেলি। সেই দর্শক একদিন বুড়ো হয়ে মরে গেলে তোর অভিনয়ের কথা বলার মত কেউ থাকল না। তুই মানে মানে তখন হারিয়ে গেলি। বড়বাবুর অবস্থাই ভাব না! চল্লিশ বছর অভিনয়ের পর তিনি এখন তো প্রায় বিস্মৃত। তাঁর দর্শকরা মরে হেজে যাচ্ছে। তাঁর কথা বলার লোক কমে যাচ্ছে রোজ। নাটক হল গিয়ে—দেহপট সনে নট সকলি হারায়—।'

– 'তা তো হল। আজ তো 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' ত্রয়োদশ রজনীতে পড়বে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কত মার খাবে? লোকে নিচ্ছে কি?'

—'সে ভাবনা আমার শংকর। পুরো একটা মাস দেখব। সামনে বর্ষা। তখন এমনিই সেল পড়ে আসে সবার। তখন তুলে দিলে গ্রুপের নামে কেউ কালি দিতে পারবে না।'

—'কিন্তু হুণ্ডিওয়ালা কি ছাড়বে! তার কিস্তি তো এসে গেল। সবার হাতই ফর্সা এখন। কি হবে বলতে পার।'

তক্ষুনি কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে অমিয় বলল, 'থার্ড সিনে শংকর তুই সামান্য গেরস্থর মেধাবী ছেলে হিসেবে যখন স্টেজে এণ্ট্রান্স নিস—তখন আরেকটু বিনয়ী—আরেকটু উজ্জ্বল, সতেজ ভাব দেখালে পারিস। রোল অনুযায়ী যেমন হয় আর কি।'

—'কেমন করব দেখাও তো।'

অমিয় উঠে দাঁড়াল। পাজামা, পাঞ্জাবির বুক খোলা। পলকে অমিয়র মুখভঙ্গী বদলে গেল। এইমাত্র সে হয়ে গেল সামান্য গৃহস্থ। কষ্ট করে ছেলেকে পড়িয়ে শুনিয়ে ভাল উকিল করেছে। অমিয়র ঘরে ঢোকা, কথা বলা—সবই পালটে গেল।

ছোটোন ছবি আঁকা থামিয়ে অমিয়কে বলল, 'নাটক করছো বাবা?'

শংকর তাকে কোলে তুলে নিল, 'হ্যাঁ মা-মণি। ইনি তোমার পিতা।' বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগল শংকর, 'আমাদের অধিপতি। কাবুল কান্দাহারের লোকজনের কাছে জটিল ঋণজালে জড়িত। পিতার একটিই স্বপ্ন: তিনি কলকাতার এক কোটি লোককে বসিয়ে একটি নাটক দেখাতে চান। একসঙ্গে এক কোটি অডিয়েন্সের ক্ল্যাপ শুনে বধির হয়ে যেতে চান। উপস্থিত দু'শো অডিয়ান্সও পাচ্ছেন না!'

অমিয় মোশোন নিয়ে শুরু করছিল। শংকরের দীর্ঘ রসিকতায় আটকে গিয়ে থেমে বসে পড়ল।

—'আজ কিন্তু হল ভাড়া ক্লিয়ার করতেই হবে।'

—'দেখি।'

—'না দিতে পারলে শো করতে দেবে না। যা ক'খানা টিকিট বিক্রি হচ্ছে, সে টাকাও না রিফাণ্ড করতে হয় শেষে।'

—'তুই যা। আমি দেখছি শংকর।'

শেভিং সেট এগিয়ে দিল ছোটোন। বড় পাতা জুড়ে নীল রঙের ওপর কালো গম্ভীর একখানা নৌকো ভাসিয়েছে। বেলা দশটার রোদে এত তাপ থাকে? শেভিং সাবানের ফেনা লেগে মুখখানা আয়নায় এখন একদম সাজাহানের। মাথায় উষ্ণীষ থাকলেই খাপ খেয়ে যেত। ফেনা মাখানো মুখের ভেতর থেকে হাসলো অমিয়। কুটেকেটে সন্ধ্যা কিসব রান্না চাপিয়েছে। কড়াই থেকে ছ্যাক-ছোক শব্দ আসছিল।

চান করে আয়নায় মাথা আঁচড়ানোর সময় সন্ধ্যা অমিয়কে ধরল। 'ভাত বেড়েছি। না খেয়ে বেরোলে বৌদি স্কুল থেকে ফিরে আমায় আস্ত রাখবে না।'

—'বলে দিস খেয়ে বেরিয়েছি।'

—'মিথ্যে বলতে পারব না।'

—'খেতে ইচ্ছে নেই রে এখন। এই তো জলখাবার খেলাম।' বলতে বলতে স্যাণ্ডেল গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল অমিয়। প্রথমে যাবে রাজাবাজারের গদিতে। আবার হুণ্ডি কাটবে। অন্তত তিনটে দিনের হল ভাড়া তো আজ সন্ধ্যের আগে দিতে হবেই।

ফুটপাথ জুড়ে ভিড়। দোকানপাটের ঝাঁপের নিচে পাতলা ক্যাম্বিশ টাঙিয়ে রোদ আটকানো হয়েছে। ট্রামবাসে ওঠা অসম্ভব। পকেটে আর ক'টা পয়সাই বা আছে। এখন হেটে হেঁটে দুর্গালালের গদিতে যেতে হবে।

দুর্গালাল একবার বলেছিল, 'অমিয়বাবু আসুন হামরা একটা যাত্রা পার্টি করি। শো খুব জমবে। বঙ্কিমচন্দরের রেহিণীকে বাঈজী বনায়ে দিন। হাপনাকে তাহলে আর হুণ্ডি কাটতে হোবে না। হামি রুপেয়া লাগাবো।

দুর্গালালেরা এখন বাংলা যাত্রায় ঢুকে পড়েছে। ছবিতে তো আছেই।

গদিতে পৌঁছতে পৌঁছতেই এগারোটা বেজে গেল। দুর্গালাল তখনো আসেনি। গদির ছেলেটা বলল, 'আসতে কুছ দেরি হোবে। বসুন না।'

সেখানে যারা বসে—তার ভেতর অমিয়র চেনা বেরোলো। নীরেন

বোসও টাকার জন্যে বসে আছে। নতুন বই ধরেছে ওরা। হল পায় নি বলে গোয়াবাগানে স্টেজ বেঁধেছে। বড় প্যাণ্ডেল। ডেকরেটরের ভাড়া রোজ কম করেও পাঁচশো।

কবে ন্যাশনাল থিয়েটার হবে—তাই নিয়ে দু'জনে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল। তাতে ক্ষোভ ছিল। ক্লান্তি ছিল। দুর্গালালের দেখা নেই। খিদে পাচ্ছিল অমিয়র। খেয়ে না বেরোনো ভুল হয়েছে। এখানে যখন টাকা হল না— তখন অন্য কোথাও ঘা মারতে যেতেই হবে। শো সেই সন্ধ্যে সাতটায়। আজ ত্রয়োদশ রজনী। আজ হাউস ফুল হবে না? অবশ্য তেরো সংখ্যাটাই বড় ট্রেচারাস।

—'উঠি ভাই নীরেন।'

—'আমার তো যাবার উপায় নেই। টাকা নিয়ে তবে গোয়াবাগানে যেতে হবে।'

অমিয় মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, 'আমারও তো তাই— শেষে খোলাখুলি বলল, 'দরগা রোডে কাবলেদের ওখানে গিয়ে দেখি একবার—'

নীরেন ওকে পেছন থেকে থামালো। একখানা কার্ড আছে। নিয়ে যা ভাই। আজ বিকেলে হিন্দি হাইস্কুল অডিটোরিয়মে 'কবিয়াল' স্পেশ্যাল শো। প্রাইম মিনিস্টার আসছেন দেখতে।'

—'নাটক দেখতে প্রধানমন্ত্রী আসছেন?'

—'কবিয়াল নাটকের কথা শুনেছেন। তাই এক ফাঁকে দেখবেন। বেলা দুটোয়। কলকাতায় বড় প্রোগ্রাম রয়েছে।'

—'দে।' কার্ডখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখলো অমিয়। অভিনেতা হিসেবে তারও একখানা ইনভিটেশন কার্ড পাওয়া উচিত ছিল। অভিমান হওয়া উচিত নয়। কার ওপর অভিমান করবে! যাদের ওপর নেমন্তন্নের ভার—তারা হয়ত অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামটা বাপের জন্মেও শোনে নি। অভিনয় দেখা দূরের কথা। তবে আমি তো কম দিন স্টেজে নামছি না। সন্দেশ। নীলরঙের ঘোড়া। অথ মালতী বৃষভ কথা। নীলরঙের ঘোড়া সত্তর নইট চলেছিল। জায়গা জুটলো না বলে আর চালানো গেল না। নইলে দর্শক তো হচ্ছিল। এখনো অমিয় ভাবে—নতুন নাটক নামাবার আগে মুখ পালটাতে হপ্তাখানেক ধরে 'নীলরঙের ঘোড়া' ঝালিয়ে নেবে।

অভিমানের জন্যে তো কত কারণ আছে। গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে আজও

তাদের 'পঞ্চমুখ' তো রবীন্দ্রভারতীর অ্যাফিলিয়েশনই পেল না। পেলে অ্যামিউজমেণ্ট ট্যাক্সের রেহাই পেতে প্রতিবার তাকে কালেকটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হত না।

বেশ ছিল জীবনটা আগে। সস্তার দিনে পনেরোশো টাকা মাস মাইনে। ডাক্তারবাবুদের চেম্বারে গিয়ে লিটারেচার মেলে ধরা। স্যাম্পেল ফাইল গছানো। দু'মাস অন্তর অফিসের কনফারেন্স—কফি ব্রেক, লান্চ, টি, কত কি! তখন লীলা ছ-সাত ভরির গয়না বানিয়ে ফেলেছিল। বাজারে কোন দেনা ছিল না। যত গণ্ডগোলের গোড়া সরস্বতী পুজোর সময় 'মুকুট' নাটকে পাওয়া সেই মেডেলটা। আচ্ছা দিদিভাই—তুমি সত্যি সত্যি যদি আমার মেডেলটা দিয়ে তোমার গলার হারের লকেট বানাতে—তাহলে দাদু রাগ করতো না?

উল্টোদিকের বাসে ভিড় কিছু কম বলে অমিয় দরগা রোডের মোড় অব্দি পৌঁছে গেল আধঘণ্টার ভেতর। রোদ্দুরে পার্ক সার্কাস ময়দান চনচন করছিল। তার গায়ের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অমিয়র মনে পড়ল, আজকের যে-থিয়েটার প্রধানমন্ত্রী দেখবেন—ওটা প্রায় বিশ বছর আগে ছবি হয়েছিল একবার। তারাশঙ্করের গল্প। ডিরেকটর দেবকী বসু। ঠাকুরঝি সেজেছিল অনুভা। তিনজনের কেউ আজ বেঁচে নেই। তখন অমিয়রা কলেজের ছেলে। চারবার লাইন দিয়ে দেখেছিল। রাজন। বসন। এসব রোল ভোলা যায়! রাজন করেছিলেন নীতিশ মুখোপাধ্যায়! তিনিও নেই। আছেন নীলিমা দাস। রবীন মজুমদার।

হাঁটতে হাঁটতে কাবলেদের আড্ডায় পৌঁছে দেখল—ভোঁ ভাঁ। কোথায় কে! কান্দাহারের ভদ্রজন প্রাতঃকালীন 'রোদে' বেরিয়েছেন। এখনো ফেরার সময় হয় নি। ছবিটা পরিষ্কার দেখতে পেল অমিয়। অফিস গেট, কারখানা ফটক, ময়দান, ডক—সর্বত্র কান্দাহারী বাবুরা দাঁড়িয়ে আছেন। দোষের মধ্যে রেটটা একটু বেশি। তাই বা বিপদের দিনে কে দেয়।

আবার হাঁটো।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুটো ভুট্টা পোড়া খেয়ে ফেলল। কাছাকাছি পৌঁছে দেখে ট্রাফিক ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রাইম মিনিষ্টার এ-পথ দিয়ে আসবেন। কালো ভ্যান। ফ্ল্যাগ লাগানো মোটর সাইকেল। তাঁকে দেখতে রাস্তায় ভিড়। দেহপট মনে সকলই মিলায়! একথা কি সত্যি?

এখন আব কোথায যাওয়া যায়।

অডিটোবিযামের চওড়া কবিডরও এয়াবকণ্ডিশন কবা। ভেতবে দাঁড়িযে ঠাণ্ডা করে নিল অমিয। হাঁটতে হাঁটতে পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে গেছে। সুন্দর কাউন্টাবে আজকেব অভিনযেব সুভেনির। আজকেব টিকিটের টাকা প্রধানমন্ত্রীব বিলিফ ফাণ্ডে যাবে। সুভেনিবের মলাটে কবি আর ঠাকুরঝি ছবি। কবিযালেব বোলে যে—তাকে অমিয চেনে। অনেকবাব তার অভিনয় দেখেছে। প্রায সমবযসী তাবা। একবাব সুনীবেব সঙ্গে কম্বিনেশন নাইটে কলামন্দিবে অমিয অভিনয কবেছে। সুন্দব গায। নাচেও ভাল।

ঠাকুবঝিব বোলে বজনী দেবী। কত দেমাস। ওব মাযেব অভিনয় অমিয ছেলেবেলায দেখেছে। দশ বছব আগেও দেখেছে। ফিল্মে। থিযেটাবেও প্রায তিরিশ বছর ধবে দাপটে অভিনয কবেছিলেন বজনীর মা—নীহাব। তিনি দেব টেবি লিখতেন না। থিযেটারেব কাগজে পড়েছে অমিয—ছবিবাবুব সঙ্গে খুব ভাব ছিল নীহাবের। দু'জন দু'জনকে বন্ধু বলে ডাকতেন। দুই বন্ধু আজ আব নেই।

বজনীব অভিনয সবাই জানে। কিন্তু অমিয কোনদিন দেখে নি। ছবিতে কেঁড়ে মাথায অনুভাব সেই লাইট বেলেব পাটি পবে হেঁটে আসা—সে-ছবি অমিযর মাথাব ভেতব আজও ঝকঝক করছে। বজনাব কি সাধ্য সে স্মৃতি মোছে।

প্রধানমন্ত্রী ঢুকলেন। সবাই উঠে দাড়াল। প্রধানমন্ত্রী সাধাবণ বাসন্তী বঙের শাড়ী পবেছেন। কী সুন্দবা। তিনি বসলেন। অডিটোবিযামে আলো নেভার সময তাঁব উজ্জল নাব ঝিলিব দিযে উঠলো। ততক্ষণে ড্রপ উঠে গিযে স্টেজ আলোয আলো।

অমিয ঝুঁকে বসে ছিল। সোজা হযে বসল। দুধেব কেঁড়ে মাথায ঠাকুবঝি বজনীব পাযেব আঙুলগুলো ফুটলাইটেব ছটায পবিষ্কাব দেখা যাচ্ছে। সুন্দর সাজানো আঙুল। মাথায ঘোমটা। ভাবি কাজলটানা চোখ।

॥ তিন ॥

প্রধানমন্ত্রী খানিকক্ষণ দেখবেন বলে এসেছিলেন। কাজের চাপ। কিন্তু উঠতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বসে দেখলেন। অভিনয়ের পর সুবীর আর রজনী ওঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। রজনী একটু ঝুঁকে নমস্কার করল। সুবীরও তাই। প্রধান-মন্ত্রী হাসলেন। হাসিমুখে রজনীর হাত একটু ধরলেন। কী যেন বললেন। অমিয় প্রায় ছ'টা রো পেছন থেকে তার কিছুই শুনতে পেল না।

তিনি বেরিয়ে যেতেই হল ফাঁকা।

ঠাণ্ডা অডিটোরিয়ামে অমিয় একা বসে। সামনেই বিরাট মঞ্চ জুড়ে দামি কাপড়ের ড্রপ। এখনো পাঁচটা বাজতে দশ। আর এক ঘণ্টার ভেতর অন্তত তিন দিনের হল ভাড়া জোগাড় করে ওপেন এয়ার থিয়েটারে পৌঁছতে হবে। নয়ত শো বন্ধ। টাকা রিফাণ্ড। সুন্দর টাইম যাচ্ছে!

অমিয়র বেরিয়ে কি মনে হল—ব্যাক স্টেজের দরজায় এসে দাঁড়াল। অনুভার ঠাকুরঝি আর রজনীর ঠাকুরঝি—দু'টো দু'রকমের জিনিস। একদম আলাদা। বড় ইচ্ছে হচ্ছিল—একবার রজনীর হাত দুখানি ধরে বলে—এমন আর হয় না। এর চেয়ে বেশি আর কি বলা যায়। মন্দ বলার ভাষা অনেক ভালো বলার ভাষা ভীষণ কম। যা বলা যায়—তা হল—ভালো। আর কি বলবে? যার অভিনয় দেখতে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী পরের প্রোগ্রাম ভুলে যান—অভিনয়ের শেষে হাত ধরে বলেন—ভালো—তাঁকে সে কি বলবে।

অমিয়র চোখের সামনেই সাজঘর থেকে রজনী বেরিয়ে এল। নীহারের মেয়ে। শুধু নীহার বললেই বাঙালী মাত্রেই চেনে। রজনীর ঠোঁটে নাকে মায়ের আদল আছে। নীহারের ছবি অমিয় সেই কোন্ ছেলেবেলায় মায়ের কোলে বসে দেখেছে।

সরু করিডরে পথ ক'রে দিতে অমিয় সরে দাঁড়াল। রজনী দু'পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, 'আপনি? কাকে চান?'

—'কাউকে না।' বলেও অমিয় নার্ভাস ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারল না। 'আপনি বড় সুন্দর করেছেন।' তারপর ফস করে বলে ফেলল, 'আমি কেউ না। আপনার দর্শকমাত্র!'

—'দাঁড়ান, দাঁড়ান। কোথায় দেখেছি আপনাকে। হ্যাঁ—কালই তো দেখলাম।'

অমিয় ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

—'ওপেন এয়ার থিয়েটারে কালই তো দেখলাম আপনাকে। 'ফেরিয়ালার মৃত্যু'-তে —তাই না—'

—'আপনি দেখেছেন? কি ভাগ্য আমাদের!' অমিয় গলে যাচ্ছিল।

—'আপনিই তো অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়?'

—'হ্যাঁ।' এতক্ষণে অমিয় পায়ের নিচে মাটি পেল।

—'চলুন। মেকআপ তোলা হয়নি। একটা ট্যাক্সি নিতে হবে। আপনার অভিনয় আমি আগেও দেখেছি। অথ মালতী বৃষভ কথায়। তাই না?'

—'হ্যাঁ। আপনাকে স্টেজে এই প্রথম দেখলাম।'

—'আগে একবারও দেখেন নি!'

—'না। অ্যান্টনিতে দেখবার ইচ্ছে ছিল। হাউসফুল বলে দু'দিন ফিরে গেছি।'

—'ওমা! তাই নাকি! একবার তো বললেন ভেতরে এসে। আপনারা দেখতে এলে কত মন দিয়ে অভিনয় করি দেখতেন—'

অমিয় জানে—কথাটা সত্যি। কেউ বলে দেখতে এলে সারাটা অভিনয় তাকেই যেন নৈবেদ্য ক'রে তার চোখের সামনে স্টেজে তুলে ধরা হয়। তখন গা ঢেলে সবটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

রাস্তাটা নির্জন। হেঁটে গিয়ে চৌরঙ্গীতে পড়লে ট্যাক্সি ধরা যাবে। প্রায় সাড়ে পাঁচটা। টাকাটা এখনো জোগাড় হয় নি।

—'সেলসম্যানের রোল কিন্তু বেশ করছেন আপনি।'

—'আপনিও তো ঠাকুরঝি করলেন। অনুভার কথা ভুলে গেলাম।'

—'ওভাবে বলবেন না।' বলতে বলতে রজনী দাঁড়িয়ে পড়ল। 'অনুভা কত বড় ছিলেন। আমায় যে কি ভালবাসতেন।' তারপর কী ভেবে রজনী বলল—'আসুন না আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে।'

—'না। আরেকদিন যাব। আপনার অভিনয় দেখতে গিয়ে কাজ মাথায় উঠে বসে আছে। আজই এখুনি গিয়ে হলভাড়া ক্লিয়ার না করলে সন্ধ্যের শো'র টাকা রিফাণ্ড করে পাততাড়ি গোটাতে হবে—' একরকম ভূতে পাওয়ার মতই বলে গেল অমিয়।

অমিয়র দিকে মুখ রজনীর। তবু অটোমেটিক যন্ত্রের মত বাঁ হাত তুলে একটা ট্যাক্সিকে খচ ক'রে থামালো। একদম শব্দ না করে দরজা খুলে পেছনের জানলার সিটে বসে পড়ল। ট্যাক্সি স্টার্ট নিচ্ছিল। হাতের ইসারায় থামতে বলে রজনী কোলের ব্যাগটার মুখ খুলে ফেলল।

প্রায় সন্ধ্যে ছ'টার কলকাতা। ট্যাক্সির ইঞ্জিনটা গজরাচ্ছিল। পেছনের জানলার পাশে অমিয় দাঁড়িয়ে।

রজনী সিটে বসেই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল—'কত?'

—'কিসের?'

—'হলভাড়া?'

—'মানে?'

—'আহা! দেরি করাচ্ছেন কেন? বলুন তো কত?'

—'অন্তত তিন দিনের। সে তো অনেক—পাঁচশোর কাছাকাছি—'

ভাঁজকরা ক'খানা নোট অমিয়র হাতে রজনী তুলে দিতেই ট্যাক্সি স্টার্ট নিল। রজনী জানলায় মুখ বাড়িয়ে বলল—'বাকিটা জোগাড় করে নিন।'

যাকে বলে ফ্যালফ্যাল অবস্থায় অমিয় নোট গুণে দেখলো—চারখানা এক শ টাকার নোট। মনে মনেই বলল—বাকিটা জোগাড় হয়ে যাবেই। টিকিট সেলও তো আছে। কিন্তু টাকাটা ফিরিয়ে দেবার চান্সও দিল না মেয়েটা।

গেটে শংকর দাঁড়িয়ে। অমিয় দূর থেকেই দেখতে পেল—শংকর [illegible] অস্থির হয়ে পড়েছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়েই প্রায় পা দাপাচ্ছে। অমিয়কে দেখে বলে উঠল, 'কোথায় ছিলে বল তো? বাড়িতে পাই নি। তুমি[illegible] গদিতে পাই নি। আর আধঘণ্টাও বাকি নেই শো-এর—'

অমিয় কোন কথার জবাব না দিয়ে খুব আস্তে বলল—'সেল কী রকম?'

—'এক টাকা, তিন টাকার সিট ফুল। আজ তোমার বিষ্ণু দত্ত গিয়ে একদম ফ্রন্ট রোয়ে বসে আছে। একদম তৈরি হয়ে এসেছে।'

—'টিকিট কাটতে দিস নি তো।'

—'আগেভাগে লোক পাঠিয়ে টিকিট কেটেছে। পাছে আমরা টিকিট কাটতে না দিই—'

—'ভালো! ভেতরে দুটো টোস্ট, একটা ডিম দিতে বলিস। দুধ দিয়ে কফি।'

—'এখুনি পাঠাচ্ছি। টাকার ব্যবস্থা হল?'

—'হুঁ।'

—'আজ হাউসফুল যাবে দেখো দাদা। আনলাকি থার্টিন, আমাদের লাকি থার্টিন!'

অমিয় কোন কথা না বলে মেকআপের আয়নার সামনে গিয়ে বসল। তারপর ড্রেসারকে দিয়ে চারখানা একশো টাকার নোট পাঠিয়ে দিয়ে তাকে বলতে বলল — 'সেলের টাকা থেকে বাকি টাকা শোয়ের পর দিয়ে দেওয়া হবে—'

ড্রপ উঠতেই কিছু স্ন্যাক্স, ঈগল-নাসা, সামযিক বৃদ্ধ ফেরিওয়ালা স্টেজ থেকে দেখতে পেল একটা টেন্স ভাব নিয়ে বিষ্ণু দত্ত বসে আছে। লোকটা পয়া। শিবিকার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অমিয় পুরোপুরি সেলসম্যান হয়ে গেল। ব্যর্থ ফেরিওয়ালা। আজ তাকে দেখতে হাউস বোধহয় ফুল হয়েছে। কালো কালো মুণ্ডু শুধু। ফ্রন্টের সাড়ে দশ টাকার তিনটে রো ফুল।

বিষ্ণুর জন্যে সবটুকু ঢেলে দিয়ে অভিনয় করে গেল অমিয়। একবার নজরে পড়ল, অডিয়েন্সের সঙ্গে বিষ্ণু দত্তও ক্ল্যাপ দিচ্ছে। থামতে চাইছে না। যে-সিনে শংকর সামান্য গৃহস্থের সন্তান, মেধাবী উকিল ছেলে হিসেবে এন্ট্রান্স নিল— সেখানে অমিয় শংকরের দাপটের অভিনয় মৃত্ত কথা ও অভ্যাসে ইঙ্গিতে তুচ্ছ করে দিতে লাগল। তখন আর বিষ্ণুকে দেখা যায় না। বিষ্ণু দত্ত বসে বসেই উঠে দাঁড়াচ্ছে

অভিনয়ে ভেঙলেও অমিয় আজ কিছু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কি যেন ফেলে এসেছে। কোন্ ডায়ালগটা বুঝি বাদ চলে গেল। ফোর্থ সিনের ড্রপের আগে অন্ধকার স্টেজে মুখ তুলে কথা বলতে বলতে ওর মনে হল—ফোকাসের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু শোয়ের শেষে পাবলিক একদম স্টেজের সামনে এগিয়ে এল। এটা ভালবাসার ব্যাপার। ড্রপ আবার উঠল। সবাইকে একসঙ্গে স্টেজে এসে গ্রুপ ফটো তোলার ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হল। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে অমিয় ভ্রূ তুলে পাবলিকের ভেতর থেকে এগিয়ে আসা বিষ্ণু দত্তকে বারণ করল। মনে মনে। উঁহু ওখান থেকে স্টেজে উঠতে হবে না। বোঝেও বিষ্ণু দত্ত। থেমে গেল। নয়ত দেওয়াল টপকানোর মত অডিটোরিয়াম থেকেই সবার সামনে স্টেজে উঠে আসছিল।

আবার ড্রপ পড়ল।

এবার আর অমিয় দাঁড়াতে পারছিল না। স্টেজেরই কোণে লাস্ট সিনের

চেয়ারটা পড়ে ছিল। তাতে বসে পড়ল। সারাদিন খাওয়াই হয় নি এক রকম। আজকে ভীষণ ক্লান্ত ছিল। তবু এত ভাল লাগল পাবলিকের? আশ্চর্য! কোন্‌দিন যে কী হয়ে যায়।

—'এই যে! কিসে ভর করেছিল? আজ একদম অন্যরকম অমিয়।'

—'কী রকম?' বলে অমিয় পাশের টুল থেকে পা তুলে নিল।

সেখানে বিষ্ণু দত্ত বসে পড়ল, 'একদম অন্যরকম। যারা দু'বার দেখেছে—তারাই বলছিল।'

—'দু'বারের অডিয়েন্সও আছে নাকি?'

—'আছে অমিয়। তোমার জন্যে অডিয়েন্স ওয়েট করে আছে। তুমি নিজেকে আরও খুলে ফেল।'

ইদানীং অমিয়ও বিষ্ণুকে 'তুমি' বলে ডাকে। পয়সা হলে একদিন লোকটাকে পেট ভরে রাম খাওয়াবে। রাম খেতে বড় ভালবাসে বিষ্ণু। ফাইভ ইয়ার্স। খুব একটা দাম নয়। বিষ্ণুকে একদিন ট্যাকসি থামিয়ে কিনতে দেখেছিল অমিয়। সেই ট্যাক্সিরই পেছনের সিটে বসে ছিল অমিয়। ট্যাক্সির বুটে তিন বস্তা বীজধান ছিল। বিষ্ণু কিছু জায়গা চাষ করে। কলকাতার কাছেই। তখন বর্ষা-কাল। আধ ঘণ্টার রাস্তা মাত্র। অমিয়কে নিয়ে বিষ্ণু তার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিল। তখনই বিষ্ণু গাড়ি থামিয়ে কিনেছিল পথে। তাই দামটা জানে অমিয়। নয়ত তার জানবার কথা নয়। ওসব খায় না অমিয়। সেদিন বিষ্ণু চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে নীট খাচ্ছিল—আর বীজধানের অঙ্কুর কি করে বেরোয়—চারা কি করে তৈরি হয়—তাই শোনাতে শোনাতে অমিয়কে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে লোকাল ট্রেনের লেভেলক্রসিং পড়েছিল একবার। বিষ্ণু নানা দিকে স্বাদ পায়।

অমিয় কি বলতে যাচ্ছিল বিষ্ণুকে। মেয়েদের ড্রেসার এসে বলল, 'দাদা আপনার ফোন।'

বিষ্ণু বলল, 'এখন আবার কে ডাকে?'

'দেখি'—বলে উঠে যাবার সময়ও অমিয় ভাবতে পারে নি—কার ফোন।

ওপাশ থেকে ভেসে এল—'হাউস তো ফুল গেল আজ।'

—'কে বলছেন আপনি?'

'আহা! ফোন করে টিকিট চেয়েছিলাম। বললে—হাউস ফুল।'

—'আপনি! আপনি দেখবেন জানলে গেটে কেউ থাকত আমাদের।'

—'তা বলছি নে। একবার দেখেছি। দেখব তো আবার অবশ্যই। কিন্তু মেকআপ তোলার পর—কী খেয়াল হল—তাই ওপেন এয়ার থিয়েটারের অফিসে ফোন করলাম। টিকিট চাইতেই ওপাশ থেকে বলল—হাউসফুল। শুনে কি যে আনন্দ হল। একটা ভাল খবর তো।'

অমিয় গম্ভীর গলায় বলল, 'এ নাটকের আজই লাস্ট নাইট গেল।'

—'ও মা! তা কেন? আজই তুলে দিলেন?'

—'স্টেজে অভিনয় করতে করতে আজই ঠিক করলাম। এখনো কেউ জানে না। আপনাকেই প্রথম বললাম।'

—'তাই বুঝি। তা কেন?'

—আপনাকে গিয়ে বলব।' ফোন নামিয়ে রাখল অমিয়। তখনো রজনা ফোন ছাড়েনি।

ফাঁকা মঞ্চে বসে বিষ্ণু দত্ত পকেট থেকে ডিমসেদ্ধ বের করে খাচ্ছিল। বিষ্ণুর এ স্বভাব অমিয় জানে। কোথাও যেতে হলে বিষ্ণু পথের ধারের ডিম সেদ্ধওয়ালার কাছ থেকে খোসাসুদ্ধ সেদ্ধ ডিম কিনে নেয় পাঁচ-ছ'টা। এখন টুলের গায়ে ঠুকে ঠুকে খোসা ভেঙে নিচ্ছিল।

—'চল বিষ্ণু, এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি।'

—'কোথায়? বলে উঠে দাঁড়াল বিষ্ণু। ক'টা সেদ্ধ ডিম কিনে নি তাহলে। বাইরে ফুটপাথে তো এখনো বিক্রি হচ্ছে—'

—'না। সেখানে তোমাকে দেখলে অনেক ভাল-মন্দ খাওয়াবে। চল।'

—'মেকআপ তুলবে না?'

—'সে একেবারে বাড়ি গিয়ে হবে। যাবো তো ট্যাক্সিতে।'

বেরোতে বেরোতে অমিয় শংকরকে সব বলে দিয়ে বিষ্ণুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। শংকর তখন সারা গ্রুপের ড্রেস, সেট, টেপ সামলাচ্ছিল।

সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যুতে ট্যাক্সি পড়তেই বিষ্ণু আর থাকত পারল না। 'কোথায় চলেছি আমরা?'

—'নীহারের ওখানে।'

—'কোন্ নীহার?'

—'নীহার একজনই হয়। ছবি বিশ্বাস যাকে বন্ধু বলে ডাকতেন।'

—'তিনি তো নেই।'

—'তাঁর বাড়িতে যাচ্ছি। রজনীর কাছে।'

—'গিরিশ পার্কের ওখানে? সেই বাড়িতে? মায়ের বাড়িতেই থাকে রজনী?'

—'তাই তো জানতাম। কলেজে পড়বার সময় দেখেছি—সকাল ন'টা নাগাদ নীহারের জন্যে স্টুডিওর গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকত।'

দোতলায় উঠে কলিংবেল টিপবার আগে অমিয় বলল, 'এই যাঃ। মেকআপ সুদ্ধ এসেছি যে।'

—'কি আসে যায়!'

অমিয় দেখল বিষ্ণু দত্ত পকেটের শেষ ডিমসেদ্ধটা রজনীর বন্ধ দরজায় ঠুকে নিল। খোসা খুলে ফেলেছে। চাপা রামের গন্ধ। মাথায় পাট করে আঁচড়ানো ঠাসা চুল। বোধহয় বিকেলে চান করেছে। সিঁথি কেটে একদম পালিশ করে চিরুনি টেনেছে যেন। অমিয় জানে, বিষ্ণু এ ভাবে মাথা আঁচড়ে সুখ পায়। ভারি ঘাড়, ভারি গাল। সাপ্তাহিক গন্ধর্ব কাগজের ড্রামা ক্রিটিক। নতুন নাটক ধরলে রিহার্সেলের সময় থেকে হাজিরা দেবে। খুব অল্পবয়স থেকে থিয়েটার দেখা অভ্যেস। বড়বাবু, দুর্গাদাস, ছবিবাবু, তারা ভাদুড়ি, ভূমেন রায়, নীহার, প্রভা, রাজলক্ষ্মী, মহর্ষি—কার অভিনয় দেখে নি বিষ্ণু।

বিষ্ণু নিজেই বেলটা টিপে দিয়ে অমিয়কে বলল, 'ফ্ল্যাট যে দোতলায়—তা বুঝলে কি করে?'

অমিয় জবাব দেওয়ার সময় পেল না। দরজা খুলে গেল। স্বয়ং রজনী। বিষ্ণুর তখন এক গ্লাস জল খাওয়ার দরকার ছিল। বিকেল থেকে ডিমসেদ্ধ খেয়ে যাচ্ছে। জল খাওয়া হয় নি একবারও। এবার যেন গলা আটকে যাচ্ছে। রজনী কি বলল তা শুনতে পেল না। আন্দাজে হাত তুলে নমস্কার করল বিষ্ণু।

এত রাতে বিষ্ণুকে দেখে কিছু অবাকই হয়েছিল রজনী। বিষ্ণুর পেছন থেকে অমিয় বেরিয়ে আসতে রজনী পরিষ্কার গলায় বলল, 'তবে যা শুনি তা ঠিকই!'

—'কি শোনেন?'

—'ভেতরে আসুন। বসুন। তারপর বলছি।'

ওরা দু'টিতে গুটি গুটি ভেতরে গিয়ে বসল। মেরুন রঙের সোফা। পায়ের নিচে কার্পেট। দেওয়ালের গায়ে লাল টেলিফোন। তার ওপরে উঁচুতে নীহারের ছবি।

বসেই অমিয় বলল; 'আমি একটু মুখটা ধুয়ে আসতে পারি?'

—'নিশ্চয়ই। সোজা চলে যান। বাঁ হাতেই কলঘর। নারকেল তেল রয়েছে—বড় কালো শিশিতে দেখবেন।'

বসার ঘরে রং মাখা মুখে বসতে অস্বস্তি লাগছিল। উঠতে পেরে অমিয়র ভালোই লাগল। খানিক পরে মুখ মুছে ঘরে ফিরে এসে বসল। তখন দেখল বিষ্ণু ঘরের কোণে একজন বেশ বয়স্ক ভদ্রলোককে ধানের পোকার কথা বোঝাচ্ছে। শ্বেত প্রজাপতি। যার কিনা বাঁ পাখনায় কালো একটা ফুটকি থাকে। সে আসলে কোটি কোটি পোকার জন্মদাত্রী মা-প্রজাপতি। যিনি শুনছিলেন—তার শরীরের ওপরের দিকটায় বেনিয়ান মত—নিচের দিকে নীল পাজামা। ঘরের আলো খুব উজ্জ্বল। ফ্লোরেসেন্ট টিউব। বিষ্ণুর কথার মাঝে তাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার বিঘে তিনেক জায়গা আছে। পৈতৃক। সেখানে—'

বিষ্ণু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'পিচ রাস্তার গায়ে? মাটির কত নিচে জল?'

ভদ্রলোক বললেন—'ময়নাডাঙায়?'

—'মানে কোন্ লেয়ারে জল আছে? ধানের দানা দেখে বুঝে নেওয়া যায়।'

—'আমি যদি ঢেঁড়স দিই।'

—'তা কেন? ঢেঁড়স খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়। দর পাওয়া যায় না। তার চেয়ে কাঁচা লঙ্কা দিন। বিঘে পিছু চৌদ্দশো গাছ বসাবেন! গাছ পিছু সারা সিজিন জুড়ে অন্তত দু কেজি করে লঙ্কা পেলেও—

—'বিঘেয় চৌদ্দশো গাছ? বলেন কি?'

—'হ্যাঁ। আর শুকনো লঙ্কা করে যদি বিক্রি করেন তবে তো কথাই নেই। টাকা রাখবার জায়গা থাকবে না দেখবেন—'

অমিয়কে ডেকে বিষ্ণু বলল—'ইনিই মিস্টার দত্ত।'

হাত তুলে নমস্কার করল। টান টান চেহারা। বয়স অন্তত পয়তাল্লিশ। কিন্তু দাঁড়ানো, কথা বলা—সবই খুব টাটকা। তাহলে রজনীর পুরো নাম রজনী দত্ত।

অমিয়র পরিচয় দিল রজনী। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল—মিস্টার দত্ত ভেতরের ঘরে চলে গেছেন! ধান, কাঁচা লঙ্কা, মাটির নিচের জলের লেয়ারের আলোচনার ভেতর থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসে বিষ্ণু থমকে চুপ করে আছে। ঠিক তখনই অমিয় বলল—'আমি টাকা ফেরৎ দিতে আসি নি। দেবার মত টাকা এক সন্ধ্যেতে হয় না আপনি জানেন—'

রজনী মুখ না তুলে বলল—'কি বলছিলেন বলুন—'

—'আপনাকে আমার একটা ডিসিসন জানাতে এসেছি।'

—'তা আমাকেই বা কেন? কিছু খাবেন?

—'না এখন নয়। আপনাকে জানানোর কারণ—আপনাকে আমাদের দরকার।' বলেও অমিয় খুব শিওর বোধ করল না। রজনী বিখ্যাত মায়ের বিখ্যাত মেয়ে। তার স্বামী নীল পাজামার ওপর বেনিয়ান পরে থাকে ঘরে। বেশ ডিফারেন্স। অমিয় ফিরে আবার বলল—'আমাদের নতুন নাটকে আপনাকে চাই। আপনি না হলে হবে না।'

বিষ্ণু বলল—'এর ভেতর নতুন নাটক লিখেছো? কবে লিখলে?'

ফোড়ন কাটলো রজনী, 'এই যে শুনি আপনারা দু'জন মানিকজোড়! আপনিই জানেন না?'

—'ভুল শুনেছেন। ও অ্যাকটর। আমি দর্শক মাত্র!'

অমিয় সে কথায় না গিয়ে বলল—'ফেরিওয়ালার মৃত্যু আজই লাস্ট নাইট গেল। আর এখন করব না।'

—'তা কেন অমিয়? পাবলিক সবে নিতে শুরু করেছে—'

—'ও আমার আসল নাটক নয়।'

—'কোনটা আসল?'

—'লিখেছি। এখনো শেষ হয় নি। মেইন রোল সুজাতার। রজনী আপনাকে রাজি হতেই হবে। এ নাটক আপনার। আপনি না হলে সুজাতাকে পাবলিক মেনে নেব না।'

অমিয়র কথায় কি ছিল। অন্যমনস্ক চোখ। ঈগল নাক। মাথায় ঈষৎ প্রাচীন বাবরির চাল।

রজনী আবহাওয়া ঠাণ্ডা করতে হেসে বলল—'সে কথা কি ফোনে বলা যেত না।'

—'সরি! রাত হয়ে গেল।'

—'না। বসুন না। কিছু খাবেন?'

অমিয় মনে মনে বলল—কিছু খেলে হত। সেই কোন্ সকালে কি খেয়েছে মনেও নেই। তবু বলতে পারল না। বলল বিষ্ণু। বিষ্ণু দত্ত। খুব আলতো গলায় বলল—'আপনাদের বাড়ি রাম আছে?'

রজনী হেসে বলল—'তা হয়ত থাকতে পারে, দেখি।'

বিষ্ণু সাহস পেয়ে বলল—'আপনার কর্তাকেও ডাকুন না।'

রজনী জিনিসপত্র এনে টেবিলে সাজিয়ে দিল। বড় পেট মোটা বোতলটা হাতে করে রজনীর স্বামী এসে বসল। বসেই বলল—'আমাদের জামাই এলে বসি। নইলে বসা হয় না। আর অনেকদিন পরে এই হচ্ছে।'

রজনী বলল—'আমাদের বড় মেয়ে এলে বাড়িতে খুব আনন্দ হয়।'

তখন রজনীর স্বামী বলছিলেন—'আচ্ছা লঙ্কা শুকোতে কতদিন লাগে ঠিক?'

বিষ্ণু শুরু করতে গিয়ে বাধা পেল। রজনী থামাল—'দোহাই! এখন কিছুক্ষণ ঢেঁড়স, লঙ্কা, ধান বন্ধ থাকুক।'

॥ চার ॥

বিষ্ণুকে নামিয়ে অমিয়র ফিরতে ফিরতে রাত হল। সেই অন্ধকার বাড়ি। ঘুমন্ত পাড়া। কাল সকালে যখন অমিয় রিহার্সেলের জন্যে চানটান করে বেরোবে—তখন পাড়ার ছেলেরা বলবে—খুব টেনেছে রে। কাল খুব মাইফেল গেছে!

এরকম উড়ন্ত কথা দু'একবার কানে এসেছে অমিয়র। ফেরে অনেক পরে। বেরোয় ভোরে। টাকার ধান্ধা। ঘরের ধান্ধা। রিহার্সেলের ঘর না থাকলে তো সব বরবাদ। এসব কথা পাড়ার ছোকরাদের তো আর ডেকে ডেকে বোঝাতে পারে না। ওদের কাছে অমিয় অনেক আগেই লম্পট! দুশ্চরিত্র॥ এইসব টাইটেল পেয়ে বসে আছে। খুব আপসোস হয় তার। একদিন যদি সারাটা দিন ছেলেগুলো তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো—দুর্গালালের গদি, এস এন ব্যানার্জি রোডের রিহার্সেল রুম—তাহলে একটা আন্দাজ পেত।

মানুষ দূরে চলে গেলে লোকে ভক্তি করে। গিরিশবাবু, বড়বাবু—এঁরা যত-দিন কাছাকাছি থাকতেন—লোকে আড়ালে আবডালে খারাপ বলে সুখ পেত। ওঁরা মরে যেতেই তড়িঘড়ি তারাই ওদের মহৎ করে নিল। দেওয়ালে অয়েল পেন্টিং ঝোলালো।

—'সকালে খেয়ে বেরোওনি কেন?'

অন্ধকার থেকে গলা শুনে বুঝলো—লীলা। কোন জবাব দিল না অমিয়।

সুইচ টিপে ঘর আলো করে নিয়ে লীলা এবার বলল, 'আজ হাউস ফুল ছিল।'

—'হুঁ। কোত্থেকে জানলে?'

—'শংকর এসেছিল তোমার খোঁজে। খানিকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। একস্ট্রা চেয়ার দিতে হয়েছে দশখানা। গুড নিউজ। আজ তো হাসিমুখ দেখবো ভেবেছিলাম।'

—'এতকাল তো ফাঁকা চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে এলাম। এবার তার শোধ তুলবো।' সেই একই নিঃশ্বাসে অমিয় বলল, 'তাড়াতাড়ি খেতে দাও। খুব খিদে পেয়েছে। তারপর লিখতে বসবো।'

—'বসেই তো ঘুমিয়ে পড়বে !'

এতক্ষণে অমিয়র চোখে পড়ল। 'নতুন শাড়ি মনে হচ্ছে ?'

—'হুঁ।' কাজ করতে করতেই লীলা বলল। 'ইনস্টলমেণ্টে কিনেছি আজ। সাশদার টাকাটাও পাঠিয়ে দিয়েছি।' তারপরই লীলা আচমকা বলল, 'শংকর এসে ভাল খবরটা দিতেই—ভাবলাম পরে ফেলি। তুমি এসে দেখবে।'

—'বেশ করেছো। কাল আমায় গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিতে পারবে ?'

—'পারব। খেয়ে নাও তো আগে।'

দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসলেও—শেষদিকে লীলা আগে উঠে গেল। জলে ভেজানো আম কেটে প্লেটে সাজিয়ে দিল।

—'ওদের দিয়েছো ?'

—'পেট ভরে খেয়ে তিনজনেই ঘুমোচ্ছে। তুমি খাও তো।'

—'তুমি নাও।'

—'এইতো নিলাম।'

লীলা শেষের ভাতগুলো জল ঢেলে খায় রোজ। তাতে আম দিয়ে নিল আজ।

—'ফেরিওয়ালার মৃত্যু আজই লাস্ট নাইট করলাম।'

—'তার মানে ?'

—'আর করব না। অন্তত এখন আর করব না।'

—'কি বলছো পাগলের মত। অডিয়েন্স নিতে শুরু করেছে সবে। চাই কি একশো নাইট হতে পারে।'

অমিয়র খুব ভাল লাগছিল লীলার এই উৎকণ্ঠা। পরনে তাঁতের নতুন শাড়ি। শাড়ির একটা আলাদা গন্ধ থাকে। তাই পাচ্ছিল অমিয়। নতুন শাড়ির গন্ধ। এখন মধ্যরাত। ড্রামাটিস্ট, অ্যাকটর, ডিরেকটরের ওয়াইফ লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ প্রথম হাউসফুলের নাইট গেল।

—'পরে দেখো হাজার নাইট হবে আমার নাটক। একই নাটকে কেউ আটকে থাকতে পারে ?'

—'সবে তো তের রাত গেল। এরই মধ্যে টায়ার্ড লাগছে।'

—'এ নাটকে আমার কিছু করার নেই লীলা।' বলতে বলতে উঠে গেল অমিয়।

আঁচিয়ে ফিরে এসে বলল, 'সুজাতার রোলে মেয়ে পেয়েছি।'

লীলা যে তার কথা বুঝতে পারে নি সে তার মুখ দেখেই বুঝলো অমিয়। হেসে বলল, 'নতুন নাটকের কথা ভুলে গেলে.! তুমি তো পড়েছো বলছিলে।'

—'হুঁ। কিন্তু এমন তৈরি নাটক ছেড়ে—'

—'তাতে কি!'

—'আবার তো নতুন সেট তৈরি করতে হবে। পাবলিসিটি, রিহার্সেল আছে।'

—'সব পুষিয়ে যাবে লীলা। রজনী রাজি হয়েছে।'

—'রজনী?'

—'রজনী দেবী। নীহারের মেয়ে—'

—'তিনি রাজি হয়েছেন? খুব ভালো। কিন্তু—'

—'তুমি আর কিন্তু রেখো না মনে। হাউসফুল হবার পর বন্ধ করেছি লোকে আর কিছু বলার চান্স পাবে না। শুধু বিষ্ণুব একটা শর্ট রিভিউ বেরোবে। তাতে শেষদিকে নতুন নাটকের কথা থাকবে।'

—'নাম ঠিক করেছো!'

—'না। কি রাখা যায় বল তো।'

—'কেন? 'সুজাতা' রাখো।'

—'চলবে?'

—'ঠিক চলবে—'

অমিয় সিগারেট ধরাতেই লীলা সরে গেল। সে জানে, অমিয় এখন আস্তে আস্তে একা হবে। নতুন নাটকের ক্যারেকটারগুলো এখন একে একে অমি[illegible] সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এবারে অমিয় তাদেব সঙ্গে মিশে যাবে। ক[illegible] বলবে। বলতে বলতে লাইন পাবে। সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলবে। সেসব লাইন খুব তাড়াতাড়িতে লিখতে হয়। নয়ত ভুলে যাওয়াব ভয় আছে। একবা'র হারিয়ে গেলে আর মনে আসে না।

তাড়াতাড়িতে লেখা লাইনগুলো পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অমিয় উদ্ধার করে। কখনো ক হয়ে যায় ব। গ হয়ে যায় খ। পড়ে পড়ে নতুন করে সে সব লাইন আবার লিখে নেয় অমিয়।

সুজাতা নাটকে জীবন আর সুজাতা প্রধান চরিত্র। সুজাতার রোল এক নম্বর। তাকে ঘিরেই নাটক। ফাউ হল গিয়ে জীবন নিজে। তাকে বোকা, [illegible]ট, স্বার্থপর, নীরেট সেজে সেজে সুজাতার রোলকে আরও মেলে ধরতে হবে।

সুজাতাকে অভিনয়ের পথ খুলে দিতে হবে। পাবলিক জীবনের ওপর যত বিরক্ত হবে—নাটক তত জমবে -পাবলিক তত নেবে।

আজ তিনদিন ধরেই গানটা তার মাথার ভেতর গুনগুন করছে। একটা গান। পুরনো কালের গান। সুজাতাকে গাইতে হবে। লাস্ট রো থেকে শুনতে পাওয়া চাই। অথচ একটু অফ বিটের গান। কিছুটা নিচুতে ধরতে হবে। গানের সবটা তার মনে নেই। মুখটুকু শুধু মনে পড়ে। তাই সই। লিখে তো রাখল। তারপর খুঁজে নেবে।

"আমি চাই না তোমার এই
ওজন করা ভালবাসা—"

'চাই না' কথাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইবে রজনী। রজনীর গলায় খুলবেও খুব। ভৈরবীর ওপর গাঁথা। গলায় স্বরটি পরিষ্কার। কোথাও কোন দাগ নেই। এবং মনে হয়—এইমাত্র ফুটে ওঠা ফুলটির মত তাজা অমিয়র অবাক লাগছিল আজ ওর ঠাকুরঝির অভিনয় দেখে। তা রজনীর চল্লিশ হয়েছে নিশ্চয। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। জামাই হয়েছে নাতি-নাতনী আছে কিনা জানে না। অথচ হাসি, গলা, সঠিক উচ্চারণের খাঁজ—একদম অটুট—তাই বা কেন? একদম পুরস্তই বলা যায়। গানের সময় গলার কাজ কত সুন্দর।

গানের আভাসটুকু খাতায় লিখে অমিয়র মনে পড়ল—এ গানখানি নিয়ে কত কালের বিতর্ক। কেউ বলে বিনোদিনীর। কেউ বা বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। হয়ত গানখানির আসল বয়স একশোর ওপর। আজও সমান তাজা। এই গান জন্মানোর পর বাঙালীর জীবনে কত কি ঘটে গেল। ঘটনাগুলো ঘটে ঘটে পুরনো বাসি হয়ে হারিয়ে গেল। গানখানি হারায়নি। রাজনীর গলায় ভয়ঙ্কর খুলবে।

লিখতে লিখতে অমিয় পুরো সিনটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। জীবনের রোলে সে নিজে সরু পাজামার ওপর ফিনফিনে আদ্দি চড়িয়ে ক্যাবলা কার্তিকের মত পাবলিকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রজনী সুজাতা হয়ে গাইছে। একটি সিটও খালি নেই। হাউস ফুল। একস্ট্রা চেয়ার দিতে হয়েছে। সত্তরখানা। সব সাড়ে দশ টাকার সিট।

ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল। খোলা কাগজগুলো ফাইল-বন্দী করে মাদুরেই শুয়ে পড়ল অমিয়। শরীরে যে কেন এত শক্তি কম—কেন যে ঘুম পায়—পড়ে থাকা কাজের পাহাড়টা রোজ একটু একটু করে উঁচু হয়ে যাচ্ছে। নিরুপায় অমিয় প্রাচীন ঘুমের আক্রমণে পরাস্ত হয়ে ঢলে পড়ল।

তার স্বামীর ঘুম আসার সময়টার একটা আন্দাজ আছে লীলার। সময় মত বিছানা থেকে উঠে এসে আলো নিভিয়ে দিল। ফাইল তুলে রাখল তাকে। সে জানে—এক একখানা নাটক দাঁড় করানো মানে এক একটা নতুন বাড়ি তোলার চেয়েও কঠিন। কঠিনে এই মানুষটার স্বাদ বড়।

অমিয়র সিঙ্গিল মশারি টাঙিয়ে দিয়ে লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধকার ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

ঠিক তখন গিরীশ পার্কের ওখানে দোতলার ঝুলবাবান্দায় এসে রজনী দাঁড়ালো। খানিক আগে একটা ট্যাক্সি বিষ্ণু আর অমিয়কে নিয়ে এই পথ দিয়ে আরও উত্তরে চলে গেছে। কলকাতার এখন ঘুমোনোব সময়। পার্কে পাথরের গিরিশবাবু আসন করে বসে।

নীলদর্পণের গানখানি আজ সন্ধ্যে থেকেই রজনীর গলায় ঘুরে ফিরে আসছিল। এখন আর কোন কাজ নেই। গুনগুন করে গলায় নিয়ে এল রজনী।

'মন মন্দিরে মম বিরজ তুমি নিরজনে রাখি তাই—'

বিহুরোক্তে একখানি সুন্দর কাজ রজনীকে ভুলিয়ে দিচ্ছিল। বারবার তাই এক জায়গাতে এসে একটু থেমেই আবার—"নিরজনে রাখি তাই"-এ চলে যাচ্ছিল।

অনেকদিন পরে গানের বই ধরেছে রজনী। কবিয়াল এখন সফল। তার ঠাকুরঝির রোল দেখতে এখন শেয়ালদা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জাররাও আসে। তবে দলের কেন এত দেনা?

কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে কথা? তৃপ্তিকে? কোন লাভ নেই। ছেলে-মেয়েদের বাবাকে? কোন লাভ নেই।

'নিরজনে রাখি তাই—
শুন সুন্দর শ্যাম
মন মন্দিরে মম বিরজ তুমি
নিরজনে রাখি তাই —'

বেশ গাইতে লাগছে গানটা। কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী দেখবেন দশ মিনিট। প্রায় ছু'ঘণ্টা ধরে বসে-থেকে শেষ অব্দি দেখলেন। এ রকম প্রাইজ অনেকদিন পায়নি রজনী।

আজকাল কতরকম পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রেষ্ঠ আভনেতা—শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।

সহ-অভিনেতা। সহ-অভিনেত্রী। কত কি। ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রজনী আপন মনেই হাসল। আমার ভাগ্যটা বড় ভাল। না হতে পারলাম পুরনো দিনের অভিনেত্রী! না পারলাম নতুন দিনেরও হতে! সেই কবে থেকে সাজঘরে ঘুরছি।

এই ঝুলবারান্দা থেকে রজনী শ্রীরঙ্গমের সাজঘর দেখতে পেল পরিষ্কার। তারই পেছনে ওরা থাকত তখন। "বিন্দুর ছেলে"তে অমূল্য করে। বছর সাতেক বয়স তখন রজনীর। শ্রীরঙ্গমের পেছনে বড়বাবু, বাবা ওরা বসে গল্প করছেন। অনেকে এসেছে। রজনী তখন মালকোছা মেরে ইজেরের ওপর ধুতি পরে স্টেজে নামত। মাথায় জোড়া বেণী। ন্যাড়া ছাদে দাঁড়িয়ে কাটা ঘুড়ি লোটার চেষ্টা করছিল। মায়ের তাড়া খেয়ে শ্রীরঙ্গমের সিনের গুদামে গিয়ে লুকিয়ে ছিল।

গানের রোল সেই কোন ছোটবেলা থেকে করে আসছে রজনী। অমিয়র নতুন বইতে নতুন রোলেও নিশ্চয় গান আছে। নইলে অত আগ্রহ কেন আমাকে নেবার। মিনার্ভায় সেই "কিন্নরী", "আত্মদর্শনের" সময় থেকে সে গাইছে।

পরে ছবি বিশ্বাস যখন কামাল আতুর্ক—নীহার কামালের মা—রজনী তখন কামালের ছেলে। কৃষ্ণচন্দ্র গাইতেন—ওয়াতন! ওয়াতন!!

রজনীর অনেকদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল—কৃষ্ণচন্দ্রের চোখে এমনি কোন দোষ আছে। উনি যে অন্ধ, রজনী তা জানত না। একদিন স্টেজে ঢুকতে গিয়ে বিষম গুঁতো খেলেন। সেদিনই রজনীকে বলেছিলেন—'মা, আমায় একটু ধরিস। আমি দু'চোখেই দেখতে পাইনে'

"চন্দ্রগুপ্তে" কৃষ্ণচন্দ্র ভিক্ষুক। রজনী আত্রেয়ী। কৃষ্ণচন্দ্র গাইছেন। এখনো শুনতে পায় রজনী। "ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী—"

—'শোবে এস।'

কথাটা একদম চাবির গোছার মত ঝনাৎ করে রজনীর মাথার ভেতরকার মেঝেতে এসে পড়ল।

আবার শুনলো: 'রাত হল অনেক। শোবে এস। কিছু খেয়ে নাও।'

—'খিদে নেই। আজ কিছু খাব না। তুমি খেয়েছো?'

—'আমি তো সেই কোন সন্ধ্যেয় খেয়ে থাকি।'

—'খিদে পেলে আরেকবার খাও।' বলেই রজনী কোনদিকে না তাকিয়ে ঘরের ভেতরে চলে এল।

শশাঙ্ক দত্ত অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে বলল, 'হাজার হোক আমি তো তোমার স্বামী।'

—'আমিও তো তাই জানি। তাই জেনেই তো তোমার হাত দিয়ে গয়নাগুলো বন্ধক দিতে দিয়েছিলাম। সুদ—তস্য সুদ সমেত সব টাকা তোমার হাতে তুলে দিলাম—তাও আমার গয়না ফিরল না।'

—'আস্তে বল। ছেলেমেয়েরা জেগে উঠবে।'

—'ওরা সব জানে। ছ-সাত বছর বয়স থেকে থিয়েটার করে আসছি। যেখানে যা টাকা পেতাম মা তুলে রাখতেন। তাই দিয়ে মা আমায় সব সময় ভারি গয়না করে দিয়েছেন। সে-গুলো নিজের সংসার করতে নেমে তোমার হাত দিয়ে বন্ধকে পাঠালাম—তা আর ফিরল না!'

—'পুরনো কথা তুলছো কেন? জানো তো আমি চাকরি-বাকরি করতে পারিনি। পারি না একদম।'

—'সে তো জানি। কেন পার না তা কিন্তু জানি না। ঘুম থেকে উঠে পান খেলে, চা খেলে, কাগজ পড়লে, শুয়ে থাকলে, চান করলে, ভাত খেলে, ঘুমোলে—এই তো চলছে!'

শশাঙ্ক বলল, 'তুটি খেয়ে নাও। সারা দিন খুব খাটুনি গেল।'

—'তাহলে নতুন কথা তুলি। এই যে নতুন দল করে "কবিয়াল" করছি আমরা—এত টিকিট বিক্রি হচ্ছে, নাম হচ্ছে—কিন্তু টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে? দেনা বাড়ছে কেন?'

—'তা আমি কি করে বলব!'

—'তুমিই তো বলবে। তুমি আমার স্বামী। তোমার মত নিজের লোক নিয়ে দল করলাম—যাতে সব কিছু কণ্ট্রোল থাকে, কিন্তু তোমার মত নিজের লোক নিয়েও তো কোন সুবিধে নেই। বরং অসুবিধে। স্বামী বলে কথা! সবার সামনে বলাও যায় না। নয়ত তোমারই তো সব লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল।'

—'আমি পারিনি রজনী। আমি অপদার্থ।'

—'ও-কথা বললে আমি আগের দিন হলে তোমায় ছেড়ে দিতাম। দিয়েছিও অনেকবার—এখন তো তোমায় আমি ছাড়ব না। তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার বউ। তোমার ছেলেমেয়ের মা। তুমি তৃপ্তির ওপর নজর রাখতে পারতে—'

—'তৃপ্তিবাবু তোমার প্রেমে হাবুডুবু। তার অ্যাকাউণ্টস্ আমি কি করে দেখি?'

—'কেন দেখবে না? আমি তো তার প্রেমে হাবুডুবু নই। সে পাগল হল বলে আমি পাগল হব কেন? আমি বলেছি—দ্যাখো ভাই আমি তোমায় অন্য

চোখে দেখি। তুমি সেই চোখে দেখতে শেখো আমায়। আমার তো বলতে আটকায় নি?'

—'আমি এরকম ব্যাপারে কখনো যাইনি রজনী।'

—'এর ভেতর ব্যাপার দেখলে কোথায়?'

শশাঙ্ক খুট করে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সামনের সোফায় বসে পড়ল। রাস্তার আলো তার মাথা ছুঁয়ে রজনীর মুখে এসে পড়েছে। ঘরের বাকি সব কিছু অন্ধকারে।

—'আমি তোমায় ভালবাসি রজনা।'

—'বিয়ের চব্বিশ বছর পরে এ কথায় আমি আর ভুলছিনে—'

—'তোমাকে ভোলাতে চাই না আমি। আমি যা আমি তাই—'

—'সে পথেই তো তোমায় চলতে বলেছিলাম। কোনদিন জানতে চেয়েছো—কোথেকে টাকা আসে? চাল আসে? বাড়ি ভাড়া আসে? কোনদিন তো জানতে চাওনি। দিনের পর দিন সময় নেই অসময় নেই ফোন তুলে তৃপ্তিবাবু অপমান করে চলেছে। কোথায়! তুমি তো কোনদিন ফোনটা ধরে বলনি—আমার স্ত্রীকে খারাপ খারাপ কথা বলবেন না।'

—'আমি এ সব কাজ পারি না রজনী।'

—'টাকা ফেরৎ দিলেও বন্ধকের গয়না ফেরৎ আনতে পার না। চাকরি করে দিলেও রাখতে পার না। সেই অল্প বয়সে কেন যে ভুলেছিলাম! তুমি চাকরি হারিয়ে ফিরে এলে—কাঁদলে। আমি বলেছিলাম—আমি :·। অভিনয় ভুলে যাইনি। কোন চিন্তা কোরো না। সংসার ঠিক চলবে। কেন যে বলেছিলাম! আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে ইচ্ছে করছে শশাঙ্ক।'

--'কতদিন পরে আমায় নাম ধরে ডাকলে। আমাদের বিয়ের সেই আগের দিনগুলোতে—তুমি নাম ধরে ডাকতে আমাকে—'

সে কথায় গেল না রজনী। অন্য জায়গা দিয়ে শুরু করল। 'তুমি তো ভাল আঁকতে পারতে। তোমাদের ফড়েপুকুরের বাড়িতে গানবাজনার চর্চা ছিল। তুমি তো গান লিখতে পারতে। "ভোলা ময়রা"য় গানও লিখেছিলে। আর লিখলে না কেন? সেটাও তো আয়ের একটা পথ হতে পারত। ভালো বাণার দাম সব সময় ভালো। তুমি সারাদিন শুয়ে থাকবে। আর আমি সারাদিন টোটো করে আয় করব। রঙ মেখে স্টেজের ধুলো মেখে বেড়াবো?'

আর বলতে পারল না রজনী। মনে মনে বলল, 'আমাদের মত মেয়েদের

বিয়ে করাই ঠিক হয়নি। ঘর আমাদের হয় না। যতই না কর—ঘর কখনো তোমাকে দেখবে না। ভেবেছিলাম—শ্বশুরবাড়ি করব। ভাশুর-দেওর থাকবে। তা হবার নয় আমার।'

শশাঙ্ক মাথা নিচু করে বসেছিল। দু'হাতের ওপর কপাল রেখে। কনুই দু'খানা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে রেখেছে।

রজনী উঠে কলঘরে গেল। নীহারের সেই আমলের ভাড়াবাড়ি। শ্রীরঙ্গমের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর এ-বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল রজনী। এখনকার তুলনায় অনেক সস্তা। এ ভাড়ায় চারখানা ঘর কে দেবে! বড় ছেলে ঘুমিয়ে। ছোট দুই মেয়েও ঘুমোচ্ছে। শশাঙ্ক অনেককাল আলাদা শোয়। ইদানীং ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে বলে এক বালিশে শুচ্ছে।

নিজের বিছানায় শুয়েও ঘুম এল না রজনীর। মুখের চামড়া কেন যেন জ্বলে যাচ্ছে। "কবিয়ালে" ঠাকুরঝি করছে আজ বছর দেড়েক। এই দেড়টা বছরই রজনীকে জ্বালাচ্ছে তৃপ্তিবাবু। রজনীকে তার চাই-ই। রজনীকে বিয়ে না করলে জীবনটাই নষ্ট! কেন গো বাপু। আমি তোমায় তুক করেছি? বশীকরণ? তৃপ্তি ঠিক আমার ধাতে আসে না। রাগ হলে, কষ্ট হলে কোথাও যে যাবে—এমন একটা জায়গা নেই। ছোটবেলায় দেখেছে—রাগ হলে নীহার গিয়ে গঙ্গার অন্ধকার ঘাটে বসে থাকত। রাগ পড়লে টানা রিক্‌শায় ফিরে আসত। ডালিমতলায় নীহার বাড়ি কিনেছিল। এক কাঠা চৌদ্দ ছটাক জায়গার ওপর। রাখতে পারল না। ষোল হাজার টাকায় কেনা বাড়ি সাতাশ হাজারে বিক্রি হয়েছিল। বাবা বেচে দিয়েছিলেন। তারপর নীহার এই ভাড়াবাড়িতে চলে আসে। এখানেই তার মৃত্যু। তার কিছুদিন পরেই বাবা গেলেন। বাবা মাকে খুব ভালবাসতেন।

কি করে সংসার চলে এই লোকটা একবার খোঁজও নেয় না। সংসার চালাতে রজনী কী করেনি একদিন। অথচ নীহার থাকতে, বড়বাবু থাকতে, বাবা থাকতে,—বিয়ের আগে সে তো আনন্দেই বড় হয়েছে—বেড়ে উঠেছে। অভাবের দাগটা তাঁকে দেখতে দেওয়া হয়নি।

ইজেরের ওপর মালকোচা মেরে ধুতি পরে জোড়া বেণী দুলিয়ে শ্রীরঙ্গমের বংশী আর নারাণের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতো, ডাংগুলি খেলতো। তখন নারাণ আর বংশীরও বয়স কম ছিল।

বাবার ছবিটা মনে ভাসে রজনীর। লম্বা। ফরসা। বোম্বাই গিয়ে একবার

ছবি করেছিলেন রঞ্জিৎ মুভিটোনে। হিন্দি মাইথোলজিকাল। অপূর্ব দেখতে ছিলেন বাবা। বাবার আগের পক্ষের বিয়ে ছিল। রজনী সে-পক্ষের ভাইদেরও টেনেছে সময়ে সময়ে। এখন কেউ তার নয়। সবাই স্বার্থপর।

নীহারেরও আগে একটা পক্ষ ছিল। তাদের পদবী চৌধুরী। নীহারের আগের পক্ষের তিন ছেলে রজনীর বড়দা, মেজদা, সেজদা। তারা কোন খোঁজও নেয় না। অনেক ছোটবেলায় একজন বুড়ো মত লোক এসেছিল তাদের বাড়িতে। বড় হয়ে রজনী নীহারকে বলেছিল—'মা—সেই লোকটি কে ছিলেন ?'

মনে করে করে সেই স্মৃতি খু ড়ে নীহার বলেছিল, 'আমার বাবা। তোমার দাদু।'

বড়বাবুর সঙ্গে নীহার আমেরিকায় অভিনয় করতে যান। সেখানেই বড়বাবুর ভায়ের সঙ্গে নীহারের ভাব হয়েছিল। তিনিই রজনীর বাবা। এমনিতে খুব সুন্দর মানুষ। কিন্তু মদ খেলে পশু হয়ে যেতেন। একদম পশু। মারধোর। গালাগালি। মাতাল অবস্থায় রাতে বাবার বাড়িতে ফিরে আসার স্মৃতি আজও রজনীর কাছে বিভীষিকা। সব লণ্ডভণ্ড করে দিতেন মুহূর্তে।

বোর্ডে প্রম্পটার ছিলেন সতীশবাবু। অফ টাইমে হোমিওপ্যাথি করতেন। একদিন অনেক রাতেও যখন বাবা ফিরলেন না—তখন নীহার বাবাকে ডেকে আনতে সতীশকে পাঠিয়েছিল। রজনী সতীশকে ডাক্তারকাকু বলে ডাকত।

অনেক রাতে বাবা রিক্শা থেকে নামলেন। কাঁধে সতীশকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসে উঠলেন। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নীহারকে ডাকলেন—'যাকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছিলে—এই হল গিয়ে সে। একেবারে সেন্সলেস একটুতেই—'

অন্ধকারের ভেতরেও হাসি পেয়ে গেল রজনীর। তার বাবা, কাকা আর বড়বাবু—তিনজনে মিলে নাকি একবার মদের দোকান করেছিলেন—তিনমাসে নিজেরাই খেয়ে খেয়ে দোকান তুলে দিলেন।'

তখন সন্ধ্যার দিকে তার বাবাকে আসতে দেখলে সেন্ট্রাল অ্যাভিনু্য-বৌবাজার ক্রশিং-এ কোন ট্রাফিক পুলিশ থাকত না। পালিয়ে যেতো। তখন বাবার নেশা ছিল—ট্রাফিক পুলিশ দেখলেই পেড়ে ফেলা।

সেসব স্বাধীনতার আগে।

রজনী কখনো মদ খায়নি। শুধু একবার খেয়েছিল। খেতে হয়েছিল। না হলে সে পারত না। কিছুতেই পারত না। সেই সময়টার নিজেই একটা নাম দিয়েছে রজনী। বিসর্জন।

॥ পাঁচ ॥

'আমাকে নিয়ে বউ বউ খেলা যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায় না।' লাইনটা লিখে অমিয় আর এক কাপ চা চাইল লীলার কাছে। এ ডায়ালগটা সুজাতার।

নাটক শেষ। অন্তত এখনকার মত। এরপর যা বদলাবে—রিয়ার্সেল দিতে দিতে। স্টেজে নামার পর আবার আরও কিছু পালটাবে। গল্পটা খুব সাধারণ। বিখ্যাত লেখকের বিখ্যাত গল্পের সূত্র ধরে অমিয় এ নাটকের কাঠামো দাঁড় করিয়েছে। গল্পের সূত্রটিকে রেখে অমিয় একদম নতুন নাটক লিখে ফেলেছে।

নতুনই বলবে অমিয়। নতুন বলার কারণ আছে।

কোন কোন নাটক লেখার সময় তার মনে হয়েছে—ভূতের বেগার খাটছে। কিছুই মাথায় আসছে না। বাসি কতকগুলো লাইন কলম থেকে উগরে দিতে হচ্ছে। লিখবার সময়েই সন্দেহ তাকে কুরে কুরে খেতো। এ কি নাটক হচ্ছে ঠিক?

আবার কোন নাটক লেখার সময় ছেড়ে দেওয়া চরিত্রগুলো অবাধ্য হয়ে তাকে দিয়ে নানারকম কথা লিখিয়ে নেয়। তখন নাটকের চরিত্রই নাটক ডোমিনেট করে। তখন পরিষ্কার বোঝা যায়—নাটক হচ্ছে। নাটক হয়েছে।

বারবনিতাকে নিয়ে বাইরে গিয়ে বউ বলে পরিচয় দিয়ে নানা বিপত্তি। সাধারণ গৃহস্থবধূর মত ব্যবহার করতে গিয়ে বারবনিতার মনে নানা প্রশ্নের ঝড়। আপাতভাবে বাইরে থেকে দেখতে হাসির সব ঘটনা ঘটে গেল। ভেতরে দেওয়াল, বাড়ি, দরজা—সবই আসলে ভেঙে পড়ছে। এই হল গিয়ে গল্প। এই গল্প নিয়েই সুজাতা।

অমিয়র বারবনিতার কাছে যাওয়ার কখনো সুযোগ হয়নি। একবার সুদে টাকা ধার করতে সন্ধ্যের দিকে বাড়িউলি এক মাসির কাছে গিয়েছিল। অন্য জায়গা থেকে সুদ কিছু কম। কিন্তু টাকা আনতে যাওয়া—ফেরৎ দেওয়া ঝামেলার ব্যাপার। সেই লাইট পোস্টের নিচে গিয়ে দাঁড়াও। সবাই একবার করে তাকাক। নইলে টাকা যদি দেবে বলে তাহলে কথার নড়চড় করে না কখনো।

—'একি? চায়ের সঙ্গে মাছ ভাজা দিলে কেন? মাছ বেশি হয়েছে বুঝি!'

—'খাওনা একখানা।' লীলাও চা নিয়ে বসল।

—'আজ স্কুলে যাবে না?'

—'ইচ্ছে করছে না। দুটো পিরিয়ড মোটে—'

—'জানো লীলা—আজ খুব আমার দিদিমার কথা মনে পড়ছে—'

—'ওঃ! তোমার বালক বয়সের হিরোইন! বল না একটু শুনি।'

—'এই মাছ নিয়েই কথাটা। দাদামশায় হপ্তাভর কলকাতায় মেসে থেকে চাকরি করতেন। শনিবার বিকেলে এমনভাবে বাড়ি আসতেন—যেন, চাকরি করে সংসারটা উদ্ধার করে দিয়েছেন। সবাই তটস্থ হয়ে থাকত।

'স্কুল থেকে ফিরে দিদিমাকে দেখতাম দুপুরের খাওয়া খেতে বসেছেন অতবড় সংসারটা সামলে, গোহাল পরিষ্কার করে তবে খেতে বসতেন। তাও আবার মাছ খাচ্ছেন না। সব আমার জন্যে রেখে যাচ্ছেন।

'শেষে আমি চেপে ধরলাম। তোমায় বলতেই হবে—কেন তুমি মাছ খাও না। বলতে কি চায়। অনেক চাপাচাপির পর যা বললেন, তা হল, এক শনিবার বিকেলে অমন দুপুরের ভাত খেতে বসেছেন। হাতে ইলিশ মাছের মুড়ো। দাদু লোকাল ট্রেনে কলকাতা থেকে ফিরে দিদিমাকে মাছ খেতে দেখে—এগিয়ে এসে উঠন্ত হাতের ওপর ধাঁ করে এক লাথি কষালেন। আমি এলাম খেটেখুটে—উনি বসেছেন মাছের মুড়ো খেতে। সেই থেকে মাছ খাওয়া ছেড়েছি দাদু।

'আমিও ছেড়ে দিলাম। দাদু পুরুষ মানুষ। আমি আরেকজন পুরুষমানুষ হিসেবে দাদুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগলাম। ভাত খেতে বসে মাছ দেখেই বলতাম—গা গুলোচ্ছে।

'দিদিমা ধরলেন।

'তখন তাঁকে বললাম, তুমি মাছ খেলে আমি খাব। নয়ত নয়। তখন দিদিমা আবার খেতে শুরু করলেন। একটু একটু করে।'

—'দিদিমার কথা মনে পড়ছে কেন?'

—'বারবার মনে পড়ে। ওই আবহাওয়াতেও তিনি সারাদিন পরে গা ধুয়ে পরিপাটি হয়ে কবিতা লিখতে বসতেন। পুরনো দিনের কবিতা। একটি একটি করে লাইন লিখতেন—আর আমায় শোনাতেন। আমিই ছিলাম শ্রোতা। তখন কে জানত! আমিও একদিন একটি একটি করে লাইন লিখব।'

লীলা ডাল বসিয়েছিল। উঠে গেল।

অমিয় গুনগুন করে গাইছিল। সিকোয়েন্সটা হবে এমন: সুজাতাকে নিয়ে জীবন কলকাতার বাইরে হাওয়া বদলানোর শহরে ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। সেখানে দোর আটকে সবে বোতল নিয়ে বসেছে। সেখানে হালকা চালের কাওয়ালি গাইছিল সুজাতা। গায়ে অল্প জামা কাপড়। খুনসুটি চলছিল। সুজাতা সোনাগাছিতে মানুষ। পিতৃ পরিচয় নেই। বড় হতেই তার মা লোককে আনন্দ দেবার লাইন তাকে দিয়ে ধরিয়েছে। এমন সময় কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা চেঙ্গারের দল দরজায় এসে কড়া নাড়ল।

তখন সুজাতা ভেতরে গেল। জীবন দোর খুলে দিল। তারা সবাই এসে বসেই বলল, 'বৌদির গান শুনব।'

সুজাতা ঘর থেকে পালিয়ে যাবার আগে জীবন মিথ্যে মিথ্যে তার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে। একঘর লোকের ভেতর সুজাতা সেই সিঁদুর মাথায় লাল পেড়ে গরদ পরে ঘরে ঢুকলো। একেবারে সাক্ষাৎ বৌবাণী। সতীসাধ্বীর লক্ষ্মীশ্রী সারা মুখে। ঘরভর্তি লোক অবাক। সবচেয়ে অবাক স্বয়ং জীবন।

তাকে আরও অবাক করে দিয়ে সবার অনুরোধে সুজাতা যে গান ধরল, তার প্রথম কলি—

"একি মায়াজালে জড়ালে আমায় বন্ধু
কেন গৌরব দিয়ে ভরালে আমায় বন্ধু"

এ গানটিও ভৈরবীর ওপর। সঙ্গে কাজ মিশিয়ে মিশ্র রাগের গান। হারমোনিয়মে মধ্যমের ওপরে উঠে অফ বিটে রজনী গাইবে। দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল অমিয়। রিটায়ার্ড জজ রাখালবাবু সস্ত্রীক খাটে বসেছেন। সরকারী অফিসার অনিমেষবাবুর মেয়ে নূপুর ডাক্তারির থার্ড ইয়ারের ছেলেবন্ধুদের নিয়ে মেঝেতে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় চালকল মালিক কেষ্টবাবু কোঁচার খুঁটটুকু গোলাপ ফুল ধরার স্টাইলে ধরে আছেন। এখুনি ফুল ভেবে গন্ধ শুকতে পারেন। ল' ক্লাসের তিনটি বন্ধুর মধ্যে একজন তোতলা। স্কুল মিস্ট্রেস আভা একঘর লোকের মধ্যেও উল বুনছে। সুজাতা দাঁড়িয়ে গাইছে।

আসলে পুরো দৃশ্যটাই নাটকের মধ্যে নাটক। ওপরে একটা নাটক হচ্ছে। যেটি দেখতে দর্শকরা টিকিট কেটে আসবে। দেখতে এসে নাটকের পাত্র-পাত্রীর ভেতর আরেকটি নাটক দেখতে পাবে। বারবনিতা, ফুর্তি, মদ্যপান—এ সব শকার মোড়ক মাত্র। ভেতরে গাঢ় ছায়াধরা গাছগাছালির ভেতর দিয়ে কালো, বুঝি!' স্বজল বয়ে যাচ্ছে। তার উৎস হৃদয়। পরিণামও হৃদয়।

লিখতে লিখতে এই ব্যাপারটাই কাজ করেছে আগাগোড়া। ডায়ালগ লিখে তো খালাস হওয়া যায় এক রকম। কিন্তু কোন দৃশ্যে কে কোথায় থাকবে। পোশাকের কন্টিনিউটি। আলো। মিউজিক। এন্ট্রান্স এবং একজিট। উপরন্তু ড্রপ। এতগুলো জিনিস মাথায় ধরে রাখতে হবে।

"একি মায়াজলে জড়ালে আমায় বন্ধু
কেন গৌরব দিয়ে—"

সিঁথিতে সিঁদুরের গৌরব। এই গানের পর থেকেই সুজাতার হাবভাব পালটাবে। সে যেন আর খুনসুটি করার সামগ্রী নয়। এরপর থেকে গৃহিণীর মতই সে ভোরে চা করে এনে জীবনের ঘুম ভাঙাবে। বাড়িতে নিজে রান্না করতে চাইবে। পাশের বস্তির অসুস্থ বালকের কল্যাণে হনুমানজীর পায়ে পুজো পাঠাবে। আর জীবন বার বার তাকে মনে করিয়ে দেবে—সুজাতা তুমি সোনাগাছির মাগি।

গল্পটা কি খুব পুরনো? গল্পটা কি খুব নতুন? না, গল্পটাই মানুষের জীবন। তাকে মেলে ধরা—তাকে উন্মোচিত করাই নাটক। এ নাটক কি সত্যিই লাগবে?

সেট বানাতে কম টাকা লাগবে না। তিনটে জানলা চাই। একটা আলনা। একটা বুককেস। তিনটি অন্তত ফুটলাইট। ওপেন এয়ার থিয়েটারে এক সন্ধ্যেয় অভিনয় করে এ নাটক জমানো যাবে না। পাকাপোক্ত হল চাই।

সবার আগে চাই টাকা। টাকা জিনিসটা যে কি ক[illegible]াওয়া যায়! অমিয় জানে দুর্গালালের গদি। খচ করে একটা জিনিস মনে পড়ে গেল অমিয়র। অন্তত দশ-বারো বছর আগেকার কথা। এমনিই মনে পড়ে গেল। সে তো রজনীর সঙ্গে আগে একবার অভিনয় করেছে। তাদেরই অফিস ক্লাবের নাটকে। তখন রজনীর বয়স আরও কম ছিল। অমিয়রও বয়স কম ছিল। রজনী তখন পাবলিক স্টেজের সঙ্গে ঝগড়া করে অফিস পাড়ার থিয়েটারে খেপ দিত। পার নাইট পঞ্চাশ টাকা। কী দাপটের অভিনয়। মাসের মধ্যে অন্তত দশদিন কাজ থাকত রজনীর। আজ "বঙ্গে বর্গী"। আবার কালই সোশাল বইতে। অন্তত দশখানা বই ধরতে পারত রজনী। কী স্মৃতিশক্তি। কী উচ্চারণ। এখন বোধহয় পান-জরদা ধরেছে। নয়ত হাসলে সেদিন সুন্দর সাজানো দাঁতে পানের ছোপ দেখলো কেন। মনে পড়েছে। মনে পড়েছে অমিয়র।

—'এই লীলা একবারটি আসবে।'

—'বল।'

বাটনা বাটছিল বোধহয়। হাতে হলুদের ছোপ। শাড়ির আঁচল ভিজে।

—'আমি রজনীকে চিনতাম।'

—'তা চিনবে না কেন? তোমরা নাটক লাইনের লোক, এজন্যে ডেকেছিলে?'

—'উঁহু, শোন। মনে আছে আমাদেব অফিস ক্লাবের নাটকে আমি ছোটবাবু কবেছিলাম। যিনি পটেশ্বরী সেজেছিলেন—তিনি এই রজনী। তাই বল—আমার স্মৃতিশক্তি এত উইক হয়ে গেল কবে থেকে।'

লীলা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

অমিয় মনে মনে তিনবার বলল—পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি। শেষ বারেরটা নিজেই শুনতে পেয়ে অমিয়র খুব লজ্জা হল। কি পেয়েছে? নাটকের হারিয়ে যাওয়া জুৎসই লাইন? না, পুরনো স্মৃতির ভেতর থেকে হারানো রজনীকে? রজনী তো তার কেউ নয়। তবু সেদিন কেমন অনুভাব ঠাকুরঝির স্মৃতি মুছে দিচ্ছিল।

পটেশ্বরীর গলায় আজ থেকে দশবারো বছর আগে অফিস ক্লাবের অভিনয়ে রজনী মাতাল অবস্থায় ছোটবাবুকে ওরফে অমিয়কে বলেছিল—'মদ আমার নেশা নয় গো—আমার নেশা তুমি।'

আমি অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স চল্লিশ। ছাতি চল্লিশ। হাইট ৬ ফুট এক। বিষ্ণু দত্তের ভাষায় ঈগল-নাসা। লম্বা জুলফি। একঢাল কোঁকড়া চুলের মাথাটা নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে তাকালে মনে হবে আমার জন্যে ডেথ্ ওয়েট করছে। ওৎ পেতে বসে আছে। বিপর্যয়ই আমার জন্যে নির্দিষ্ট ভাগ্য। তাই বিষ্ণুর মতে আমার পক্ষে অন্যমনস্ক হওয়া নিষিদ্ধ। অন্যমনস্ক হলেই নিয়তি এসে প্রবেশ কববে। একবার ঢুকলে আর এগজিটের নাম করবে না।

নিয়তির মানে অমিয় জানে না। এক সময় মনে হয়—নিয়তি একটি নিশ্চিন্ত ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম। সে গ্রাম তারই মাথার মধ্যে এক জায়গায় আছে। সে গাঁয়ের পাখির ডাক, বৃদ্ধ আম গাছের সর্বাঙ্গে পরভৃতা লতার ক্রমশ আচ্ছন্নকারী মৃত্যু, কাঠবিড়ালীর আনাগোনা।—সবই তার জানা। সময় হলেই সমগ্র গ্রামখানি তার চোখের সামনে ছবি হয়ে ধরা দেবে। সেই গ্রামখানি তার কাছে মৃত্যু কিংবা সাফল্য। একদিন সে মৃত্যুর নাম দেবে—নিয়তি। একদিন সে সাফল্যের নাম দেবে—নিয়তি। এ নাটক কি তাহলে লাগবে? তাহলে কি লাগল?

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে অমিয় মাথাটা আঁচড়ালো। বেরিয়ে পড়ার মুখে অমিয়কে লীলা ধরল। 'কোথায় চললে ?'

—'আসছি।'

—'খেয়ে যাও।'

—'আসছি।'

রাস্তায় বেরিয়ে অমিয়র মনে হল চেঞ্জার সমিতির নূপুর মেয়েটিকে দিয়ে একটি দৃশ্যে পিনাকীর সঙ্গে নীল আলোর স্পট লাইটের ভেতর নাচাতে হবে। ওরা দু'জন জানতে পারবে দু'জনকে দু'জন ভালবাসে। সে ভালবাসাবাসি এখন ওদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে আর কেন বাধা নেই। পিনাকী ডাক্তারীর থার্ড ইয়ারের ছাত্র। তার হাতে সবসময় ট্রানজিস্টর। পতৌদি কি করল ? কাঁধে ক্যামেরা। তাতে ছত্রিশখানা ছবির স্পুল। আর ছ'খানা ছবি তুললেই প্রিন্ট করতে পাঠানো যাবে। কিন্তু সেই ছ'খানা ছবিই তোলা হচ্ছে না।

ওদের এই অল্পবয়সের ভালবাসাবাসির পাশেই নিষ্ঠুর নিয়তি দুটি খেলা একসঙ্গে খেলছিল। সুজাতা তার সোনাগাছির স্মৃতি ভুলে গিয়ে ঘরনীর সাময়িক মর্যাদাটুকু আকড়ে ধরতে চাইছিল। আবার স্কুল মিস্ট্রেস আভার দিকে জীবন ঝুঁকে পড়ায় সুজাতার ঠুনকো ঘরনীর মর্যাদাও খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছিল।

এখন রিহার্সেলের আগে চাই একখানা পাকাপোক্ত হল। যেখান থেকে ছুট করে উঠে আসতে হবে না। একশ' বছর ধরে বাঙ্গালীর নিজের থিয়েটার হল হচ্ছে! হচ্ছে তো হচ্ছেই। আর কবে হবে। একবার বর্ধমানে থিয়েটার করতে গিয়ে অমিয়র অনেকগুলো কোল্ড স্টোরেজ চোখে পড়েছিল। বিরাট বিরাট হলঘর। স্টেজ করে নিলেই দিব্যি নাটক করা যায়। আলু এদেশে এনেছিল সাহেবরা। দুশো বছরও হয়নি। তার জন্যে এত হল হয়ে গেল। নাটক কবেকার জিনিস। তবু আজও সবার অভিনয়ের জন্যে সুলভে পাওয়া যায় এমন মঞ্চ হল না। যাও বা আছে—তার ডেট পাওয়া কঠিন। গুচ্ছের অ্যাডভান্স। খেলার অঢেল মাঠ, অভিনয়ের সহজ মঞ্চ কবে যে হবে!

কলকাতার শিকড় আজও উত্তরে। দক্ষিণ স্রেফ অলঙ্কৃত। ভাগ্যিস ওপেন এয়ার থিয়েটারটি হয়েছিল। তাই আজকাল ওদিককার সন্ধ্যার বাতাসে নাটকের গন্ধ ভাসে। নয়ত দক্ষিণে তো আসলে শুধু সিনেমা হলেরই দাপট। তবু উত্তরে কিছু পাকাপাকি নাটকের জায়গা হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে দুর্গালালের গদী। দুর্গালাল নিজেই বসেছিল। অমিয়কে

দেখে বসালো। আরও দু' ভদ্রলোক বসে। একজনের চোখে চশমা। গায়ে আগেকার দিনের সুতোলি লাগানো ফতুয়া। হাতে সুন্দর হাতলের ছাতা। মোটা সুন্দর গোঁফে কয়েকটি সোনালী তার উঁকি দিচ্ছে।

—'আসুন অমিয়বাবু। খবর কি?'

—'খবর তো আপনাদের। হল খুঁজছি।'

—'টাকা লাগলে নিয়ে যাবেন।'

—'হল পাই আগে।'

সেই সুন্দর ছাতাটির মালিক বললেন—'যদি কিছু মনে না করেন—'

অমিয় ফিরে তাকালো।

দুর্গালাল ভদ্রলোককে বলল—'বলুন না। অমিয়বাবু আমাব চিনা পরিচিত্ আছেন।'

—'আমাদের একটি হল আছে। হল দিয়ে আপনি কি করবেন?'

—'আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের নাটক হয়।'

—'সে তো মাঝে মধ্যে।'

—'না তেমন পেলে রেগুলার শো করা যায়।'

অমিয় তখন মনে মনে বলছে—আহা! কোথায় হলটা বলুন না। কিন্তু পাছে বেশি আগ্রহ প্রকাশ পায়। তাহলে যা তা ভাড়া চেয়ে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে দিল 'আজকাল তো অনেক হল হয়েছে—আপনাদের হল কোথায়?'

—'এই নর্থেই। স্যায়ান্স কলেজ ছাড়িয়ে। আমি শ্রীরাম ট্রাস্টের সম্পাদক। হরিসাধন বসু আমার নাম।' বলেই পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে দিলেন। দু-একবার নাটক হয়েছে আমাদের হলে। পাকাপাকি ভাড়া দেওয়ার কথা আমরা কোনদিন ভাবিনি।'

দুর্গালাল বলল, 'এইবার ভাবতে হোচ্ছে। স্টাফের মাহিনা বাকি পড়ে গেছে। কর্পোরেশনের ট্যাক্স। আমি বলছি হরিবাবু- আপনারা অমিয়বাবুকে হল ভাড়া দিতে পারেন।'

—'বসার সিট আছে?' অমিয় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল।

—'আছে। আগেকার কাঠের সিট। রামায়ণ গান শোনার জন্যে শ্রোতারা বসতেন। তা সে পাট তো আজ দশ বছর বন্ধ। লাইব্রেরী ছিল। বইপত্তরও আছে। ধর্ম্মের ওপর মানুষের টান তো কমে যাচ্ছে। কিন্তু পড়ে কে? আপনারা তো যুবক। আপনারাই বলুন না!'

—'আমি আর তত যুবক নই। অ্যাসবেস্টসের ছাদ?'

এবার পাশের ভদ্রলোকটি বললেন—'হুঁ। সাউণ্ডের ব্যাপারে আপনার কোন অসুবিধে হবে না। দোতলার ব্যালকনি সেভাবেই বানানো। শ্রীরাম ট্রাস্ট সেভাবেই তৈরি করেছিলেন। হল নিলে আপনার অবশ্য কিছু খরচা করতে হবে।'

দুর্গালালের গলা টিপ্পনির মত শোনালো। 'সে অমিয়বাবু করে লেবেন। আপনারা টাকা নিচ্ছিলেন স্টাফের জন্যে। আপনাদের আর ডেমি কাগজে সহি করার দরকার নেই।'

—'কেন দুর্গালাল?'

অমিয়র কথাবার্তা এমনই—দুর্গালাল মাঝে মাঝে থমকে যায়। এবারও গেল। কিন্তু লোকটা টাকা নিলে টাকা না পারলে গয়না দিয়ে শুধে যায়। হেসে বলল—'হল দেখুন না। আপনার পসন্দ্ হলে টাকা তো লাগবেই। সে টাকা তো ওঁরাই পাবেন—'

—'ওঃ! আগে দেখি।'

ছাতা হাতে ভদ্রলোক বললেন—'আজই বিকেলে আসুন। ফোন করে আসবেন। আমি একবার অ্যাটর্নি বাড়ি যাব।'

—'বেশ তো।' বলে অমিয়ই আগে বেরিয়ে এল। ইচ্ছে করেই এল। ভদ্রলোক দু'জন দুর্গালালের কাছ থেকে তাদের কথা জানুক। তার কথা। মঞ্চযুগের কথা। চেহারাটি দুধে ঘিয়ে বানানো। এদের হাতে আস্ত একটা হল গজগজ করছে। আর ভাড়া নেওয়ার লোক পাচ্ছে না। বলিহারি!

সেখান থেকে বেরিয়েই ট্রাম লাইনের ওপর ওষুধের দোকান। রাস্তা থেকেই সাদা টেলিফোনটা দেখা যাচ্ছে। টেলিফোন যে এমন চুম্বকের মত টানতে পারে জানা ছিল না আগে। বুক পকেটে শ্রীরাম ট্রাস্টের সেকরেটারির কার্ডখানা। এই হল কি আমাদের হবে? ট্রাম লাইনের ওপর—অথচ এতদিন কোন খবর পায়নি। আশ্চর্য!

ভূতগ্রস্তের মত ডায়াল করে গেল। সাপ্তাহিক গন্ধর্বের লাইন পাওয়া কঠিন। পেলেও কি এখন বিষ্ণু দত্তকে অফিসে পাওয়া যাবে।

ফিরে আসছিল অমিয়। কি মনে করে আরেকটা লাইন ডায়াল করল। সঙ্গে ওপাশ থেকে গলা এল।

—'রজনী আছেন?'

—'বলছি।'

—'আমি অমিয়—'

—শুনেই বুঝেছি—'

—'কি করে বুঝলেন ?'

—'গলাটা আমার চেনা মনে হল।'

—'আপনার তো সবই চেনা মনে হয়—'

—'না। তা হয় না। বলুন—'

—'বাড়ি থাকছেন। একবার যাব ভাবছিলাম—'

—'আসুন না। চলে আসুন।'

—'অসুবিধো হবে না ?'

—'কিসের অসুবিধে।'

—'আজ তো আপনাদের শো আছে—'

—'শো বোধহয় আর হবে না—'

—'কেন ?'

—'আসুন না।'

হল এখনো পায় নি অমিয়। পেলেও কাজের মত হবে কিনা জানে না। হলেও ভাড়া কত চাইবে তার ঠিক কি। সে ভাড়ার টাকা কোত্থেকে আসবে ? দুর্গালাল আছে অবশ্য। ট্যাক্সি এসে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনুতে পড়তেই অমিয় বলল, 'বাঁদিকে—'

কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরোবার অপেক্ষা। তাও তর সইছিল না। দরজা খোলা ছিল। সামনেই বড় সোফায় রজনী বসে। সারাটা বাড়ি নিঃশব্দ। উল্টো দিকের সোফায় বসতে বসতে অমিয় বলল—'আমরা একটা হলের সন্ধান পেয়েছি। রাস্তার ওপর—'

রজনী তখনো কোন উচ্চবাচ্য করছে না দেখে অমিয় মনে মনে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এত বড় একটা খবর—অথচ শুনবার পরে একটু উনিশ-বিশ হল না রজনীর। ভাড়া এখনো ঠিক হয় নি।

—'হল দেখেছেন ?'

—'আজ বিকেলে দেখব।'

—'দেখুন আগে।'

আগুনে জল ছেঁটানো গলায় রজনী কথা বলছিল।

—'আমি কিন্তু আপনাকে অনেক আগে চিনতাম।'

—'তাই বুঝি। কবে থেকে!'

অমিয়র ভয় হচ্ছিল। রজনীর চোখের মণি পাশের শাদার সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে মনে হল।

—'অনেক দিন আগে। অফিস ক্লাবে আপনি "পটেশ্বরী" করেছিলেন। আমি "ছোটবাবু"।

"মদ আমার নেশা নয়গো! আমার নেশা তুমি!" মনে আছে? এই ডায়ালগে আপনি ক্ল্যাপ নিয়েছিলেন। স্টেজে আপনার পাশে আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না।'

আচমকা গেয়ে উঠলো রজনী। একদম হঠাৎ। যেন কথার জবাবে গান: "বাঁধিয়া বিনোদ বেণী—" এক পাক গেয়েই থেমে গেল রজনী তারপর আপনা থেকেই বলল—'হল করতে যাচ্ছেন ভালই। বাধা দেব না। কিন্তু অনেক বিপদ, বুঝলেন। বাবাকে দেখলাম। বড়বাবুকে দেখেছি। এখন নিজে ভুগছি।'

—'কেন? আপনাদের তো ভালোই চলছে।'

—'খারাপ তো চলার কথা নয়। কিন্তু এখন খারাপ চলছে। আমরা শো বন্ধ করে দেব। কত আর লস দেব বলুন?'

—'লস কেন হবে?'

—'লস তো হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কোন হিসেব জানিনে। সবাই গোলমাল করছে। আটঘাট বেঁধেই দল করেছিলাম। হাজার হোক আমি একজন মেয়েমানুষ তো। আমার কথা সব জায়গায় খাটবে কেন!'

—'একথা বলছেন কেন?'

—'বেশিদূর পড়াশুনো করি নি। ধারাপাতে এগারোর নামতায় গিয়ে যেই আটকে গেলাম—অমনি মা আমায় স্টেজে টেনে নিলো। পড়বার মধ্যে রবি ঠাকুরের শ্যামা কবিতাটা শুধু মুখস্থ আছে—'

নিজেই আবার শুরু করল রজনী। 'অবিশ্যি ভালো ভালো লোকের সঙ্গ পেয়েছি। মায়ের পরিচয়ে। বাবার পরিচয়ে। বড়বাবুর পরিচয়ে! আমার নিজেরও যেটুকু অভিনয়ের জোর– তার জোরেও সঙ্গ পেয়েছি। কৃষ্ণচন্দ্র গাইতেন: "অন্ধ হৃদয় কেঁদে কেঁদে ফেরে—"। গলায় কি ছিল তাঁর জানি না। আমার বুক ভরে কান্না আসত। গোলাম হোসেন করতেন "অহীনবাবু"। আমি "আলেয়া"। স্টেজে ঢুকে দেখি তিনি এককোণে বসে আছেন। ঢুকতেই চাপা স্বরে বললেন—কাছে আয়। পিঠে হাত রাখ। এগিয়ে গিয়ে হাত রাখতেই

উনি এক্সপ্রেশন দিয়ে হাসলেন। আর অমনি উল্টোদিকে থেকে ক্যামেরার ক্লিক। সেই আমার জীবনে প্রথম ফ্লাশ—

'ভালবাসাও পেয়েছি অনেক। অনেক গুণীর সঙ্গ পেয়েছি। আমি লেখা-পড়া করি নি। সামান্য একটা মেয়ে। বড় বড়রা হাতে ধরে স্টেজে নিয়ে গেছেন। ভালবেসে চান্স দিয়েছেন। ওঁদের কথা আলাদা কিন্তু এখানকার লোকগুলো দেখুন।'

—'সবাই তো খারাপ নয়।'

—'তা বলছি না। তবে "কবিয়ালে"র শো আর করছি না। এত দেনা কি করে হয়ে গেল বুঝি না।'

—'অ্যাকাউণ্টস দেখতেন না আপনি ?'

—'আগে সবই দেখতাম! একদিন রাগারাগি করে সব ছেড়ে দিলাম। আমার স্বামী আর তৃপ্তিবাবু আকাউণ্টসের ভার নিলেন—'

—'তৃপ্তিবাবু তো পাকা লোক! হিসেবের গণ্ডগোল হওয়ার তো কথা নয়। আপনাদের টিমটিও ভাল। "কবিয়ালে" রাজন করেন তো তৃপ্তিবাবু।'

—'ভীষণ পাকা লোক? সেটাই তো মুশকিল হয়েছে। আমাদের টিমও ভীষণ ভাল। যাক গিয়ে, নাটক কতদূর ?'

—'লেখা শেষ। এবারে রিহার্সেল দিতে দিতে যা কিছু বদলাবে—'

—'হল দেখে রিহর্সেলে নামা যাবে।'

—'হ্যাঁ। হলের এমন সন্ধান পাব আগে ভাবিনি।'

—'আজ দেখে আসুন বিকেলে।'

—'দেখতে যাচ্ছি। কিন্তু টাকার জোগাড় নেই এখনো!'

—'হয়ে যাবে। কিছু কি আটকায়।' বলতে বলতেই রজনী নিজের মনোমত গেয়ে ফেলল :

"মন মন্দিরে মম বিহর তুমি
নিরজনে রাখি তাই—"

"নীলদর্পণের" এই গান কিছুতেই ভুলতে পারি নি। অথচ সেই কবে করেছি।'

—'আপনার টাকটা আজও দিতে পারি নি—'

অমিয় এমন আচমকা সেদিনকার সেই টাকার কথা তোলায় রজনী তাকিয়ে পড়ল তার মুখের দিক।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে খানিক পরে বলল—'পরে দিয়ে দেবেন।'

॥ ছয় ॥

বন্দোবস্ত খারাপ নয়। দেওয়াল ঘেরা কাঠা চৌদ্দ জায়গা। টানা হল। লম্বা ঝোলানো বারান্দা। দু'দুটো বাথরুম আছে। আজকাল দর্শকরা নাটকের আগে পরে চা খেতে খেতে আলাপ আলোচনা করতে ভালবাসে। চায়ের দোকান করবার মত একটা জায়গাও রয়েছে ভেতরে। সিটগুলো বদলাতে হবে। স্টেজে অনেক কাজ আছে। ইলেকট্রিক লাইন আরও একটা টানা দরকার। মেক-আপ রুম বলতে কিছুই নেই। ভাড়া ঠিক হল প্রতি শো একশো ষাট টাকা। ছ মাসের চুক্তি। আগাম পেমেণ্ট। টাকা দিল দুর্গাদাস। হুণ্ডিতে রাত আটটার ভেতর সব কমপ্লিট। বাড়ি ফিরতে লীলা বলল, 'একটা পুজো দিয়ে ঢুকবে বাড়িটায়—'

অমিয়র কী মনে পড়তে বলল, 'জানো একটা নারকেল গাছ আছে কম্পা-উণ্ডের ভেতর।'

—'ডাবের ওপর অধিকার থাকবে আমাদের ?'

—'আগে দ্যাখো নাটক কেমন লাগে! তার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। প্রথম দিনের বিহার্সেল বজনীদের বাড়িতে—'

—'ভালো করেছো। কোন বাড়িতে হলে বিহার্সেলটা ভাল হয়। বিষ্ণুবাবুকে জানিয়েছ ?'

—'অনেককেই জানানো হয় নি এখনো। শংকর তো ক্ষেপে লাল হয়ে আছে—'

—'কেন ?'

—'"ফেরিওয়ালার মৃত্যু" রাতারাতি তুলে দেওয়ায় ও রীতিমত হার্ট হয়েছে।'

—'তা তো হবেই। সবে জমে উঠেছিল।'

—'আমার ভাল লাগছিল না। বোঝার মত ঘাড়ে চেপে ছিল আমার। কোন আনন্দ পাচ্ছিলাম না। শংকর ওরা বোঝেই না—দর্শক হলেই যে নাটক সফল এ-কথা কে বলেছে ওদের ?'

—'ওদের নিয়েই তো তুমি এগিয়েছো এতদিন।'

—'মানছি। কিন্তু কোথাও কোথাও তো আমাকে এগিয়ে গিয়ে ঠিক কথাটা বলতে হবে।'

—'ওদের যদি তা ঠিক বলে মনে না হয় ?'

—'দলের একটা ডিসিপ্লিন আছে তো।'

—'ডিসিপ্লিনের নামে যদি তুমি ডিকটেটর হয়ে দাঁড়াও।'

—'আমিও ডিসিপ্লিনের বাইরে নয় লীলা। শংকরের কথা বলছো তুমি। ও আজ ছ'বছর আমাদের দলে। বর্ধমানের শো করতে গিয়ে ওকে পাই মনে আছে। খুব শখ—থিয়েটারে নামবে। স্টেজের পাশে গ্রীনরুমের দিকটায় ঘুরঘুর করছিল। কলকাতায় এসে দেখা করতে বললাম। ভেবেছিলাম—আসবে না। এল একদিন। পরীক্ষা করার জন্যে একমাস পরে ডেট দিয়ে দেখা করতে বললাম। তখনো এল। সেবারে বললাম, 'একটা কিছু কাজ জোগাড় ক'রে এসে দেখা করুন।'

লীলা এখানে হেসে ফেলল। 'কাজ জোগাড়ও করে এল। বড়বাজারে বাসন পালিশের কাজ। দিন আড়াই টাকা!'

—'তারপর শংকরকে নিতে বাধ্য হলাম। সময় মত শোয়ের ভেতর সেট বদলাতো। আর রিহার্সেলের সময় বসে শুনতো। একদিন অরগানের ব্রজবাবু আসেন নি। ও দেখি দিব্যি গৎ তুলছে বসে বসে। আমায় দেখেই বলল, 'বাজাবো দাদা ?'

—'বললাম, বাজাও।'

—'তারপর থেকে তো গাইছে, বাজাচ্ছে, হাসির সিনে হাসাচ্ছে দর্শককে। ও থিয়েটারের ডিসিপ্লিন জানে। ওকে কিছু বলতে হবে না। শংকরের মত লোক এখন আমার পাশে থাকা দরকার। দুর্গালালের কাছ থেকে এত টাকার ঝক্কি নিলাম মাথায়। ধর যদি নাটক না লাগে! তখন? তখন কোথায় দাঁড়াব আমরা? নাটক শুধু লাগলেই চলবে না। লাভ হওয়া চাই। দুর্গালালের সুদের খাঁই তো জানো।'

—'আমার চাকরিটা তো আছে। ভাবনা কিসের তোমার!'

—'তুমিই তো আমার ভাবনা। নাটকের জন্যে, আমার জন্যে—আর কতকাল এত খাটবে। জানি না সামনে কি আছে।'

আজ রিহার্সেলের থার্ড দিন। শশাঙ্কবাবু খানিকক্ষণ বসেছিলেন। তারপর সেই যে ভেতরের ঘরে গেলেন—আর বেরোন নি। রজনীর বড় ছেলেও খানিকক্ষণ ছিল। তারপর সেও উঠে গেছে। অমিয় ভাবতে পারে নি—রজনী এত তাড়াতাড়ি

খাতা দেখে লাইনগুলো মুখস্থ বলে যেতে পারবে। এর আগে মাত্র দু'দিন পড়েছে।

'সুজাতা' নাটকে শংকর হয়েছে দুলাল ফুর্তিবাজ থার্ড ইয়ার এম বি বি এস স্টুডেন্ট। গান আছে। নাচ আছে। ওর অভিনয়ের ধাক্কায় নাটকের গল্প এগিয়ে যাবে।

একদিন অন্তর একদিন এখন একটানা রিহার্সেল দিয়ে যেতে হবে। তার ভেতরেই অমিয় কাঠের মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, পেন্টার লাগিয়েছে। সিটগুলো রিপেয়ার করে ঠিক করে নেওয়া হচ্ছে। তুলো, রেক্সিন, রঙ। দিনে, দশখানা করে সিট রিপেয়ার হচ্ছে। পাশাপাশি ফোকাস ঝোলানোর তিনটে স্ট্যাণ্ড দেওয়ালে গেঁথে বসাতে হচ্ছে। একটি সেটের ওপর সারাটি নাটক। তার দেওয়ালে কাঠ সেঁটে রঙ বুলিয়ে দুটি জানলা বসাতে হচ্ছে।

ভোরবেলা সুজাতা চা দিতে এসে ঘুমন্ত জীবনকে জাগানোর আগে নিজের কাপে আলতো একটা চুমুক দিয়েই এই দু'জানলার পর্দা সরিয়ে দিয়ে স্টেজে আলো এনে সব কিছু উজ্জ্বল করে দেবে। অডিটোরিয়াম তখন অন্ধকার।

সেই জায়গাটাই দু'বার রিহার্সেল হল। নববনিতা সুজাতা প্রথম ঘরনীর স্বাদ পাওয়ার পরদিন ভোরে ঠিক বউয়ের মত চা করে ঢুকেছে। লাল কালো ডুরে শাড়ি পরনে। কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে নিয়েছে সুজাতা। অভ্যস্ত ঘরনীর মতো দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলো সুজাতা। জীবন উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে।

—'এই ওঠো। ওঠো না। ভোর হয়ে গেছে। যাও বাজার করে নিয়ে আসবে। আজ আমি এখানে রান্না করব।'

জীবন কিছুতেই উঠছে না। তখন রজনী একটা বালিশ ধাঁই করে অমিয়র পিঠের ওপর কষালো। অমিয় উঠে দাঁড়াল। ঘুমে চোখ বন্ধ। তখন তাকে ধরে কলঘরে নিয়ে যাওয়ার পথে রজনী গতরাতের একটি ডায়ালগ রিপিট করল। কাশ্মীর যাবে না। হেঁটে হেঁটে কাশ্মীর।

গতরাতে জীবন নেশার ঝোঁকে বলেছিল। আগের সিনের কথা এ-সিনে এভাবে নিয়ে আসার কথা অমিয় ভাবে নি আগে। কিংবা বালিশ-পেটা করে তাকে তুলে দেওয়ার আইডিয়াটাও নতুন। রিহার্সেল দিতে রজনী যে কত খাঁজ-খোঁজ বের করে আনছে।

অমিয় প্রতি মিনিটে বুঝতে পারছে—সে এই প্রথম কমপিটেন্সের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভিনয় করবে। তার ডায়ালগ—রজনীর ঠোঁটে পড়ে আরও পাঁচ-ছটা মানে সুদ্ধ ফুটে উঠছে। এ রকম লোকের সঙ্গে সব সময় লড়াই করতে করতে

রিহার্সেল দিতে হয়। স্টেজেই দেখেছে রজনীকে। রিহার্সেলে যে রজনী আরও কত রঙের হয়ে ওঠে!

দু'টো ডায়ালগের মাঝখানে চল্লিশ সেকেণ্ডের জন্যে খচ্ করে সেই গানটা ধরে দিল: বাঁধিয়া বিনোদ বেণী—ই—ই—'

নজরুলের গান। রাগাশ্রয়ী সুরে গলা জলের মত বয়ে যেতে যেতে এক সময় ব্রেক কষল। অমনি সেই গলা থেকেই সুজাতার সংলাপ ছিটকে বেরিয়ে এল: সেই থেকে কচর কচর করছো।

গ্রুপের সবাই চলে গেছে। শংকর ছিল। আর ছিল বিষ্ণু দত্ত। কাগজের অফিস থেকে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেছে। শেষ ডিমসেদ্ধটা সোফায় বসে বসেই একটু কাত হয়ে মেঝেতে ঠুকছিল। রাত সওয়া দশটা হবে। এমন সময় কোণের ফোনটা বেজে উঠলো।

রজনী উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠলো।

—'আপনাকে তো বলেছি, ফোনে এমন খারাপ খারাপ কথা বলবেন না।

ঘর ঠাণ্ডা। তিনজনই একসঙ্গে রজনীর দিকে তাকিয়ে পড়ল। ওপাশের কথা শোনা যাচ্ছে না। রজনী আবার বলল, 'শো আর হবে না। লোক হবে। টিকিট বিক্রি হবে। অথচ লাভ হবে না। লোকসান বেড়েই যাবে। ও আবদারে আমি আর নেই।'

ফোনের ওপাশ থেকে আবার খানিক কি শুনলো রজনী। তারপর বেশ রেগেই বলল, 'আপনাকে বিয়ের কথা আমি কোনদিনই ভাবি নি। ও সব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। আমি ফোন রেখে দিচ্ছি—'

বলেও রাখতে পারলো না রজনী। কানে ফোন। মুখ আরও শক্ত হয়ে উঠল।

—'আপনার বয়স হয়েছে এখন। ফোনে খারাপ খারাপ কথা বলার বয়স আর নেই আপনার বললাম তো, আমি ক'টি ছেলেমেয়ের মা। আমার ফিরে বিয়ে বসার কোন কারণ ঘটে নি।'

অমিয় এগিয়ে এসে রজনীর কানে কানে খুব আস্তে আস্তে বলল, 'কথা চালিয়ে যান। আমরা আসছি এখুনি।'

রজনী ফোন হাতে চেপে ধরে নিরুপায় ভঙ্গীতে বলল, 'তৃপ্তি আমার জীবন ফোনে ফোনে অসহ্য করে তুলেছে। এতটা বয়স হল লোকটার শুধু শুধুই—'

অমিয় বিষ্ণু আর শংকরকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কথা চালান। থামবেন না। আমরা এখুনি আসছি। এখন বি কে পালের দোকানের কাছে

ছাড়া কোথাও আর পাবলিক ফোন নেই। কাছাকাছিই তৃপ্তির বাড়ি। কথা চালিয়ে যান। আমরা আসছি। ভাল ভাল কথা বলুন দু'একটা—'

জুলাইয়ের মাঝামাঝি। বৃষ্টি হচ্ছে। থেমে যাচ্ছে। তাতে রাস্তার আলো। ভাগ্যি ভাল। বেরোতেই ট্যাক্সি পেল।

ট্যাক্সিতে বসে বিষ্ণু বলল, 'আমি কোনদিন কারো গায়ে হাত দিই নি। আমি ও সব পারব না।'

শংকর বলল, 'শালাকে আগে পাই। তারপর বানাবো।'

বানাবার দরকার হল না। ছোট ওষুধের দোকানে নিওনের নিচে ওষুধ কোম্পানীর অনেকগুলো রঙীন লিটারেচার। তৃপ্তির গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবির হাতা জুড়ে আলোর নানা পোকা বসেছে। সেদিকে খেয়াল নেই। শংকর কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরতেই তৃপ্তি ফিরে তাকালো। টেলিফোন হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। দোকানদার ছুটে এল। এমনিতে দোকানটা ফাঁকা তখন।

শংকর পাঁজাকোলে তৃপ্তিকে তুলতে তুলতে দোকানদারকে বলল, 'রাত হয়ে গেছে তো! বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

—'আমি চ্যাচাবো কিন্তু। কি হচ্ছে মাইরি! এ সব কি?'

—'কতটা খেয়েছো!'

—'তোমার বাপের পয়সায়। ছাড়ো বলছি। আমার টেলিফোনটা কেটে গেল।'

ট্যাক্সি দাঁড় করানোই ছিল। সর্দারজীকে অমিয় কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ভারি বিমার সর্দারজী।' ট্যাক্সি ছাড়তে প্রথম কথা বলল অমিয়। 'লাইন কেটে যায় নি? একদম সামনাসামনি কথা হবে এখন! সেখানেই তো যাচ্ছি আমরা।'

রজনী এতটা ভাবেনি। দোতলায় ঠেলে তুলতে তৃপ্তি একদম ফায়ার। এভাবে ধরা পড়ে গিয়ে আরও তেরিয়া হয়ে চেঁচাতে লাগল। মুখে তখন যা তা। সেই চীৎকারে শশাঙ্ক উঠে এল। নীল পাজামা। ওপরের দিকে শাদা ফতুয়া। পাট করে আঁচড়ানো চুল মাথায়।

—'ত্মাখো শশাঙ্ক তোমার বউয়ের কাণ্ড তার পিরীতের লোকদের দিয়ে এই মাঝ রাতে—'

এখানে শংকর একটি চড় কষালো। তৃপ্তির গালে। একদম সোজাসুজি।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল তৃপ্তি। তারপর হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বলতে

লাগল, 'শো বন্ধ। শশাঙ্ককে কব্জা করে দল তুলে দিলে রজনী। আমায় করলে রিফিউজ—

—'বলেছি তো তৃপ্তি। আমি তোমায় ও চোখে দেখি না। তুমি রোজ মদ গিলে বাড়ি ফেরার পথে আমায় ফোন তুলে না হোক কত কথা বল। আজ ধরা পড়ে এত চীৎকার! কান্নাকাটি! শো চালু রেখে হবে কি বল? লোকসান বাড়বে তো শুধু! টিকিট বিক্রির কোন হিসেবই পাব না। অথচ স্টেজে ঢুকে দেখি হাউস-ফুল। তাতে তো তোমারই লাভ। তুমি চাও অনন্তকাল ধরে তাই চলুক।

অমিয় তৃপ্তির ঘাড়টা ধরে বলল, 'ক্ষমা চাও। বল আর কোনদিন এ রকম করবে না।'

সব চেয়ে অস্বস্তি লাগছিল বিষ্ণুর। এ বাড়িটা শশাঙ্ক দত্তের। এই মানুষটা এখনো একটা কথা বলেনি। ক'দিন আগে এরই সঙ্গে বিষ্ণু কাঁচালঙ্কার চাষ নিয়ে ডিটেলে ডিসকাস করেছে। বসার ঘরে খানিক আগে রিহার্সেল হচ্ছিল। সে ঘরে এখন আসল নাটক হচ্ছে। কোন রিহার্সেল ছাড়াই। এ কথাটাই প্রথম মনে এল ড্রামা ক্রিটিক বিষ্ণু দত্তর।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি চোখ মুছছে। মধ্যবয়সী মানুষ। অমিয় সেদিন রাজনের রোলে তৃপ্তির অ্যাকটিং দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। আজ তাকেই এই অমানুষিক অবস্থার সাক্ষী হতে হচ্ছে। আস্তে বলল, 'আর করব না বললেই ছেড়ে দেব।'

এই প্রথম শশাঙ্ক কথা বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে—'

কথাটা কার জন্যে বোঝা গেল না। রজনীকে লক্ষ্য করে? না অমিয়দের লক্ষ্য করে? কিংবা সবাইকে?

বিষ্ণু বলল, 'চল যাওয়া যাক।'

শশাঙ্ক বলল, 'তৃপ্তিবাবু বাড়ি যাবেন কি করে? বাস-ট্রাম কি আছে এখন?'

রজনী তার স্বামীকে বলল, 'সে ভাবনা তৃপ্তির। তোমার নয়। রোজ ফোন করে জ্বালায়।'

—'তা আমি কি করতে পারি?'

—'তুমি কে হও আমার?'

এর পরই অমিয় তাড়াতাড়ি পায়ে নেমে এল তৃপ্তিকে নিয়ে। 'কোন চিন্তা নেই শশাঙ্কবাবু। ও পথ দিয়ে যাবো তো আমরা—নামিয়ে দিয়ে যাব তৃপ্তিকে—'

কথাটা একটা চড়ের মত এসে রজনীর নাকের ওপর পড়ল। চিড়বিড় করে

উঠলো সারাটা শরীর। ছুটে দোতলায় ঝুল বারান্দায় গেল। তৃপ্তিকে নিয়ে ওরা ট্যাক্সিতে উঠেছে।

ঘরে ফিরে এসে শশাঙ্ককে পেল। 'তৃপ্তিকে বাড়ি পৌঁছে দেবার ভার ওদের?'

—'ওরা তো তোমার বন্ধু। দিলেই বা—'

—'জলে ভেসে আসা বন্ধু!'

—'তাই বলল নাকি তৃপ্তি!'

নিজেকে আর রাখতে পারল না রজনী। তৃপ্তি বলেছিল, তার পীরিতের লোকদের দিয়ে। রজনী সামনে ছুটে গিয়ে বলল, 'তৃপ্তি তোমার বন্ধু। তাকে তো মুখ ফুটে একটা কথা বললে না। তোমরা দু'জনে মিলে দলটা তুলে দিলে। সাত আট লাখ টাকার বিজনেসের পর এখন আমাদের মাথায় দেনা!' এখানে থেমে নিজেকে সংশোধন করল রজনী। 'আমার একার মাথায় দেনা চাপিয়েছ! কার সঙ্গে মিশে? না, যে লোকটা তোমার বউকে রোজ ফোন তুলে খারাপ কথা বলবে।'

—'এত রাতে আমার চেঁচামেচি ভাল লাগে না রজনী। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। আমি পুলিশ ডাকব। এ সব মারধোর আমার ভাল লাগে না।'

—'বাড়ির বাইরে গিয়ে পুলিশ ডাকো। এ বাড়ি আমার। ভাড়া আমি দিই। চাকরি করে দিয়েছিলাম। সে চাকরি রাখতে পারো নি—চাকরি যাওয়ার পর—ওরা তখন খুব ছোট—তুমি সেদিন কেঁদে ফেললে—আমি বলেছিলাম ভেবো না। আমি তো অভিনয় করি। এই করেই সংসার চলে যাবে। তারপর? তারপর তুমি কাজকর্ম থেকে পাকাপাকি রিটায়ার করলে।'

নিরুপায় আক্রোশে রজনা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। কখন অজান্তে নিচের ঠোঁট উপরের পাটির দাঁতের কামড়ে আটকে গেছে। কার সঙ্গে সে লড়াই করবে! এই মানুষটিকে নিয়ে সংসার শুরু করেছিল। এখন আর সে একা নয়। ক'টি ছেলেমেয়ের মা। এখন সে কোথায় যাবে? শশাঙ্ক রজনীর এই বন্ধনের কথা জানে। জানে বলেই এত নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত বলেই তৃপ্তিকে কোন বাধা দেয়নি। কিন্তু, বাধা না দিয়ে পারেই বা কি করে? আমি তো ওর বউ!

তার সামনে শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে। এই লোকটা এতদূর অপদার্থ—এতদূর অকর্মণ্য—একবার এগিয়ে গিয়ে তৃপ্তির কাছে হিসেবটা পর্যন্ত চাইতে পারে না। আমার সম্মান না হয় ওর কাছে কানাকড়িরও দাম পায় না। কিন্তু রং মেখে আমি যে

এতদিন অভিনয় করলাম—তার টাকা পয়সা যে-লোকটা ঠকালো—তাকে পিটিয়ে টাকা আদায় না করতে পারলে শশাঙ্কর নিশ্চিন্ত আহার বিশ্রামও তো ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সে খেয়াল নেই মানুষটার। কি দিয়ে তৈরি!

—'তুমি কি করে তৃপ্তির বাড়ি পৌছনো নিয়ে ভেবে সারা হচ্ছিলে? আমার তো মাথায় আসে না কিছুতেই।'

শশাঙ্ক সে কথায় গেলই না। পরিষ্কার জানতে চাইল, 'তুমি চাও না আমি এ-বাড়িতে থাকি?'

—'কোথায় আর যাবে! ফড়েপুকুরে? সে পাট তো কবে চুকিয়ে দিয়ে এসেছো।' বলতে বলতে রজনী ভেতরের ঘরে চলে এল। যাবার সময় বলে গেল, 'আলোটা নিভিয়ে দিও। এ মাসে মোটা বিল এসেছে ইলেক্ট্রিকের।'

আশ্চর্য কাণ্ড! শুয়ে শুয়ে গাইতে ইচ্ছে করল রজনীর। একসঙ্গে অনেক গান ভীড় করে আসছে। কোনটা রেখে কোনটা গাইবে?

"মন মন্দিরে মম বিহরো তুমি
নিরজনে রাখি তাই—"

'বিহরোর' জায়গায় এসে রজনীর গলায় একটা সামান্য মোচড ভাষা, শব্দ, সুর —সব মিশিয়ে অন্য জিনিস করে দেয়। পাশের ঘরে বড় ছেলে ঘুমোচ্ছে। কিংবা হয়ত তারই মত জেগে শুয়ে আছে। ছেলের বয়স এখন সতের-আঠেরো। আর স্কুলে যায় না। শুধু টো টো। খাতা, কাগজ, কলমের ব্যবসা করবে বলে তার কাছে টাকা চেয়েছিল। দেয়নি রজনী। টাকাগুলো নষ্ট করবে। এই টাকা আয় করেই তার কাল হয়েছে। সারাটা সংসার তার মুখের দিকে তাকিয়ে। সংসারে শশাঙ্ক যদি টাকা আনার লোক হত তাহলে এত গণ্ডগোল বাধতো না।

অবস্থাই রজনীকে টাকা আয় করতে বাধ্য করেছে। শশাঙ্ক যদি একটু বুঝতো। এখন সে কোনদিক সামলাবে। "কবিয়ালে"র দেনাদায়িক তার জন্যে হাঁ করে বসে আছে। অথচ এই "কবিয়াল" নাটক গত এক বছরে তাদের সাচ্ছল্য দিয়েছিল। দিয়েছিল স্বস্তি। তাও টিকিয়ে রাখতে পারল না শশাঙ্ক ঠিক তার ভারি গয়নাগুলোর মত। কেমন সোজা উড়িয়ে দিল। বন্ধকী ঘর থেকে আর ফিরল না। অথচ কোন ভাবলেশ নেই শশাঙ্কর।

শশাঙ্ক খোঁজও নেয় না আমি কি করে টাকা আনি। কোত্থেকে টাকা পাই। এখন তো অনেকদিন-সরল ভাবে টাকা আসে। এখন থিয়েটারে এক নাইট আমি করলে তিনশো টাকা যে-কেউ দেবে। আমার নামে টিকিট বিক্রি

হয়। যাত্রাদলে জয়েন করলে মাস মাইনে ছাড়া বছরে অন্তত বিশ-বাইশ হাজার টাকার রয়ালটি পাব।

কিন্তু সেদিন?

যখন খোকনের টাইফায়েড। মাসে চার-পাচ দিন কাজ পাই না। পেলেও পার নাইট চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা মাত্র। অফিস-ক্লাবের নাটক সব। তাতেও কম্পিটিশন। কত ক্যাণ্ডিডেট। ক্লাবের কর্তারা কাকে ফেলে কাকে নেবে? যে রিহার্সেলের পর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে। তাকেই নেবে।

সেই সব ক্ষেপও ধরতে হয়েছে রজনীকে। পাল্লা দিয়ে। কম্পিটিশন করে। খোকন ছোট। শেষের মেয়ে ডুটো আরও ছোট। খোকনের ওপরের মেয়েটা— আগে ওরা স্বামীস্ত্রীতে বড় মেয়ে বলে ডাকত—সেই মালতী রান্না করে রাখত। হাত পুড়িয়ে। ভাত পুড়িয়ে। এ সংসারে মালতী আমার দুঃখ বুঝতো। বিয়ে হয়ে গিয়ে মেয়েটা আর আসে না।

তখনকার দিনে—সেই সেদিন আমার বিসর্জন হয়।

উনিশশো চৌষট্টি সনের একুশে সেপ্টেম্বর।

সেদিনও তো শশাঙ্ক এতটা নির্বিকার ছিল না। অন্তত সেদিনের জন্যে শশাঙ্ক স্বামীর মত ব্যবহার করছিল। তবে বাড়ি ফেরার পরে। অনেক রাতে। সিগারেটের ছাইতে শাড়ির আঁচলে তখন তিনটে ফুটো। মুখে গন্ধ। রাত অনেক। দরজা খুলে দিয়েছিল শশাঙ্ক নিজে।

পরিষ্কার মনে পড়ল রজনীর। তারিখটা ছিল একুশে সেপ্টেম্বর। ঠিক পুজোর আগেটায়। খোকনের টাইফায়েড। সাতদিন হয়ে গেল ওষুধ পড়ছে না। মালতী একা আর কত জলপটি দেবে মাথায়।

বিকেল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। অফিস ক্লাবের বই। বিকেল থেকেই রিহার্সেল হল। রজনীর মৌন রোল। আজ আর বইয়ের নাম মনে পড়ছে না। পাট কোম্পানীর মোটা মাইনের বাবুদের বার্ষিক হর্ষপ্রকাশের জন্যে সোশালে সে বইটি হচ্ছিল। ডিরেকটর একজন মাঝবয়সী গুদামবাবু। ঢোলা হাতার পাঞ্জাবিতে সেণ্ট মেখে রিহার্সেল রুমে আসত। মোশান দেওয়ার সময় রজনীর গায়ে হাত রেখে বোঝাতো ফিলিংস কি করে আসে! কথায় কথায় দুর্গাদাস, অহীন চৌধুরীর নাম লোকটার মুখে খইয়ের মত ফুটতো। কাছে এসে কথা বললে রামের মিহি গন্ধ ভেসে আসতো।

সেদিন রিহার্সেলে শুধু সেই মল্লিকবাবুটি হাজির দিলেন। আর কেউ আসেনি।

পৌঁছেই রজনী বুঝলো তার আর বেরোবার পথ নেই। সে নিজেও সেদিন বেরোতে চাইছিল না। দেখি না লোকটা কতদূর এগোয়। বোঝাই যেত—বাবুটি কাঁচা পয়সার মালিক। ফাইন আদ্দির বুক পকেট থেকে নোটের গোছার আভা ফুটে উঠত।

রজনী বলেছিল, 'গাটা ম্যাজম্যাজ করছে।'

—'দুপুরে ঘুমিয়েছেন নিশ্চয়। আপনাদের—বিশেষ করে আর্টিস্টদের সতর্ক থাকা উচিত। আসুন রিহার্সেল থাক আজ। কেউ বোধহয় আর আসবে না।

বলতে বলতে লোকটা ছিপি খুলে ফেলেছিল। 'ইফ্ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড। কুঁজো থেকে একটু জল গড়িয়ে দেন যদি।'

জল এগিয়ে দিয়ে রজনী বলেছিল—'আজ চলি—বৃষ্টি আসছে ঝেঁপে- '

দোতলার ঘর থেকেই শেয়ালদার ভিড় দেখা যাচ্ছিল। বাতাসে শরতের গুড়ো উড়ছিল। ঘরে খোকনের জ্বর। সেই অবস্থায় সেজে রিহার্সেলে দিতে আসতে হয়েছে। কাজে বেরোলে মেয়েদের পরিপাটি হয়ে বেরোতে হয়। নইলে হয় না। সিল্কের অসাবধানী আঁচল সরে যেতেই টেনে ঠিক করেছিল রজনী। 'আমি চলি—'

—'উঁহু। আরেকটা গ্লাস নিন না। একটুখানি। বেশ ফ্রেস হয়ে যাবেন -'

লোকটার অনুরোধ করবার কায়দাই ছিল অন্যরকম। অফিস সোশালের সুভেনিরগুলো চামড়ার বাঁধাই করে তাকে থাক থাক সাজানো। প্রত্যেক সুভেনিরেই পরিচালক হিসাবে মল্লিকবাবুর ছবি। শশাঙ্কের চেয়ে কিছু বড়ই ছিল লোকটা।

খুব ফ্রেস হয়ে গেল রজনী। ভীষণ ফ্রেস। তেমন কোনদিন খায়নি রজনী। অন্তত সেদিনের আগে। মল্লিকবাবু নিজে গাইছিলেন। রসিক গাইয়ে। নিধুবাবুর গান। তাল, লয় কিছুই ছিল না। ছিল শুধু নেশা। রজনীকে কাছে পাওয়ার নেশা।

রজনীও গলা মিলিয়ে ধরেছিল।

তারপর সেখান থেকে কোথায় গিয়েছিল—রজনীর তা মনে নেই। সে নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছিল না সেদিন। বুঝতে পারছিল - কী একটা হয়ে যাচ্ছে।

পরিষ্কার বিছানা। ধবধবে। সুন্দর অ্যাটাচড্ বাথ। মাংসের বড়া। তারপর আর মনে নেই। মল্লিকবাবুদের অফিসের গাড়ি নামিয়ে দিয়ে হুস করে চলে

গিয়েছিল। গলির মুখে পোড়া পেট্রোলের গন্ধটা বাতাসে মিশে যেতে তবে রজনী দোতলায় উঠেছিল। রাস্তার আলোয় দোতলার ব্যালকনি থেকে ঝুলে পড়া ছায়াটা যে শশাঙ্কর তা নিচে থাকতেই বুঝতে পেরেছিল রজনী।

দরজা খুলে প্রথমে যে কথা বলেছিল শশাঙ্ক তা হল, 'ভোর হলেই এলে পারতে। একদম চা জলখাবার সেরে। রিহার্সেলও ভাল হত।'

রজনীর তখন গা-হাত-পা পুড়ে যাচ্ছিল। এক ছুটে কলঘর। মিনিট পনের বাদে সেখান থেকে আরেক ছুটে একদম বিছানায়। ঘুম ভেঙেছিল পরদিন সকাল আটটায়। সাবধানে উঠে প্রথমেই সাতখানা দশ টাকার নোট বালিশের নিচ থেকে বের করে দেরাজে তুলে রেখেছিল। গুনে গুনে। এক নাইটের অভিনয়ের চেয়েও কুড়ি টাকা বেশি।

॥ সাত ॥

সেটের রঙ তখনো শুকোয়নি। কাঁচা রঙের ভেতর স্টেজ রিহার্সেল চলেছে সকাল থেকে। অমিয় এগিয়ে এসে স্কুল টিচার আভার জন্যে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসল। নকল ঘরনী সুজাতাকে অমিয়, ওরফে জীবন বলল, 'একটু চিনির সরবৎ করে দাও। বেশ মাখা মাখা করে চিনি দিয়ে। লেবু দিয়ে। জল দিয়ে।'

আভার রোলে কল্যাণী নেমেছে। এম-এ, বি টি। বিধবা মাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে বেড়াতে এসেছে। সেখানে এসে হাটখোলার জীবনের সঙ্গে দেখা। জীবন বড় মজাদার মানুষ। সোনাগাছির সুজাতাকে নিয়ে বাইরে ফুর্তি করতে এসে অনাহুত চেঞ্জারদের বারবার এসে পড়ায় জীবন বিব্রত, ক্ষুব্ধ। খালি ভদ্রতা করতে হচ্ছে। যখনই মদের বোতল নিয়ে বসে—তখনই কেউ না কেউ এসে হাজির হয়। তখনই গোলমাল বাধে। সুজাতাকে সাজতে হয় বউ। আনতে হয় চা করে। কিংবা সরবৎ করে। সুজাতার তো এসব অভ্যাস নেই। তাই ঘোমটা কোথায় থাকবে বার বার জীবন আকারে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয় সুজাতাকে। জীবন রামের বোতল বুককেসের পেছনে সরিয়ে রাখে।

এ রকম অবস্থায় আভাকে দেখে জীবন ঢলে পড়ল। সুজাতা সব বুঝতে পেরেও জানে—সে বাইরে ফুর্তির জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এসেছে। তার অভিমান, রাগ এসব মানায় না। তাহলে যে চুক্তি থাকে না।

তবু সে ছদ্ম বউ সাজার সময়কার সিঁদুর আঁকড়ে থাকে। জীবনের মদ খাওয়ার ডাকে যোগ দিতে পারে না। সিগারেট হাতে নিয়েও বলে—'না থাক। ইচ্ছে করছে না। গলা খুসখুস করছে।'

সুজাতা সরবৎ করতে ভেতরে গেল। সেই ফাঁকে জীবন আভার হাত ধরল—একটুখানি। তারপর নারীসন্ধানী মানুষের উপযুক্ত বাচালতা চতুরতা আবেগ সব মিশিয়ে জীবন কথা বলে যেতে লাগল।

অমিয়র নিজের লেখা নাটক। কাহিনীসূত্র একটি বিখ্যাত বাংলা গল্প। কিন্তু মূল থেকে অনেক সরে আসা। অনেক নতুন চরিত্র ঢুকিয়েছে অমিয়। পুরো তিন ঘন্টার নাটক। গান আছে।' তামাশা আছে। আছে সমাজের ছদ্ম গাম্ভীর্যের বেলুনগুলোকে পিন ফুটিয়ে চুপসে দেওয়া। বিষয়টাই কঠিন। অনেকটা, গ্লাস

উইথ কেয়ার। খুব গম্ভীর বিষয় নিয়ে গম্ভীর কথাবার্তা বললে এ নাটক কেউ বসে দেখবে না। অথচ অমিয় গম্ভীর কথাই বলতে চায়। তবে হাল্কা হাসির মোড়ক। দর্শক যেন হাসতে হাসতে থেমে গিয়ে অন্তত একবারও যেন ভাবে, আরে সত্যি তো! এ সব আমি জানি। এ রকমই তো হয়ে আসছে অনন্তকাল ধরে। তখন বিষাদ এসে তাকে পাকাপাকি দখল করে বসবে।

জীবন আর আভাকে কথা বলতে দিয়ে খানিক পরেই সুজাতা সরবৎ হাতে ফিরে এল।

—'লেবু দিয়েছো?'

—'লেবু তো আনোনি বাজার থেকে—'

—'আমি নিয়ে এলাম যে—'

—'উঃ! ওগুলো বিলিতি আমড়া।'

—'কলকাতার লেবুগুলো কি এখানে বিলিতি আমড়া?'

আভা হেসে ফেলল, 'তা কি করে হবে?'

জীবন বলল, 'আমি বাজারে গিয়ে হিন্দিতে বললাম। ওরা লেবুর বদলে আমড়া দিয়ে দিল। হিন্দিতে লেবু মানে আমড়া?'

রিহার্সেলের দর্শক বলতে "পঞ্চমুখে"র মেমবাররা। ফাউ আছে একজন। ড্রামা ক্রিটিক—বিষ্ণু দত্ত। সে এই সিনের রিহার্সেলে উঠে দাঁড়িয়ে একা বারবার তিনটি ক্ল্যাপ দিল। 'সামান্য জিনিসকে অমিয় ভীষণ জমিয়েছো।'

ফাঁকা স্টেজ থেকে অডিটোরিয়ামের বিষ্ণুকে অমিয় বলল, 'তাহলে নাটক লাগবে মনে হয়?'

—'মনে হয় কি। লেগে গেছে ধরে নাও।'

রজনী এগিয়ে এসে বলল, 'মেকআপের আরও তিন-চারখানা আয়না দরকার। নাগ কোম্পানিকে একবার বলবেন আজকে।'

—'ওই যা আছে তা দিয়েই চালাতে হবে।'

—'তা হয় না? সেকেণ্ড সিনের পর আমাকে বউ সেজে ঢুকতে হবে। দু'মিনিটের গ্যাপ মোটে। থার্ড সিনে মোট সতেরো মিনিট যাবে। ওই সতেরো মিনিটই বরবাদ হয়ে যাবে—যদি না আমি ঠিকমত সাজ পাল্টে সময়ে স্টেজে ঢুকতে পারি।'

—'আয়নার জন্যে আটকে যাবে বলছেন?'

—'হ্যাঁ, তখন চেঞ্জার সমিতির ছেলেরা যে যার চেয়ারে বসে মেকআপ নেবে।'

সময়টা মনে আছে আপনার! ক্রুশিয়াল সাত আট মিনিট। তার ভেতর সেট পাল্টাবে। আপনার, আমার সাজ পাল্টাবে। মুড পাল্টাবে।'

অমিয় হেসে বলল, 'আমাদের ভাগ্য পাল্টাবে! কিন্তু পাবলিসিটির টাকা দিয়ে আমার হাতে আর কিছু নেই রজনী।'

এই প্রথম বোধহয় শুধু নাম ধরে ডাকল অমিয়।

রজনী কোন আপত্তি করল না। আজ প্রায় সতেরো-আঠেরো দিন একটানা রিহার্সেল চলছে। নতুন নাটকের নিয়মই তাই। বলতে বলতে নতুন মানে বেরিয়ে আসছে।

দুটো বড় আলো দরকার। দরকার যে কত জিনিসের!'

রজনী বলল, 'আলোতে কত পড়বে?'

—'তা দেখেশুনে পুরনো কিনতে গেলেও সাড়ে তিনশোর ওপর—'

শংকর আর বিষ্ণু ফার্স্ট রোয়ের নতুন বানানো চেয়ারে পাশাপাশি বসে। সেখান থেকেই ওরা দু'জন প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো, 'ফোকাসের গোলমাল হলে নাটক মারা যাবে—'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

আভা করছিল কল্যাণী। একেবারে নতুন মেয়ে নয়। উত্তমের সঙ্গে দু'একটা ছবিতে মাঝারি রোল করেছে।

দাঁড়াবার জায়গার জন্যে অনেক জায়গাতেই তাকে মাথা খুঁড়তে হচ্ছে। সে হেসে বলে ফেলল, 'টেলিপ্যাথি!'

অমিয় স্টেজের ওপরে চেয়ারে বসে ছিল। সেখান থেকেই বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু টাকা আসবে কোত্থেকে? দুর্গালাল কি আর দেবে?'

রজনী বলল, 'ও সাড়ে তিনশো আমি দিয়ে দেব অমিয়। টিকিটের টাকা এলে ফেরৎ দিতে হবে কিন্তু।'

—'আপনি তো সেই পুরোনো টাকাই পাননি আজও।'

—'কোন্ টাকা?'

—'সেই যে—"ফেরিওয়ালার মৃত্যু"র জন্যে হল ভাড়া। তিনদিনের—'

—'আমি টাকার কথা ভুলি না।'

—'তাহলে নাগ কোম্পানিকে বলি। আয়না দু'খানার টাকাও দিন। একবারে শোধ হবে।'

—'আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।'

শংকর অমিয় বিষ্ণু একসঙ্গে তাকিয়ে পড়ল রজনীর মুখে। সিনের সঙ্গে মিলিয়ে প্রায় ডুরে শাড়িই পরেছে রজনী। পায়ের নখের নেল-পালিশ স্নানের জলে ধুয়ে ধুয়ে ফিকে গোলাপি। কথা বললে রজনীর ছোট হাঁ-মুখ দিয়ে সুন্দর সাজানো দাঁতের পাটির আভাস পাওয়া যায় সব সময়।

রিহার্সেলের ভেতর মিস্ত্রিরা খটাখট শব্দ তুলে অনর্গল কাজ করে চলেছে। গরমে রজনীর চিবুকে একটা বড় ফোঁটা এসে ঝুলছে। 'শশাঙ্ক আজ ক'দিন বাড়ি ফেরে নি। কোথায় গেল বুঝতে পারছি না। সেদিন রাত থেকেই একদম কথা বলছিল না—'

—'এই দেখুন! এত কাণ্ড চেপে গিয়ে রিহার্সেলে আসছেন রোজ? কী রকম লোক বলুন তো আপনি?'

—'বলব ভেবেছি। বলা হয়ে উঠে নি। রোজ ভেবেছি—আজ রিহার্সেল থেকে বাড়ি ফিরেই দেখব—শশাঙ্ক ফিরে এসেছে। কিন্তু আজও আসেনি।'

—'বলবেন তো।' অমিয় উঠে দাঁড়াল। 'আজ আপনি বাড়ি যান। দেখি খুঁজে।'

-'না না খুঁজতে যাবেন না। এখন এত কাজ। আপনার মাথার ওপরেই সব বড় বড় ঝক্কি। কত জিনিস মনে রাখতে হচ্ছে আপনাকে। এখন বিরক্ত করা -'

-'চেপে রেখেই ভুল করেছেন। আর ক'দিন পরেই নাটক নামবে—আর এ রকম মন নিয়ে আপনি অভিনয় করবেন? মেইন রোল। তা হয় নাকি। আগে বলবেন তো। ভদ্রলোক কোথায় যেতে পারেন? চলতো শঙ্ক - -'

বিষ্ণু বলল, 'তোমরা কোনদিক দিয়ে যাবে? আমায় একটু 'গন্ধর্বতে' নামিয়ে দিয়ে যাবে। কপি বাকি আছে একটা—'

—'তোমার তো ডিম সেদ্ধই শেষ হয়নি এখনো। ওই তো খোসাসুদ্ধ ঠুকে চলেছো।'

বিষ্ণু ডিমটা হাফশার্টের ঝুলপকেটে ফেলে দিল। 'আমি রেডি—'

—'না, একটু থাকো না ভাই। রজনী একা একা মিস্ত্রিদের মাঝে বোরড হয়ে যাবেন। চারদিক খটাখট আওয়াজ শুধু।

—'না না আমি ঠিক আছি। আপনারা তিনজনেই বরং ঘুরে আসুন। আমি ঠিক আছি। বরং ওদের কাজ দেখি ঘুরে ঘুরে—'

গন্ধর্ব অফিসে বিষ্ণুকে নামিয়ে দিয়ে ওদের দু'জনের বেশি ঘুরতে হল না।

কাছাকাছি ঢালাও বসবার বেঞ্চ। গ্লাস ও সোডা রাখার নড়বড়ে টেবিল। টিনের দরজা। মৌলালি ছাড়িয়ে ধর্মতলার দিকে থেকে বাঁ হাতে বিখ্যাত পানশালা। দরজা ঠেলে আন্দাজে ঢুকলো অমিয়।

প্রথমেই তৃপ্তির পিঠ চোখে পড়ল। সেই পাঞ্জাবিটাই গায়ে। তার মুখোমুখি শশাঙ্ক দত্ত বসে। ভদ্রলোকের সামনে কোন গ্লাশ বা সোডা নেই। গালে ক'দিনের না-কামানো দাড়ি।

তৃপ্তি দু'ই পুরুষের নুটবিহারীর বিখ্যাত ডায়ালগগুলো দিয়ে যাচ্ছে। সামনে গ্লাসে দিশী ঢালা রয়েছে। দু'টো থেকেই তৃপ্তি একটু একটু করে খাচ্ছে। অমিয়কে দেখে থমকে গেল। 'আজও তুলে নিয়ে যাবে নাকি?'

—'তোমাকে নয়। তোমার সামনের লোকটিকে।'

এবার শশাঙ্ক চোখ তুলে তাকালো। দেখেই বোঝা যায় একটুও পান করেনি। 'কি করে বুঝলেন—এখানে আছি?'

অমিয় আস্তে আস্তে বলল, 'সিওর ছিলাম না। তবে আন্দাজ করেছিলাম—তৃপ্তি সঙ্গে আছে। কি ছেলেমানুষি করছেন? উঠুন। আপনার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে আছে আপনাকে না দেখে। তাদের কথা তো ভাববেন?'

—'তাদের মা তো রয়েছে।'

—'মা সব দিতে পারে? চলুন দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

তৃপ্তি বলল, 'কেন ঝামেলা করছো। বেশ তো বসে আছে। খাচ্ছে না দাচ্ছে না। গল্প করছি দু'জনে নিরিবিলিতে।'

শংকর এগিয়ে এসে বলল, 'ছাখো দাদা—তোমার অ্যাকটিং ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। তোমায় ভক্তি করি। ধোলাই দিতে বাধ্য কোরো না। ভেতরে ভেতরে তুমি একটি হাড় বজ্জাত। চল। তুমিও উঠবে।'

শংকর তৃপ্তির কাঁধ ধরতেই—তৃপ্তি এক ঝটকায় তার কাঁধ সরিয়ে নিল। তারপর ফাঁকা সোডার বোতল ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে অমিয় আর শংকর দু'দিকে ছিটকে গেল। বোতলটা গিয়ে সিধে দেওয়ালে লেগে শব্দ করে ভেঙে পড়ল।

জায়গাটা এখন ফাঁকা বলে বিশেষ কেউ তাকালো না। কাউণ্টারের ফতুয়া গায়ে কালীবাবু জোরে বলল, 'কী হচ্ছে তৃপ্তি—'

শশাঙ্ক নিজেই উঠে দাঁড়াল। 'চলুন। এখানে থাকলে একটা সিন হয়ে যাবে।'

—'শশাঙ্ক। যেও না বলছি শশাঙ্ক। তোমার তৃপ্তিদা বলছি—'

—'এইতো ঘুরে আসছি। এখুনি ফিরে আসব তৃপ্তিদা—'

তৃপ্তির তখন নেশা হয়ে গেছে। ওরা তিনজনে বেরিয়ে যাবার মুখে শুনলো তৃপ্তি চেঁচাচ্ছে—'তোমরা সবাই রজনীর দলে যোগ দিলে শেষকালে—'

অমিয় কি বলবে? চুপচাপ তিনজনে এসে ট্যাক্সিতে উঠতেই অমিয় বলল, 'আউট্রাম ঘাট—'

গঙ্গার ধারে ওরা তিনজনে নেমে পড়ল। বিকেলের নদীতে ক্যালেণ্ডারের ছবির মতই সূর্যের আলো, সন্ধ্যার আসন্ন ছায়া। স্থির ভাসমান গাধাবোট। ফেরি-লঞ্চের পারাপার।

—'শশাঙ্কবাবু। এখন "পঞ্চমুখের" আমরা আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড। সেই দায়িত্ব নিয়েই কথা বলছি।'

—'ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড কেন বলছেন? আপনারা তো রজনীর বন্ধু।'

—'আপনারও বন্ধু আমরা।' বলেও যথেষ্ট হল না মনে করে অমিয় বলল, 'অন্তত তৃপ্তিব চেয়ে বড বন্ধু আমরা—সে আপনি মানুন বা না মানুন।'

—'এখুনি কোন কথা বলব না।'

—'সে আপনার ইচ্ছে। তবে এখুনি আপনাকে বাড়ি যেতে হবে।'

—'আপনাদের ইচ্ছায় চলতে হবে?'

—'তা কেন? তবে একটা কথা শুনুন। আমাদের অনেক কষ্টের থিয়েটার আর ক'দিন পরেই অনেক দেনা করে স্টেজ হচ্ছে। আপনি এখন এ-রকম করলে আপনার স্ত্রীর মনের অবস্থা কি হতে পারে বলুন। তাঁর পক্ষে কি সবটুকু দিয়ে অভিনয় করা সম্ভব। নাটক কি তা'হলে ঝুলে যাবে না?'

—'আপনাদের নাটক আপনারা বুঝবেন। আমি এখন বাড়ি যাচ্ছিনে

—'বেশ তো অন্য কোথাও চলুন।'

—'কোথায়?'

—'দেখবেন চলুন।'

দশ মিনিটের ভেতব ট্রাফিক কাটিয়ে ট্যাক্সি ওদের হলের সামনে এনে হাজির করল।

—'এ হল তো আমরা চিনি। শ্রীরাম ট্রাস্টের "ভরত হল"। যুদ্ধের সময় এ আর পি-র অফিস হয়েছিল। আমরা ফড়েপুকুর থেকে এদিকে বেড়াতে আসতুম।'

ঠিক এই সময় তিনজনই একসঙ্গে ওপরে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভারা বেঁধে ওয়াল পেণ্টাররা হলের সামনেকার বড় দেওয়ালে ছবি আঁকা শেষ

করেছে। প্রথমে রজনীর মুখের ছবি। তার গায়ের ওপর দিয়ে বড় করে সোনালী "রূপশ্রী" টাইপে লেখা—সুজাতা তার পাশে অমিয়র মুখ—তারপর কল্যাণী আর শংকরের মাথা পাশাপাশি।

এই প্রথম অনুমোদনের হাসি হাসলো শশাঙ্ক। 'ভালোই এঁকেছে।'

অমিয় বলল, 'কাল থেকে পর পর সাতদিন প্রেস পাবলিসিটি যাচ্ছে। বাংলা, হিন্দি, ইংরাজী—সব কাগজে। ভেতরে চলুন—'

একসঙ্গে তিনজনকে ঢুকতে দেখে রজনীর মুখের একটি রেখাও পাল্টালো না। সে তখন স্পটলাইটের ফোকাস ল্যাম্পের স্ট্যাণ্ড রাজমিস্ত্রীকে দিয়ে স্টেজের বাঁ দিকের দেওয়ালে ডিরেকসন দিয়ে বসাচ্ছিল।

শশাঙ্কর মুখেও কোন দাগ পড়ল না। ঘুরে ঘুরে সারাটা হল দেখতে লাগল। এক সময় বলল, 'একঝস্ট্ ফ্যান বসাতে হবে ক'টা।'

—'টাকা নেই আর। একজায়গা থেকে কিছু পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভদ্রলোক সেই যে দেশে গেছেন ব্যবসা দেখতে--আর ফেরার নাম নেই। কোত্থেকে যে টাকা আসবে জানি না।'

শশাঙ্ক রজনীকে ডেকে বলল, '"কবিয়ালে" যে পাঁচশো ওয়াটের দু'টো বেবি মিরর আছে—তা আনা যায় না?'

রজনী ঝাঁঝিয়ে উঠলো। 'সব জেনে শুনে এ কথা বলছো কেন? সে-পথ কি তোমার তৃপ্তিবাবু আর রেখেছেন! সব বন্ধক। হল মালিক কি ফেরত দেবে ভেবেছো।'

শশাঙ্ক যেন কোনদিনই তৃপ্তি বলে কাউকে চেনে না। এইভাবে অমিয়র দিকে তাকিয়ে বলল, 'পেলে ভালো হত। খুব কাজে আসতো আপনাদের। তিনটে ফ্লাড লাইট আছে ওখানে। একটা ডিমার লাইটও আছে। এক ওয়াট থেকে বাড়িয়ে পাঁচশো ওয়াট পর্যন্ত লাইট করা যায়। আবার কমিয়ে নিতে হয়। আপনার শুধু চোখ দেখানো দরকার—তারপর মুখ—ঠিক সেইভাবে আলো ফেলা যায় দরকার মত। ক্রাইম ড্রামায় তো ভীষণ দরকারী।'

অমিয়র কানে কোন কথা যাচ্ছিল না। ক'দিন পরে ফিরে এসে নিরুদ্দেশ মানুষটা এমনভাবে কথা বলছে যেন কিছুই ঘটেনি। আরও অবাক হল আরেকটা জিনিস। এ সব কথাবার্তার ভেতর ঘুরতে ঘুরতে রজনী কখন স্টেজে উঠে গেছে। সিনপেন্টারদের কাজ দেখতে দেখতে সুজাতার গান গলায় কলি ফিরিয়ে গাইছে—

"নতুন এ পথ চলিতে
চরণ কাঁপে—"

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছিল রজনী। সুজাতার গালায় এ গানটা খুব জমবে। ফাঁকা হলের শেষ রো থেকে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। "চরণ কাঁপে"-র জায়গায় এসে রজনীর গলায় এমন একটা মোচড় আসে যা শুনতে ভীষণ ভালো লাগে। মাত্র তিনদিন অর্গানের সঙ্গে রিহার্সেল হয়েছে।

আচমকা গান থামিয়ে রজনী বলল, 'বাড়ি যাবে ?'

শশাঙ্কর হুঁ বা না-এর জন্য একটুও না দাঁড়িয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল রজনী। অমিয় বা শংকর কাউকে কিছু না বলে। অমিয় অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। একটা ধন্যবাদও দিল না রজনী। জানতে চাইল না—কোথায় পাওয়া গেছে শশাঙ্ককে ? কার সঙ্গে ? কি অবস্থায় ? এ ক'দিন কোথায় ছিল—

রজনীর পেছনে ছুটে এসে শশাঙ্ক বাস ধরল। দু'জন একই সঙ্গে চেনা স্টপে নামল। প্রথম কথা হল দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে। 'চলে এলে যে বড়।'

— 'তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব ?'

—'তবে যে চলে গিয়েছিলে!' দরজা খোলাই ছিল। রজনী সোজা গিয়ে বসবার বড় সোফাটায় ধপ করে বসল। 'যাও দাড়ি কামিয়ে এস। চান করেছো আজ ?'

—'চান করা হয় নি। কনকের ওখান থেকে দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছি।'

শুনে চুপ করে গেল রজনী। কনক রজনীর ননদ। তার বিয়ে হয়েছে মোহন-বাগান রো-এ। অবস্থা ভাল না। তার বাড়িতে শশাঙ্ক এ ... ন চড়াও হয়েছিল। তাহলে কনক তো টাকা চাইতে এল বলে।

এ এক বিচ্ছিরি অবস্থা। সংসার চালানোর সব ক'টা ডাল নিজের হাতে কেটে দিয়ে অসহায়ের মত বারবার ফিরে আসে মানুষটা। কোন কাজে আসবে না। পরিষ্কার কোন কথা নেই। স্যাকরার ঘর থেকে ভারি গয়নাগুলো সুদাসল দিয়েও কেন ফেরত পাওয়া গেল না—সেকথা আজও খোলাখুলি জানতে পারেনি শশাঙ্ক।

চান করে সিঁথি কেটে মাথা আঁচড়ে শশাঙ্ক এসে বসল। 'আজ ভালই গাইছিলে কিন্তু হলে।'

সে কথায় না গিয়ে রজনী ধাঁ করে বলে বসল, 'তৃপ্তির সঙ্গে কোথায় কোথায় ঘুরলে এ ক'দিন ?'

—'তুমি কি করে জানলে ? আবার ফোন করেছিল নাকি ?'

—'না। যে আমায় ডোবায়—সে-ই তোমার বন্ধু হয়। জগতে কেউ এমন দেখেছে !'

— 'খোকন ঘরে আছে। আস্তে কথা বল।'

—'ওরা কি কিছু জানে না ভেবেছো ! ওদের সামনেই তো তুমি একদিন বলেছিলে—'

চমকে গেল শশাঙ্ক। 'কি বলেছিলাম আমি ? কি ব'লেছি ?'

—'মনে নেই ! ওদের সকালবেলা ঘুম থেকে ডেকে তুলে আমার সামনে এনে বলেছিলে না !'

শশাঙ্ক মাথা নামালো। দাড়ি কামিয়ে সদ্য চান করে এসে ভালোই লাগছিল। ভেবেছিল রজনীর কাছে চা চাইবে। প্রায় সঙ্কল্পের ভঙ্গীতে মাথা তুলে রজনীর মুখে একাগ্রভাবে তাকিয়ে বলল, 'আমি ভাল হব রজনী। আমি ভাল হতে চাই। তোমার মনের মত। ফ্লাডলাইটের ঝাঁঝালো আলোর সামনে স্টেজে যখন তুমি দাঁড়াও আমার মনে হয়—আমি তোমার কেউ নই। অনাত্মীয়—সাধারণ—'

—'তবে এই ছেলেমেয়েগুলো কার।'

সে কথায় গেল্ল না শশাঙ্ক। 'আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি তুমি আলোর ভেতর দপদপ করে জ্বলছো। আমি সব সময় অন্ধকার অডিটোরিয়ামে বসে আছি।'

—'তাই বুঝি ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের ডেকে উঠিয়ে দিয়ে বলেছিলে—তোমাদের মা খারাপ। বেশ্যা ! খারাপ পথে টাকা আনে—' বলতে-বলতে রজনীর চোখ সরু হয়ে এল। নাকের ডগা লাল। চোখের সামনে শশাঙ্কের মাথাটা প্রায় তিরিশ সেকেণ্ডের জন্য ঝাপসা হয়ে এল। কারণ, রজনী তখনো তার ভেতরকার কান্না থামাতে পারেনি।।

বেলায় ঘুম ভাঙতে তার আগের রাতটা একদম ভুলে গিয়েছিল রজনী। মনেই ছিল না, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে—তার আগের রাতে মল্লিকবাবু নামের একজন লোকের সঙ্গে সে তরল আচ্ছন্ন করা একটা স্রোত গিলে নিয়ে একদম অজানা একটা ঘরে খানিকক্ষণের জন্যে ছিল। তখনকার সবটা সে আজও পরিষ্কার মনে করতে পারে না। ক'খানা দশ টাকার নোট মোট পেয়েছিল তাও মনে নেই। ফেরার পথে গাড়ির ভেতর মল্লিকবাবু দিয়েছিলেন। বাড়ির সামনে নামিয়ে দেবার সময় ভুল বকতে বকতে একটা চুমুও খেয়েছিল তাকে। তখন তার হাত থেকে দু'-

একখানা দশ টাকার নোট উড়েও যেতে পারে। রজনী তখন রজনীতে ছিল না।

শশাঙ্কর কথায় প্রথম আপত্তি করেছিল মালতী। বড় মেয়ে। পরিষ্কার চেঁচিয়ে বলেছিল, 'তা যদি মা হয়েই থাকে—সে তোমার জন্যেই বাবা—'

উনিশ শো চৌষট্টি সালের একুশে সেপ্টেম্বরের সেই সকালটা গিরিশ পার্কের ভাড়া ফ্ল্যাটবাড়িতে সেদিন একই সঙ্গে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ এনে দিয়েছিল। ঘরের ভেতর মেঘ করেছিল। কুয়াশা ছিল। রজনীর সারা মাথা জুড়ে ছিল যন্ত্রণা।

সেই সাতখানা দশ টাকার নোটের একটি নোট ভাঙিয়ে এসেছিল সারিভন। সেই ভাঙানো টাকা দিয়েই এসেছিল খোকনের পুরনো জ্বরে প্রথম ওষুধ, প্রথম কমলালেবু। বাড়ির সবাই সেদিন পাউরুটি আর হোটেল থেকে আনানো তড়কা খেয়েছিল। রজনী ভেবেছিল খাবে না। কিন্তু অভিমান বা দুঃখের সঙ্গে শরীর সব সময় হাত মিলিয়ে চলে না। প্রথম নেশা ভাঙার পর প্রথম খিদে। রজনীও পাউরুটি খেয়েছিল। তড়কা খেয়েছিল সেদিন।

—'পুরনো কথা তুলো না রজনী। আমার যে অতীত ভবিষ্যৎ—কোনোটাই নেই। তোমার তবু সবই কিছু কিছু আছে।'

—'তোলার মত নতুন কথাও যে জমে গেল। তৃপ্তি আমাদের "কবিয়াল" থিয়েটারের সর্বস্ব নষ্ট করে নি? তৃপ্তি তোমার বউকে পাবার জন্যে তোমারই সামনে নির্লজ্জ বেহায়াপানা করে নি? আর তুমি তা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছাখো নি? এ-সব নতুন কথা নয়? কিন্তু তুলবো কার কাছে। তুলে লাভটাই বা কি। এমন সফল নাটকের হিসেব নেই। অথচ পেপার পাবলিসিটি -.লেই হাউস ফুল। সাউণ্ড টেপগুলো বাড়ি নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দিল না।'

—'তৃপ্তি কিন্তু তোমায় ভালবাসে। এ ক'দিন রোজই আমায় বলত। তোমার অভিনয়ের কথা। তুমি ঠাকুরঝি হলে ও যা সুন্দর রাজন করে না! সে তুমি যাকেই জিজ্ঞাসা করবে সে বলবে। লোকটা কিন্তু খারাপ নয় ভেতরে—'

—'বদমাইসের ধাড়ি। তোমাকে দিয়ে রিসিট সই করিয়েছে—অথচ টাকা দেয় নি। চেলো ক্লারিওনেট সারাতে দিয়েছি বলে আর আনে নি। টিকিটের কাউন্টারফয়েলগুলো সরিয়ে ফেলেছে। হল ভাড়ার টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে চিরঞ্জীববাবুকে দেয় নি।'

—'তবু বলছি তৃপ্তি তোমায় ভালবাসে। তোমাকে চায়—'

—'এ সব কথা তোমার কানে মধু ঢেলে এ ক'দিন শুনিয়েছে। যেন রজনী

তোমার বউ নয়। অন্য কারো। তাই তুমি অন্য কারো বউয়ের কথা মন দিয়ে কান খাড়া করে এ ক'দিন শুনেছো। আচ্ছা তুমি কি রকম লোক বল তো?'

—'সরল সিধে লোক।'

—'তুমি আসলে কোন লোকই নও। আমাকে খাবার জন্যে এই তিনদিন ধরে তৃপ্তি তোমায় জপিয়েছে।' এখানে আর রজনী নিজেকে সামলাতে পারল না। লম্বা হাসির ভেতর কান্না ছিটিয়ে দিয়ে রজনী হাসতে লাগল। দমকে দমকে। তাতে কখনো কান্নার ভাগ কম। কখনো বেশি।

কলকাতার রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে মোটর যাচ্ছিল।

শশাঙ্ক সোজাসুজি রজনীর মুখে তাকিয়ে চুপ করে বসে ছিল।

॥ আট ॥

ভবত হলের সব ভাল। ট্রাম রাস্তার ওপর। সিলিং এমনই যে সাউণ্ডের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু পাড়াটা গোলমেলে। দু'ধারে ভাজাওয়ালা, কশাইয়ের দোকান। তারপরই মোটর মিস্ত্রী। আবার হাপরসুদ্ধ ঝালাইয়ের দোকান। প্রায় উল্টোদিকে সন্ধ্যে থেকে মেয়েরা এসে দরজা ধরে দাড়ায়। সেখানে হট্টগোল লেগেই আছে। দূরে পাঁচ মাথার মোড় দেখা যায়। এখানে বাংলা থিয়েটার দেখতে কে আসবে?

তাই বড় করে হোর্ডিং দিতে হয়েছে শিয়ালদায়। ডবল কলম কুড়ি সি. এম. বিজ্ঞাপন গেছে বাংলা কাগজে। হিন্দী সন্মার্গে আরও বড় করে।

একদম ফ্রণ্টে দশটি রো দশ টাকার টিকিট। তারপর সাত পাঁচ তিন। রিহার্সেলের সময় রজনী বলল, 'বড়বাবু শেষ "ষোড়শী" করে গেছেন—তখন সবচেয়ে দামী টিকিট ছিল সাত টাকা। ছবিবাবুর সঙ্গে কামাল আতাতুর্ক করেছি। তখন শিয়ালদা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারবা আসতেন। বনগাঁ-ক্যানিং-রাণাঘাট লাইনের। ওদের জন্যে সবচেয়ে কম দামের টিকিট ছিল আট আনা করে। বুঝতাম দল বেঁধে নাটক দেখতে এসেছেন। অন্ধ কৃষ্ণচন্দ্র গাইতেন—

"অন্ধ হৃদয় কেঁদে কেঁদে ফেরে—"'

ড্রেস রিহার্সেল হচ্ছিল। অমিয় বলল—'তখন আমি সবে নাটক ধরছি। পড়ছি। আপনার কথা আলাদা। আপনি হাঁটতে শিখে গ্রীনরুমের দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছেন।'

শংকর এসে বলল—'বেঙ্গল ব্রাদার্স টাকা না পেলে আর ড্রেস দিতে পারবে না।'

—'তাহলে যে যার বাড়ি থেকে জামাকাপড় আনো।'

—'সেটের সঙ্গে মিলবে?'

—'অভিনয় করতে পারলে সব বেমানান জিনিস মানিয়ে যায় শংকর। আমার শোনা গল্প। রজনী ভাল বলতে পারবেন—ঠিক কি না। ছবিবাবু গোঁফ বা জুলফি লাগালে কষ্ট পেতেন। গাম থেকে অ্যালার্জি হত। এক দিনে গোঁফ লাগিয়ে ঢুকেছেন। চুলকোচ্ছিল বলে গোঁফ হাতে ফিরে এলেন। অন্যমনস্ক হয়ে

পকেটে রাখলেন। পরের সিনে পকেটে গোঁফ নিয়ে অভিনয় করে গ্রীনরুমে এসে বললেন—'ওই যাঃ গোঁফ লাগাতে ভুলে গেছি। লাগিয়ে আর দরকার নেই। পাবলিক যখন ভুলে গেছে তখন দিই ফেলে এ গোঁফ—'

অমিয় নিজের মনের ভেতর খুব একচোট হাসছিল তখন। নানান অভাবে এক একটা সমস্যা আসছে—'আর সে এক একটা গল্প বলে সব ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে।'

রজনী মুড়ি আর বোঁদে সবাইকে বিলি করে এসে অমিয়র সামনে দাঁড়াল। 'নিন—'

—'খাওয়া-দাওয়াই বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

—'বেশ তো আসুন। হয়ে যাক একটা সিন—'

বোঁদেসুদ্ধ মুড়ির বাটি পড়ে থাকল। উইংসের পাশে বেহালা ধরেছেন ত্রিদিববাবু। চেলো, ফ্লুট, ক্লারিওনেট বেজে উঠল। তবলায় বংশী রায়। পুরো দলটা ডেইলি বেসিসে আনতে হয়েছে। প্রথমে ভেবেছিল টেপ মিউজিক ব্যাক গ্রাউণ্ড থেকে বাজাবে। বেবি মিরর দুখানা দিয়ে দু'দিক থেকে পাঁচশো ওয়াটের আলো ফেলবে অন্তরঙ্গ বেডরুম সিনে। তারপর ডিমার আলো দিয়ে ঘর উজ্জ্বল করে সুজাতার গানের সঙ্গে সঙ্গে আলো কমিয়ে আনবে।

রজনীই বাদ সাধলো। 'খরচা করে টেপ করার পর যদি কোনদিন গলা না মেলে? গলায় কাশি এসে গেলে গানকে ছুট করিয়ে যদি সুর ধরতে হয়? তখন?'

অমিয় খানিক শুনে বুঝতে পেরেছে—রজনী স্টেজের ধুলো মেখে মেখে বড় হয়েছে। কোথায় কি প্র্যাকটিকাল অসুবিধা দেখা দিতে পারে—তা ওর নখদর্পণে।

আফগান ব্রাদার্সের কাছে আরও কিছু ধার নিয়ে তবে এই ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের আয়োজন করতে হয়েছে। দাদরার ওপর কাজ—

"—তুমি চাঁদের জোছনা হয়ে থাক সুখে
কলঙ্ক আমি নেব হাসি মুখে"

রজনী স্বচ্ছ পোশাক পরেছে। শাদা নেটের। ভেতরে কালো কাঁচুলি। লম্বা মোটা বেণী। সারা মুখে ময়েসচারাইজার বোলানো। বেঙ্গল ব্রাদার্সের পোশাক অমিয়র ছোট হয়েছে একটু। সবুজ রংয়ের স্লিপিং স্যুট। হাতায় ছোট। পায়ের অনেকটাই ঢাকা পড়েনি। ক্লারিওনেট, বেহালা, ফ্লুট, চেলো—একসঙ্গে রজনীর গলার গানকে ফলো করে সারা অডিটোরিয়ামকে মুহূর্তে জমজমাট করে দিল।

—"তুমি চাঁদের জোছনা হয়ে থাকু সুখে" লাইনটির ভেতর সরে এসে এসে অমিয় রজনীকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছিল। রজনী খাটের এদিক-ওদিক পিছলে যাচ্ছিল। জীবন একসময় সুজাতাকে ধরে ফেলল। তারপর বুকে জড়িয়ে ব্লাউজ টেনে ধরে উন্মুক্ত কাঁধে চুমু বসালো। ছাড়াছড়ি, লুকোচুরি, জড়াজড়ি এবং গান ও তাব সঙ্গে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক—তাছাড়া পিছনে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রজনীর হাসির জলতরঙ্গ চলতে লাগল। তার ভেতরে ভেতবে গানের টুকরো। এই সিনটি দিয়ে নাটকের শুরু। তারপর আস্তে আস্তে এই নাটক গম্ভীরে যাবে। হাসির কিনার ঘেঁষে চলতে চলতে সংলাপ এবং অভিনয় দর্শকদেব অজান্তে তার বুকেব গম্ভীর অন্ধকার জায়গায় ঢুকে যাবে—দর্শক গুমরে গুমরে উঠবে। মানুষের জীবনের সত্যেব দিকটা দেখতে পেয়ে সে নিজেকেই দেখতে পাবে।

অমিয় বলল—'আরও কনভিনসিং হওয়া দরকার—আপনার পিছলে সরে যাবার ভঙ্গীর ভেতর লুকোচুরি খেলার হাসি আবও অনেকটা ছিটিয়ে দেওয়া দরকার—'

—'কী রকম দেব দেখিয়ে দিন।'

রজনীর একথায় মুশকিলে পড়ল অমিয়। দেখুন, আমি সোনাগাছির মত পাড়ায় যাইনি কোনদিন। শুধু একবার—

কী রকম ?

পতনের পর নাটক করবার সময় কে যেন খবর দিল, বাড়িউলি মাসিরা বাজারের চেয়ে অল্প সুদে টাকা খাটায়। তাই গিয়েছিলাম সন্ধ্যেবেলা। জমজমাট পাড়া। বারান্দায় সিঁড়ির মুখে আলোয় দাঁড়িয়ে আছি। মাসি আর আসে না। আসে না। শেষে দু'টি মেয়ে এসে আমার হাত ধরে টানাটানি। যত বলি আমি তোমাদের মাসির ভাই—মামা— তত টানাটানি আর হাসাহাসি—ওরে ! মামাবাবু এসেছেন রে !

রজনী মনে মনে বলল, এ আর এমন কি ! মেয়েলোক হয়ে পুরুষমানুষকে ভোলাবো—সে তো শিখিয়ে পড়িয়েই ভগবান মেয়েমানুষকে পৃথিবীতে পাঠায়। তখন সে বড় হয়েছে। বড়বাবু একবার রিহার্সেলের সময় বলেছিলেন—মানুষ আর মেয়েমানুষ আলাদা জিনিস। মানুষ হল গিয়ে মানুষ। মেয়েমানুষ হল গিয়ে অ্যানিমাল। অবশ্য সে-কথা কোন মেয়েমানুষই জানে না। সে যেমন নিজেই টের পায় না—নিজের অজান্তে কখন লতাপাতার মতই ভ্রূভঙ্গী করছে—কিংবা অপাঙ্গে কটাক্ষ হেনে চেয়ে বসে আছে। এসব কথার সব মানে সেদিনকার রজনী জানতো

না। এখন সে গাছপালার মতই মানুষের মনের জল, আলো, হাওয়া টের পায়।

অমিয় হাত তুলতেই আবার মিউজিক হ্যাণ্ডগুলো চালু হল। চেঁচিয়ে বলল—'লাইট।' মিস্ত্রীরা কাজ থামিয়ে দেখছিল। তাদের একজন শংকরকে আস্তে বলল—'এ থেটার দেখতে লোক ভেঙে পড়বে বাবু। দেখে নেবেন—'

—'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

তখন স্টেজে রজনী প্রথম টের পেল, তাঁর বাঁ দিকের খোলা কাঁধে অমিয়র ঠোঁট অভিনয়ের চেয়ে অনেক জোরে বসে যাচ্ছে। সে নিজে তখন মিউজিকে গলা মিলিয়ে গাইছিল—"কলঙ্ক আমি নেব হাসি মুখে—" গাইতে গাইতে নিজেকে সামলে নিতে হচ্ছিল রজনীর। সে পরিষ্কার টের পাচ্ছিল—অমিয়র শক্ত পুরুষালি দু'খানি হাত তার পিঠের ওপর দিয়ে লোহার মত তাকে জড়িয়ে ধরেছে। অনেক-কাল পরে পুরুষের শক্ত বুকের গন্ধ তার নাকে উঠে আসছিল।

দর্শক শংকর। দর্শক কল্যাণী। দর্শক মিউজিক হ্যাণ্ড আর মিস্ত্রীরা। রজনী তখনই এক ঝটকায় অমিয়র বাহুবন্ধন থেকে পিছলে বেরিয়ে এল। শুধু অমিয় শুনতে পায়—এমন আস্তে অথচ তীক্ষ্ণ গলায় অমিয়র দিকে তাকিয়ে বলল, 'এর নাম কনভিনসিং! জড়ালে ছাড়তেই চান না? তাহলে আমি গাইব কি করে? দম আটকে আসে।'

তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে অমিয় বলল, 'তুতুপুতু করে এ সব কাজ হয় না রজনী। একজন পুরুষ এ অবস্থায় যা চায় আমি শুধু তাই করছিলাম।'

—'শুধু তাই!'

অমিয় জোরে ধমকে উঠলো, 'হ্যা তাই। আরেকবার করুন। শংকর ঘড়ির দিকে নজর রাখবে তো। মোট দু'মিনিট তিরিশ সেকেণ্ডের অ্যাকশন। স্টার্ট।'

আবার মিউজিক। আবার গান। পিছলে যাওয়া। হাসির জলতরঙ্গ। খোলা কাঁধের ওপর অমিয় তার পাঁচ কেজি ওজনের মাথাটা নামিয়ে নিয়ে এল। গান গাইতে গাইতে রজনী টের পেল—পুরুষলোকের গরম ঠোঁটের টাচে তার এক-দিককার কাঁধ পুড়ে গেল। তখনই তার ভেতরে একজায়গা দিয়ে পেট্রল লাগানো আগুন দপ করে জ্বলে উঠলো।

শংকর কল্যাণী একসঙ্গে ক্ল্যাপ দিয়ে উঠলো। হলের পুরনো বাসিন্দা দু'টি পায়রা সেই শব্দে বিশাল প্রজাপতির মত ডানা কাঁপিয়ে সারাটা হলের আকাশে দু' চক্কর দিয়ে আবার পুরনো বাসায় গিয়ে বসল। হাজার ওয়াটের আলোর ফোকাসের ভেতরে পড়ে পায়রা দুটোর ডানার দাপাদাপি এমন সুন্দর হয়ে সবার

চোখে পড়ল—রজনী মনে মনে বলল—লক্ষ্মীর চিহ্ন—অজান্তে নিজের বুকের ভেতরে বসে গলায় আঁচল দিয়ে এই চিহ্নকে নমস্কার করল।

শংকর দেখল ঠিক দু মিনিট তিরিশ সেকেণ্ডে সিন শেষ। প্রতিটি সেকেণ্ডেই অ্যাকশন।

পনরই আগস্ট। "সুজাতা" নাটকের হালখাতা। সিনের রং শুকোয়নি বারো ঘণ্টা বুকিং খোলা রেখে টিকিট বিক্রি হয়েছে একশো বাহাত্তর টাকার। খরচ হয়ে গেছে একুশ হাজার টাকা।

সেই ভিজে সেটেই নাটক শুরু হল।

দশ টাকার টিকিটে জনা সাতেক লোক। তার সঙ্গে লীলা বসে আছে। স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে এসেছে। সাত টাকার সিটে অল্প কিছু দর্শক। বেশির ভাগই তিন টাকায়। তখন লীলার চোখের সামনে অমিয় কনভিনসিং অভিনয় করে যাচ্ছে।

সবুজ রঙের স্লিপিং স্যুট। রজনীর গায়ে বেঙ্গল ড্রেসিংয়ের নেটের পোশাক। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রজনী বসে ছিল। অমিয়র ডিরেকসন মত ডান পা ঘাগরার বাইরে অনেকটা বের করে রেখেছে।

মঞ্চ জুড়ে আলো। বাজনা। সেই সুর সারা হলে। লীলার ভারি কষ্ট—স্বামীর এত বড় একটা কাণ্ড স্কুলের কোন দিদিমণিকেই এনে দেখাতে পারল না! অমিয়কে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। রজনী যাকে বলে গ্ল্যামার গার্ল তা নয়—কিন্তু কী সুন্দর অভিনয়। তাকানো। হাসি। কণ্ঠস্বর। যাকে বলে পার্সোনালিটি।

"ভালোবাসা পাকা সোনা
ভালোবাসায় খাদ মেশানো—"

গাইতে গাইতে সুজাতা নিট রাম খেল। খেতে বাধ্য হল। জীবন তাকে বাধ্য করল। জীবনের সিগারেট ধরানোর ভঙ্গী—কথার থ্রো দর্শকদের হাসাচ্ছে। দর্শক যত হাসছে—ততই রজনীর জন্যে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে।

লীলা স্কুলে পড়ায়। লীলা জানে প্রতি দিনে রজনী স্কোর করে এগিয়ে চলেছে।

এক একবার দর্শকদের মুখে তাকাচ্ছিল লীলা। স্টেজের আলো এসে তাদের মুখে পড়ছে। নাটক এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। চোয়াল শক্ত। চোখ ছোট। অমিয়র এ নাটক জমবেই।

স্টেজে তখন জীবন আভামাস্টারনীকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু হঠাৎ সুজাতা এসে পড়ায় দু'জন দু'দিকে ছিটকে গেল। আভা চলে যেতেই জীবন কৈফিয়ৎ চাইল সুজাতার কাছে, 'তুমি এখন এলে কেন?'

সুজাতা বলল—'আমি কি করে জানব—আভা ঠাকুরঝি আমার এঁটো পাতে এসে বসবে।'

জীবন চেঁচিয়ে উঠলো। 'লম্পট, স্বার্থপর মজাদার জীবন। এত বড় আস্পর্ধা। সোনাগাছির মাগি হয়ে আমায় বলছিস এঁটো পাত?'

—'ভদ্দরলোকের নিয়মকানুন জানি না। সোনাগাছিতে জন্ম। বড় হতেই মা লাইন ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরাও জানি—একজনের বাড়া ভাতে আরেক-জনের ছাই দিতে নেই—'

'আমি তোর বাড়াভাত?'

—'এখন আর নয়।' এখানে সুজাতার গলা কান্নার কিনার ঘেঁষে অন্ধকার গাঢ় সমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

নাটক শুরু হয়েছিল জড়াজড়ি দিয়ে। সামান্য কয়েক মিনিটের সিন। তারপর নাটকের আগাগোড়া কোন চরিত্রই কোন চরিত্রের কাছে আসে না। সবাই এক একটা দ্বীপ। কঠিন। নিঃসঙ্গ। কেউ কারও নয়। একটা আনন্দের হাটে সব বাতি নিভে গেছে।

এতক্ষণ যারা ক্ল্যাপ দিয়েছে, গম্ভীর হয়েছে, চোখ মুছেছে—এবার তারা সোজা হয়ে বসল। ড্রপ পড়ে আবার উঠলো। জীবন সুজাতা আভা—সবাই এসে মঞ্চে দাঁড়াল। প্রায় শ'খানেক দর্শক হবে। তারা হল ফাটিয়ে ক্ল্যাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই পায়রা জোড়া পাখা ছাপিয়ে লটপট করে সারা হলের আকাশে আবার উড়লো।

স্টেজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অমিয় খুব আস্তে বলল—'ও দুটোকে তাড়াতে হবে।'

রজনী আরও আস্তে বলল—'না। ওরা থাকুক। লক্ষ্মীশ্রী।'

পয়লা দিনেই ডবল শো ছিল। প্রথম শো দেখে লীলা বাড়ি চলে এল। দুটো শো করে অমিয় যখন ফিরলো তখন রাত একটার মত। লীলার একটুও ঘুম আসেনি। বসেই ছিল এতক্ষণ। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

মুখের রং তোলা হয়নি অমিয়র। নারিকেল তেল ঘষে ঘষে মুখে মাখল আর কথা বলল—'পরের শোয়ে আর কিছু লোক বেড়েছিল।'

—'শীগগিরি দেখো তোমাদের হাউস ফুল হবে।'

—'কী করে? এত বিজ্ঞাপন করে এই এফেকট। প্রায় ফাঁকা হাউসে তিন ঘণ্টা ধরে অভিনয় কী রকম বিরক্তিকর ভেবে দেখ তো।'

—'লোকের মুখে তোমাদের নাটকের কথা ছড়াক আগে! তারপর দেখো।'

—'কে জানে। আমার এই পাঞ্জাবিটা ধুয়ে দাও তো এখুনি। সিনের কাঁচা রং লেগে গেছে। এখুনি না ধুলে পাকাপাকি লেগে থাকবে।'

লীলা এখন অমিয়কে ছেড়ে দূরে যেতে চাইছিল না। প্লাস্টিকের বালতিতে গুঁড়ো সাবান গুলে তাতে পাঞ্জাবীটা ডুবিয়ে দিল।

বড় ঘরে উঁকি দিল অমিয়। এ ক'দিন ছেলেমেয়েদের দেখেই নি। দেখার সময় পায় নি। 'ওরা হলে গিয়েছিল?'

লীলা বলল, 'পাগল নাকি! হাউস ফুল হলে নিয়ে যাব একদিন।'

—'তাহলে আর দেখা হবে না।'

—'নিশ্চয় হবে। তুমি অত অন্যমনস্ক কেন আজ?'

—'নাঃ!'

খেয়ে উঠে ওদের শুতে শুতে রাত কাবারের আর বেশী বাকী ছিল না। স্টেজে যে দৃশ্যগুলো অপূর্ণ ছিল তার একটি এখন পূর্ণ হল। সারাদিন উত্তেজনা, উদ্বেগে দুলে দুলে অমিয়র স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে ছিল। যে কোন সময় ছিলার মত ছিঁড়ে যেতে পারত। এখন লীলার পূর্ণ শারীরিক সান্নিধ্যে তা শিথিল হয়ে এল। ঘুম অমিয়কে তখন পুরোপুরি দখল করে নিচ্ছিল। তার ভেতরেই শুনতে পেল, লীলা বলছে, 'রজনীকে জড়িয়ে ধরার সময় তোমার কেমন লাগে? যখন খোলা কাঁধে চুমু খাচ্ছিলে—তোমাকেও যখন রজনী জোরে জড়িয়ে ধরছিল?'

অমিয় লীলাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে একদম কোলবালিশ করে ফেলল। তারপর ঘুমের নদীতে ডুবে যাওয়ার আগে অস্পষ্ট গলায় বলল, 'মনে নেই—'

কয়েক সেকেণ্ডে লীলার তুলতুলে বুকের ভেতর অমিয়র ক্লান্ত শরীর থেকে বড় বড় নিঃশ্বাস এসে আছড়ে পড়তে লাগলো। মেশিনটা খুব ভালো। ঘুমন্ত অবস্থাতেও কত জোরে তাকে জড়িয়ে আছে। ভেতরের কলকব্জার ক্লান্ত পিস্টনগুলো ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে বুকের ভেতর থেকে নিঃশ্বাস পাঠাচ্ছিল বাইরে। বহুকাল পরে অমিয়কে এ-অবস্থায় পেয়ে লীলা তাকে রাখবার জায়গা পাচ্ছিল না। তাই লীলা এবার অমিয়কে কোলবালিশ বানালো।

রজনীকে দরজা খুলে দিল খোকন।

ভেতরে ঢুকে অবাক হল রজনী। 'তোদের বাবা কোথায় ?'

—'কেন ? তোমার সঙ্গে আসে নি ?'

—'না তো !'

—'কোথায় গেল—তোদের বলে যায় নি ?'

—'থিয়েটার থেকে ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে গেল। সে তো সেই বিকেল-বেলা।'

রাত অনেক বলে রজনী কিছুই খেল না। খোকনকে বলল, 'তুই খেয়েছিস ? মেয়েরা ?'

—'সবাই মা। তুমি খাও না। আমি গরম করে এনে দিচ্ছি।'

—'না তুমি শুয়ে পড়।' বলে ফাঁকা বাড়ির কলঘরে লাইট জ্বেলে রং তুলতে বসল রজনী। এগঝস্ট পাখা না বসালে শ্রীরাম ট্রাস্টের ওই "ভরত" হলে সুজাতা চালান অসম্ভব। দর্শক ঘামছে। অ্যাকটর-অ্যাকট্রেস ঘামছে। কোনদিন যদি হাউস ফুল হয়—তাহলে অতগুলো লোকের নিঃশ্বাসে না-জানি কী অবস্থা হবে। আজ অভিনয়ের সময় কড়া আলোর নিচে রজনীর গাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা চিবুকে এসে ঝুলছিল। অমিয় তো একদম চান করে উঠেছে মনে হচ্ছিল—শুধু গা মোছা বাকী। যখন জড়িয়ে ধরছিল—তখন আমি পিছলে যাচ্ছিলাম অমিয়র হাতের ভেতর থেকে। ওর ঠোঁটের চুমোগুলো আমার খোলা কাঁধে পড়েও পিছলে যাচ্ছিল। একঝস্ট পাখা যে করে হোক বসাতে হবে।

নারকেল তেল দিয়ে ভাল করে মুখটা ডলে মুছে নিয়ে আয়নায় দাঁড়াল রজনী। ভালো করে দেখলো নিজেকে। আজ ডবল শোয়ে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি সিনে তাকে মোট আটবার জড়িয়ে ধরেছিল। তার খোলা কাঁধে চুমু খেয়েছে দু'বার। সাক্ষী দর্শক। সাক্ষী হাজার ওয়াটের ফোকাস। সাক্ষী মিউজিক হ্যাণ্ডের লোকজন।

হল আদৌ ভরেনি। ফাঁকা বলা যায়।

তবু পাবলিক ক্ল্যাপ দিচ্ছিল। ফ্রণ্ট রোয়ের একজন চোখ মুছছিল। এ নাটক আমার। আমার দিকেই নাটকের ঝোঁক। হাসতে হাসতে কান্নায় চলে যাওয়া। কাঁদতে কাঁদতে হাসিতে ফিরে আসা। তার ভেতরে সংলাপ পরিষ্কার উচ্চারণ। গান

গাইতে গাইতে সুজাতা জীবনের দিকে তাকাবে। তার ভেতর কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা বড় দলটার এক একজনের এক একরকম ভঙ্গী। তাদের নিয়ে "কর্ণার্জুনে"র একটা সিন অভিনয়। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। বস্ত্রহরণের সিনে আভার কমপ্লেকস। দুঃশাসনের রোলে লোকাল চালকল মালিক কেষ্টবাবু। যিনি খবরকে বলেন—খপর! মনে মনেই তারিফ করল রজনী। অমিয় নাটকটা লিখেছে ভাল। তিন ঘণ্টার জমজমাট নাটক। এখন শুধু লোকের জানা দরকার। লোক জানতে পারলেই সব সামলে ওঠা যাবে।

কলকাতা একটু আগে ঘুমোতে গেছে। রাত দুটো হবে বোধহয়।

এমন সময় দরজায় খুট খুট করে আওয়াজ হল। রজনী উঠলো। খোকন ওরা ঘুমোচ্ছে। দরজা খুলে দিল।

শশাঙ্ক ঢুকলো। কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে ভেতরে যাচ্ছিল।

রজনী থামালো তাকে। 'থিয়েটার ভেঙেছে তো সেই কখন! এত দেরি হল।'

—'দুটো শো দেখলাম পর পর। ডবল শো ছিল তো তোমাদের—'

—'পর পর? বসে দেখতে পারলে! গরম লাগেনি।'

—'লেগেছিল। তবে বিশেষ টের পাইনি। আমরা তো তোমার অভিনয় দেখছিলাম।'

—'আমরা? তৃপ্তি গিয়েছিল? আবার একসঙ্গে দু'জনে?'

—'আমি কি ছেলেমানুষ! কার সঙ্গে মিশবো না মিশবো তুমি ঠিক করে দেবে! আমার বয়স হয়নি?'

—'তা বলি কি করে। বয়স হয়েছে। বুদ্ধিও হয়েছে। তবে একটা জিনিস বুঝি না। কি করে তুমি তৃপ্তির সঙ্গে এতটা মেশো। সে আমাদের অত সর্বনাশ করার পরেও—'

—'তৃপ্তি তোমায় ভালবাসে রজনী।'

—'তুমি বাসো না?'

—'জানি না।'

—'আমি জানি শশাঙ্ক।'

—'কি জানো?'

—'তুমি আমায় ঘেন্না করো। সেজন্যে যেখানেই আমি ছোট হতে পারি—যেখানেই আমার পতন—সেখানেই তোমার স্বাদ বেশি। ঝোঁক বেশি। তুমি

বলেছিলে এবার থেকে ভালো হবে। এই তোমার ভালো হওয়া। আবার তৃপ্তি। তৃপ্তি মানেই আমার অপমান। আর ঠিক সেখানেই তোমার স্বাদ—

—'তৃপ্তি বলছিল—মিটমাট করে নেবে তোমার সঙ্গে। আবার আমরা "কবিয়াল" নামাতে পারি না?'

—'কোনদিন না। আমি জানি না কোত্থেকে হলের দেনা শুধবো। এখনো জানি না টিকিট বিক্রির হাজার হাজার টাকা কোথায় গেল। তৃপ্তির সঙ্গে আর কোনদিন নয়। এবার ও আমায় পেলে রসাতলে পাঠাবে নির্ঘাত।'

—'তা কেন? ও তোমায় ভালবাসে—'

—'চুপ কর। স্বামী হয়ে তোমার এসব মুখে আনতে আটকায় না? তোমার মনে বাধে না? অন্য কেউ হলে তো তৃপ্তিকে মেরে ফেলতো।'

—'আমি তো কোন দোষ দেখছি না। একজন আরেকজনকে ভালবাসে—এই তো মোটে ব্যাপারটা!'

—'তা বইকি! তুমি যে অন্যধাতের পুরুষমানুষ।'

—'তুমিও তো অন্যধাতের মেয়েমানুষ। তাই নয় কি?'

—'কী রকম?'

—'কেন! দুটো শো তো দেখলাম। কত জড়াজড়ি। হাসাহাসি। চুমুর নম্বর সব গুণে উঠতে পারি নি। এত ভাল অভিনয় করছিলে।'

রুখে দাঁড়াল রজনী। 'হ্যাঁ অভিনয়ই তো।'

—'তাতো বটেই। অডিটোরিয়ামের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তোমার ব্লাউজ খুলে ফেলল। কালো ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপের ওপর ফোকাস—

গল্পই তো সেরকম। নাটকের রিহার্সেল তো তুমি দেখেছিলে বাড়িতে।'

—'আরও কিছু দেখা বাকি ছিল। আজ দেখলাম।'

—'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না করছে।'

—'আরও অনেক কিছু করবে রজনী। এখন তোমার নেশা নতুন নাটক। নতুন মানুষে।'

—'চুপ কর। চুপ কর বলছি। তুমি জানো না কী করে এই নাটক নেমেছে। চারদিকে ধার করেছেন অমিয়বাবু। নির্বান্ধব অবস্থা আমাদের।'

—'আমাদের! ওঃ! বুঝতে পারিনি গোড়ায়। এখন দেখছি তৃপ্তির কথাই ঠিক।'

—'আমাদের মানে "পঞ্চমুখ" দলের। আমি গ্রুপের কথা বলছিলাম। তৃপ্তি

কী বিষ ঢেলেছে তোমার কানে ? ও সব পারে। টাকা চুরি করেছে। তোমাকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে তোমার মন বিষিয়ে দিচ্ছে। আর কত সর্বনাশ করবে লোকটা আমার।' রজনী কেঁদে ফেলল।

শশাঙ্কর তাতে কিছুই হল না। সে দিব্যি হেসে বলল, 'তুমি ফিরে এসো। আবার আমরা "কবিয়াল" করব। তুমি ঠাকুরঝি। তৃপ্তি রাজন। সুবীরবাবু কবি। আজও মিউজিকালের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।'

—'এ যে দেখছি তৃপ্তি পাখি পড়িয়ে দিয়েছে একদম। বাইরে দাঁড়িয়ে নেই তো।'

—'না। আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।'

—'খাওয়া-দাওয়া করলে কোথায় ?'

—'হোটেলে। তুমি তো জানো আমি ওসব খাই না।'

—'খেয়ে নেশা করেও কোন পুরুষমানুষ তোমার মত তার বউয়ের জন্য কাঙাল পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে হোটেলে যায় না—পাশাপাশি বসে নাটক দেখে না—তাও আবার পর পর দুটো শো। দেখতে দেখতেই তোমায় তাতিয়েছে তৃপ্তি। নতুন নতুন মানে বের করেছে তোমার চোখের সামনে। উত্তেজিত হয়ে তুমি তাই বিশ্বাস করেছো।'

—'তা কেন। তুমি বলছো অভিনয়। আমি বলব অন্য কথা, রজনী। আমার গা ছুঁয়ে বলতো—আজ যেভাবে অমিয়র বুকে মাথা রাখছিলে—অমিয় যে-জোরে তোমায় জড়িয়ে ধরছিল—সেভাবে কবে লাস্ট আমরা আমাদের পেয়েছি ? আমার তো মনেই পড়ে না ! তোমার পড়ে ?'

'আমাকে দিই নি তোমাকে ? একথা তুমি বলতে পারলে।'

শশাঙ্ক চুপ করে থাকলো।

—'আমার অল্প বয়সের সবটাই তো তোমাকে দিয়েছি তখন। কোনদিকে তাকাইনি সেদিন। তাকালে হয়ত ভাল করতাম। তোমার সংসার আমি কতদিন হল পুরুষমানুষের মত টেনে আসছি। তুমি গেস্ট আর্টিস্টের মত মাঝে মাঝে দেখা দাও শুধু। হয় তৃপ্তি—নাহয় হিসেবের গোলমাল—এরকম কোন না কোন স্টেশনে তুমি আমার জন্যে ওয়েট করে থাক।'

—'বেশ তো নাটকের লাইন বলে যাচ্ছো। নাট্যকারের সঙ্গে ওঠাবসা এখন।'

রজনীর ঠোঁটে একদম অন্যদিক থেকে জবাব এল। —'ডবল শো করে

ফিরলাম। জানতাম না তো তারপরেও বাড়িতে আমার জন্যে এমন সুন্দর নাটক বসে আছে। বেশ ভালোই হল। খোলাখুলি হয়ে যাওয়াই ভাল। নোংরা লোকের সঙ্গে মিশে মিশে তুমিও নোংরা হয়ে গেছ।'

—'একদম বাস বেরোচ্ছে, তাই না? সুগন্ধি ছিটিয়ে তুমিও তোমার আসল গন্ধ চাপা দিয়ে রাখতে পারবে না। মনে রেখো—ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। ওরাও বুঝতে শিখেছে।'

—'এসব কথাও কি তৃপ্তির শেখানো?'

॥ নয় ॥

> **৫০ রজনীর পথে**
>
> উত্তর কলকাতার অভিজাত হল
>
> **ভরতে**
>
> **সুজাতা**
>
> কাহিনীসূত্র : **বিনয় বসু**
>
> নাটক/নির্দেশনা : **অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়**
>
> শ্রেষ্ঠাংশে প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী : রজনী
>
> অন্য ভূমিকায় : **শংকর, কল্যাণী, নূপুর, সমর**
>
> বৃহস্পতি সন্ধ্যায়, শনি-রবি ছুটির দিন ৩ ও ৬॥টায়
>
> ফোন : ৫৫-০০৫০

কাগজে বিজ্ঞাপন যাচ্ছে—

আজ একুশ রজনী। নাটক এ ক'নাইটে অনেক পালটে গেছে। অমিয় স্পীড আনার জন্যে দু'একটা সিনকে আগে-পিছনে করে দিয়েছে। চতুর্থ দৃশ্যের পর দশ মিনিটের বিরতি একদম তুলে দিয়েছে। সেজন্যে রজনীর ৮. .র ছাঁদ পালটাতে একস্ট্রা একটা ফল্‌স খোঁপা ফোর্থ সিনের আগেই মেয়েদের মেকআপম্যানকে রেডি রাখতে হয় আজকাল।

নাটকের ভেতরে নাটকের মত কর্ণার্জুনের বস্ত্রহরণ অংশটুকু সুজাতা নাটকে রীতিমত ইম্পর্টান্স পেয়েছে। সেখানে লম্বা বেণীর পরচুলা মাথায় দিয়ে রিহার্সেলের দৃশ্যে অমিয় বৃহন্নলা সেজে স্টেজে ঢোকে। কানে দুল, গলায় হার। নাকে নোলক। এই সময় স্টেজে ঢুকে অমিয় ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর শাড়ি পেঁচিয়ে পরে মাথায় ঘোমটা টানে। মুখে সিগারেট। কোন কথা নেই তার। কথা তখন অন্যদের মুখে। তবু তার ভঙ্গীতেই দর্শকরা হাসিতে ভেঙে পড়ে।

এখন প্রতি শোয়ে শ' আড়াই লোক হচ্ছে। বেশির ভাগই তিন টাকার টিকিট। পাঁচ টাকা, দশ টাকারও থাকে। তবে অল্প।

বিষ্ণু এসে বলল, 'এ-নাটকের মার নেই। লাগবেই—'

—'আর লেগেছে। এ-মাসের হল ভাড়া, মেকআপম্যান, লাইটের ভাড়া, মিউজিকহ্যাণ্ডদের টাকা অবশ্য টিকিট সেল থেকেই এসেছে বিষ্ণু। কিন্তু দুর্গালালের কিস্তি, আফগানর ব্রাদার্সের সুদ, বিজ্ঞাপন, বেঙ্গল ব্রাদার্সের ড্রেসের টাকার কিস্তি —সবই ধার করতে হল আবার।'

—'এবার কোথায় টাকা পেলে?'

—'সোর্স রজনী।'

—'তুমি দিলে?'

রজনী মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমার নাটক দেখে আসছেন ভদ্রলোক আজ বিশ বছর। বাবার বন্ধু ছিলেন। কয়লা, কেরোসিনের কারবারী। বিনা সুদে ধার দিয়েছেন।'

অমিয় বলল, 'কোত্থেকে শুধবো এ-দেনা জানি না।'

—'সুদে আসলে সব শোধ হয়ে বেশি হয়ে যাবে দেখো।'

—'আর কবে দেখব বিষ্ণু।'

—'ধৈর্য্যং ধরু ধৈর্য্যং রাই।'

—'শোয়ের পর কথা বলব বিষ্ণু। টাইম হয়ে গেল। ইচ্ছে করলে দেখতে পার।'

—'না আজ উঠি।'

হলের গা দিয়ে মেকআপ নেওয়ার সরুমত খালি জায়গা। গরম। ছোট ছোট আয়নার সামনে এক-একজন বসে। ঘড়ি মেরামতের দোকানের আলোর মত ঢাকনা দেওয়া ছোট ছোট লাইট। আই-ব্রো পেন্সিল। রং বুলোনোর ব্রাশ। জলের বোতল। রঙের ডিবে। বেরিয়ে আসতে আসতে বিষ্ণুর মনে হচ্ছিল—তার টাকা থাকলে এদের একটা হল বানিয়ে দিত। তাতে চওড়া মেকআপ-রুম থাকবে। থাকবে বিশ্রামের ইজিচেয়ার।

বাইরে ভরত হলের সামনে ভিড়। লোক চলাচল। ভাজাভুজি বিক্রির টেম্পোরারি স্টল। দেওয়ালে বড় করে রজনী আর অমিয়র আঁকা ছবি। বুকিংয়ে একজন দু'জন লোক যাচ্ছে। টিকিট কিনছে।

বিষ্ণুর খুব ভাল লাগল। এই তো নাটক জমে ওঠার সাইন। ঠিক যেন কোন সিনেমা হলের সামনেকার ইণ্টারভ্যালের ভিড়। তবে খুব পাতলা।

রজনী আয়নার সামনে বসে মুখে বেস মেখে নিচ্ছিল। ফাইভ-এন আর সিক্স-

এন মিশিয়ে। তুটো টিউবই ফুরিয়ে এসেছে। তারপর লাইনিং-এর শিশিটা নিল। তার বাঁ গালের বাঁ দিকটা ভারি দেখায়। সেখানে লাইনিং দিয়ে শেড করল নীল রঙের ফোকাস পড়লে গালের বাঁ দিকটা পাতলা দেখাবে। এবারে স্প্রে করে জল ছিটিয়ে নিচ্ছিল। এরপব পাউডার বুলিয়ে নিলেই রঙটা পাকা হয়ে যাবে। টানাটানি ঘষাঘষিতেও সববে না।

অমিয় অর্ডার দিয়ে বানানো জুলফি লাগাচ্ছিল। নেটের ওপর চুল বসানো। এরই ভেতর ফাঁক ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। আরেক জোড়া অর্ডার দিতে হবে। স্পিরিট গামের শিশিটা কাৎ করে জুলফির নিচে লাগিয়ে নিল। তার মুখের বেস ঘোর এন। ডান দিকে রিককল ঢাকতে লাইনিং দিতে হয়েছে।

রজনী তখন মোছা মুখেব ওপব দিয়ে রুজ লাগানো নাইলন ব্রাশটা বুলিয়ে দিল চাবদিকে। চোখে ম্যাসকারা বসানো সারা। ঢিলে ম্যাকসিটা দিয়ে সারা গা মুড়ে রজনী এসে অমিয়র আয়নার কাছে পর্দা ধবে দাঁড়ালো। 'শুনছো। আজ কিন্তু তুমি একটু থেমে থেমে বলবে। আমার গলাটা সকাল থেকেই বসে আছে—'

—'গারগেল কবে নাও না একটু।'

—'কবেছি। কিছু হচ্ছে না।'

ওরা দু'জন এখন দু'জনকে 'তুমি' বলে ডাকে। একসঙ্গে ধার ও অভিনয় মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি কাছে এনে দেয়। শংকর ওরা আজকাল রজনীকে দিদি বলে ডাকে। শংকব পরিষ্কার বলে, 'গ্রুপে তুমি আসবার পর থেকে খাওয়া-দাওয়াটা অনেক বেটার হযেছে। সেই বোঁদে আর মুড়ি এক ঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল।'

—'গলা উঠছেই না আমার আজকে—'

—'রজনী আজ বর্ণপরিচয় রিডিং পড়েছিলে ভোরে?'

—'ক'দিনই তো পড়ছি। কিচ্ছু এগোচ্ছে না। সেই কবে পড়াশুনোর পাঠ ছেড়েছি।'

—'ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তাক্ষরে সব জায়গায় সমান ঝোঁক দিয়ে পড়তে হবে। নইলে তোমার গান যত সুন্দর হচ্ছে—ডায়ালগ সব জায়গায় তোমার গলার সবটুকু পাচ্ছে না রজনী। টাকা-পয়সার যা অবস্থা তাতে এভাবে আর কতদিন টানতে পারব জানি না। লাইটের টাকা—'

—'আগে তুমি লাইটের লোককে স্ক্রিপ্ট পড়তে বোলো তো। সময়মত আলো ফেলতে ভুলে গিয়েছিল আগের দিন।'

—'তাই নাকি। বলবে তো। আমি কোথায় ছিলাম?'

—'থার্ড সিনে তুমি তো উপুড় হয়ে ঘুমের ভাব আনছিলে খাটে - ঠিক তখন আমার চোখে, মুখে আলো পড়ার কথা। কোথায় ফোকাস ওপরে তাকিয়ে দেখি নীলমণি বিড়ি টানছে। আলোর কথা ভুলে বসে আছে। আমি তাকাতেই তবে সুইচ দিল।'

—'আমায় বললে না কেন ?'

—'তুমি বকাঝকা করবে তাই।'

—'আমি বুঝি খুব রাগী ?'

—'তা নয়। চারদিক সামলাতে গিয়ে খিটখিটে হয়ে গেছ।'

ওদের কথা আর এগোলো না। ইন্টারকমে বুকিং থেকে ফোন এল। বিষ্ণু দত্ত গন্ধর্ব থেকে বলছে। 'কে ? অমিয় ? কযেকজন লেখক ভদ্রলোককে নিয়ে যাচ্ছি। সামনের রোয়ে চারটে সিট রেখো।'

—'কে কে আসবেন ?'

—'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সন্তোষকুমার ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী'—

—'ফার্স্ট বেল পড়ে গেছে তো'—

—'সন্তোষবাবুর গাড়িতে যাবেন সবাই।'

—'চলে এসো।'

বেল কিছু দেরিতেই দিতে হল আজ। ড্রপ উঠলে মতি নন্দী দেখলেন—রজনী গাইছে খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে। বাঁ-পা ভাঁজ হয়ে শাড়ির বাইরে।

"একটি রাতের বধূ করে
চলে যাবে নিশিভোরে—"

আজ রজনীর ইচ্ছে হচ্ছিল অভিনয়টুকু নৈবেদ্য করে তুলে ধরে। রোজ তো এমন দর্শক পাওয়া যায় না। আজ এমনিতেই তিন টাকার সিট ফুল। পাঁচ টাকার দু'টো রোয়ে টিকিট বিক্রি হয়েছে। দশ টাকার একটা রো সব খালি। ভরে নি।

থার্ড সিনে মিনিট সাতেকের জন্যে অমিয়র ছুটি। মেকআপ টেবিলে গিয়ে বুকিংয়ে ফোন করল, 'ফ্রন্ট রোয়ে চারজন বসে আছেন। ধুতি পাঞ্জাবি, চশমা—প্রথম জন। ক্যান্টিনকে বুঝিয়ে বলে দাও চার কাপ কফি। আর বিষ্ণুবাবুর জন্যে এক কাপ চা। লাইট লিকরের।'

সুজাতা তখন কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা দাদু, ডাক্তারির স্টুডেন্ট, লয়ের ছেলেদের কারও বৌদি, কারও নাতবৌ, ছোট ছেলেটির কাকীমা হয়ে যাওয়ার

নতুন স্বাদে আচ্ছন্ন। একবার ভেতর থেকে গিয়ে চা নিয়ে এল। কালো, লাল ডুরে শাড়ি পেঁচিয়ে পরেছে কোমরে। এরা তো জানে না সে সোনাগাছির মেয়ে। এরা ভেবেছে জীবনবাবুর স্ত্রী। বারবার গাইতে বলছে। অথচ মাত্র এক সিন আগে সুজাতা ফুর্তির মেয়েমানুষ হিসাবে একহাতে সিগারেট খাচ্ছিল—তার অন্য হাতে ছিল মদের গ্লাস তখন।

এই কুইক চেঞ্জ এত কুইক। স্টেজে অভিনয় করতে করতে বিষ্ণু আর চারজন লেখকের মুখ একবার দেখে নিল রজনী। খুব তন্ময় হয়ে দেখছে। রজনীকেও দেখে নিতে হল খুবই নির্বিকার দৃষ্টিতে। যেন সে নির্বাক দেওয়ালের দিকেই তাকাচ্ছিল। অন্ধকারে ক্যান্টিনের রবি কফি দিচ্ছিল।

লাস্ট সিনে রজনীর হাতে সুটকেশ। সেটের উঁচু মেঝেতে জীবন দাঁড়িয়ে—। গোলাপি পাঞ্জাবির সঙ্গে ধুতি। পায়ে জীবনের মত চরিত্রের যা থাকে তাই—পাম্পসু। সুজাতা বলল, 'আমি 'কী'। আর তুমি বার বার মনে করিয়ে দিয়েছো—আমি 'কে'?'

এই 'কী' এবং 'কে'-র ধাক্কা এসে যেন দর্শকের সবার বুকে লাগল। ভরত হলের ভেতরটা তখন থমথম করছে। বাইরে হয়ত ঘণ্টা দিয়ে ট্রাম যাচ্ছে। অমিয় পরিষ্কার দেখল—লেখক চারজনও ঝুঁকে তাকিয়ে আছেন স্টেজে। একজনের চোখে চশমা নেই। বিষ্ণু ডান দিকে ঝুঁকে পড়ে ঠুক ঠুক করে সেদ্ধ ডিম ঠুকছে সিটে। চোখ স্টেজে।

শোয়ের শেষে ওঁরা চারজন গ্রীন রুমে এলেন। সঙ্গে বিষ্ণু। সন্তোষকুমার রজনীর গানের তারিফ করলেন। বললেন,'ছেলের বেশে আপনার অভিনয় দেখেছি।'

রজনী বলল, 'সে তো অনেক আগে। 'বিন্দুর ছেলে'তে অমূল্য করতাম। মাও করতেন।'

সুনীল বললেন, 'আপনার 'কবিয়াল' দেখেছি। চার পাচ বছর আগে। কোন তুলনা নেই আপনার অভিনয়ের। অমিয়বাবু তো নির্বিকার নিয়তির রোল করে গেলেন। রিডিকিউলের দিকটা তুলে ধরায় জীবনের ক্যারেকটারটা নেবার মত হয়েছে। নয়তো—'

মতি বললেন, 'পাবলিক নিতো না। খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বিরক্তিকর হয়ে যেত—'

শীর্ষেন্দু নটী বিনোদিনী দেখেছে রজনীর। সেসব কথায় না গিয়ে পরিষ্কার বলল, 'অভিনয়ের শেষে সুজাতার জন্যে কষ্ট হয়।'

ওঁরা আরেকবার চা খেয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় রজনী উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করল। তারপর বসল। 'কালকের প্রেস পাবলিসিটির টাকা নেই কিন্তু

—'বুকিংয়ের খবর কি?'

—'কুল্যে পৌনে চারশো টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে।'

—'কেন? তিন টাকার রো তো ফুল হয়েছে। আরও ছ'শো টাকা ধর। তা হলেও তো সব বিজ্ঞাপনের টাকা হচ্ছে না। অন্তত দু'টো বাংলা কাগজের বিজ্ঞাপনের টাকা তো চাই।'

—'আর পৌনে দু'শো টাকা শর্ট পড়বে তা হলে। সে টাকাই বা পাচ্ছি কোথায়? আমার হাতের এই শেষ বালা আমি বন্ধক দিতে পারব না।'

—'কী দরকার। আমার তো আছে। এখনো রাত বেশি হয়নি। মণিবাবুর বন্ধকী কারবার সারা রাত খোলা থাকে। শংকর—'

ডাকতেই শংকর এসে গেল। হাতের ঘড়িটা খুলে দিল অমিয়। সোনার ঘড়ি। শ্বশুর দিয়েছিল। 'টাকা নিয়ে রসিদ নেবে। তিন মাসের ভেতর ছাড়িয়ে আনব। তখন রজনীর গলার হারও ফিরে আসবে।'

—'আমার দরকার নেই অমিয়। এই তো বেশ চলে যায়। ঘড়িটা রাখো আমি বালাটা এনে রেখেছি। শংকর নিয়ে যাক—'

—'এবার রাখো না। পরে দরকার হলে দেবে। শংকর—টাকাটা দিয়ে বলবে আমাদের বিজ্ঞাপনটা যেন কলমের একদম নিচে যায়। একটু অনুরোধ কোরো। তাহলে সবার চোখে পড়বে।'

চণ্ডীদা হোটেলে ভাত খেতে গেল। শংকর বন্ধকের দোকানে ছুটলো। বুকিং থেকে শংকর ক্যাশ নিয়ে গেছে। একটু পরে বুকিংয়ের খাতা আর কাটা টিকিটের বই দিয়ে ব্রজনাথ চলে গেল। 'আজ একটু তাড়া আছে আমার। হিসেব মেলানো আছে। দেখে নিন।'

অমিয় কাটা টিকিটের বইটা রজনীর হাতে দিয়ে খাতা দেখে দেখে সংখ্যাগুলো পড়ে যেতে লাগল। আর লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে লাগল। সব তিন টাকার রো। রজনী বইটা মাথায় ঠেকালো। 'এরাই আমাদের লক্ষ্মী।'

নির্জন সরু সাজঘর। মেঝে থেকে পুরনো কলকাতার ড্যাম্প উঠে এসে চেয়ারের পায়াগুলো ফুলিয়ে দিয়েছে। আরেকটু বেশি রাতে আরশোলারা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়বে। কলকাতার এক ইঞ্চি নিচেই নরকের শুরু।

অমিয় টিকিট বই কপালে ঠেকানো অবস্থায় রজনীর দিকে তাকিয়ে পড়ল।

মেকআপ মোছা হয়নি। রজনী ভক্তি ভরে কপাল থেকে টিকিটের বইটা নামিয়ে বলল, 'এদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এরা না এলে নাটক বন্ধ হয়ে যেত। এরাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।'

—'আরেকজনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বলতে বলতে অমিয় চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল। সে না এলে নাটকই হত না।' বলতে বলতে দু'হাতের আঁজলায় অমিয় রজনীর মুখখানা তুলে ধরল। মেকআপ করা ঠোঁটে আলতো করে নিজের মেকআপ লাগানো ঠোঁট ছুঁইয়ে তুলে নিল।

—'এটা কি হল। কৃতজ্ঞতায় মুখে হাসি এসে গেল রজনীর। এইভাবে তুমি কৃতজ্ঞতার শোধ দাও বুঝি। নাও একটা পান খাও।'

—'তুমি তো আমায় পান-জরদা ধরালে।'

—'আরও অনেক কিছু ধরাবো, দেখবে।'

অমিয় তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। কেন যে হঠাৎ অমন একটা ভাব এল তার। ইদানীং বেডরুম সিনে এত অবলীলায় দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে। আজকেই মাতাল, লম্পটের চরিত্র করার সময় জীবন সুজাতার বাধা দেওয়া হাতখানার পর চুমর পাড় বসিয়ে দিচ্ছিস। খাটের ওপর বালিশের আড়ালে তার উরু সুজাতার উরুর ওপর পড়েছিল খানিকক্ষণ।

রামের খালি বোতলের কোকাকোলা খেয়ে সুজাতা নেশাগ্রস্ত রমণী হিসাবে যখন দুটো হাজার ওয়াটের ফোকাসের নিচে ধরা দিল—তখন জীবন দর্শকদের সামনে সুজাতার পিঠের বোতাম একটানে খুলে ফেলল।

এমন অভিনেত্রীর সঙ্গে অভিনয়ের সময় পাল্লা দিয়ে এগোতে হয়। নয়ত রজনীর সামান্য ভ্রূভঙ্গী কিংবা অপাঙ্গে একটি কটাক্ষ দর্শকদের সামনে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কোণে ছিটকে ফেলে দিতে পারে তাকে। সেখান থেকে ফিরে উঠে আসা—এসে দাপটে অভিনয় করা খুবই কঠিন। রজনী যেটা বোঝে তার নাম কমপিটেন্স।

সাজঘর থেকে এখন ভরত হলের ফাঁকা স্টেজ—নতুন সারানো চেয়ারের খালি সারি, ফ্লাড লাইটের অন্ধ তিনটি ফোকাস দেখা যাচ্ছিল। একদম পরিত্যক্ত বিয়ে বাড়ির চেহারা।

অমিয় চেয়ারে ফিরে গিয়েছিল। এবার উঠে এসে রজনী পাশে খাটে বসল। 'তুমি আমায় কি দিয়েছো জানো না রজনী। কাঁচিয়ে তুলে রাখা পুরনো জরি পাড়ের শাড়ি তুমি। ভালো শালকরের হাতে ধোয়া। একটুও মলিন হওনি। আমি

এ-নাটকের সাহস পাই তোমার কাছ থেকে। রোজ সাহস পাই। একা হলে আমি পারতাম না এসব।'

—'সরে বস।'

—'না। একটু চুমু খাব ভাল করে। এখন তো কোন দশক সাক্ষী নেই। তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখলে আমি নাটকের একটানা তিন যুগের ইতিহাসের স্বাদ পাই। সাহস পাই। জেদ আসে। তোমার সাপোর্ট ছিল বলে আজ অন্তত-কতকগুলো খরচ টিকিট সেল থেকেই আসছে।'

অমিয় ভারি মাথাটা নিচু করে এনে ঠোঁট সুদ্ধ রজনীর ঠোঁটে রাখলো। অনেক ক্ষণ। মাথা তুলবার পর রজনী বলল, 'হয়েছে! ইতিহাসের স্বাদ পেলে!'

অমিয় কোন কথা বলতে পারল না। তার চোখের সামনে খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। সেখান থেকে দশ টাকার ফ্রন্ট রোয়ের শূন্য আসনগুলি দেখা যায়। ওখানে খানিক আগে লেখকদের নিয়ে বিষ্ণু দত্ত বসেছিল।

বিষ্ণু একদিন বলেছিল, 'অমিয়, তুমি কখনো অন্যমনস্ক হয়ে তাকাবে না। তাহলে ভবিষ্যৎ তোমার দৃষ্টিপথে এসে ধরা দেয়। তখন ওই ঈগলনাশা মুখের ওপর বিষণ্ণতা এসে থানা গাড়ে। পরিষ্কার বোঝা যায়—মৃত্যু, ব্যর্থতা তোমার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে। তখন তুমি আর সোশাল নাটকের চরিত্রে থাকো না। অনেকটা মাইথোলজিক্যাল নিয়তি হয়ে দাঁড়াও। চোখ সুদূরে ন্যস্ত।'

হোটেল থেকে ভাত খেয়ে চণ্ডীদা ফিরে এল। 'সুজাতা' নাটকে তার তিনটি ডায়ালগ। হিন্দুস্থানী গোয়ালার মত কণ্ঠস্বর করে এক ঘটি দুধ নিয়ে আসে একবার। আরেকবার হনুমানজীর কাছে সুজাতার হয়ে পড়শীর রুগ্ন সন্তানের জন্যে প্যাঁড়া চড়াতে যায়। আরেকবার প্রসাদ নিয়ে ফিরে এসে ভেউ ভেউ করে হিন্দিতে কেঁদে ফেলে।

সেই চণ্ডীদা রাতে নাইটগার্ড। দিনে অমিয়র ক্যাশিয়ার। শো থাকলে ওই সময় সাজঘরেই ইলেকট্রিক ইস্ত্রি বসিয়ে ব্লাউজ, ঘাগরা, নাইট গাউন, পাঞ্জাবি, পাজামা, ধুতি, শাড়ি সব ইস্ত্রি করে দেয়। দুই সিনের ফাঁকে মিনিট দশেকের জন্যে অমিয় স্টেজ থেকে অফ হয়ে যায়। তখন লুঙ্গি এগিয়ে দেয়। পানের কৌটো আয়নার সামনে রাখে। লক্ষ্মীবিলাস দিয়ে অমিয়র চুলের জট ছাড়িয়ে মাথা আঁচড়ে দেয়। সময় পেলে কার্বন দিয়ে নাটকের স্ক্রিপ্ট কপি করে। যার ডায়ালগ মুখস্থ হয়নি পড়া ধরার মত তার মুখস্থ ধরে। না হলে বলে 'আবার পড়।' 'পঞ্চমুখে'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

চণ্ডীদা ওদের দু'জনকে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড অবধি এগিয়ে দিয়ে এল। রজনীকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে অমিয় সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের পেছনের দরজায় লাফিয়ে উঠলো। এত রাতে সেকেণ্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জাররা অমিয়র দিকে তাকিয়ে বিশেষ আগ্রহবোধ করল না। রং মাখা এই বাবুটি কোথায় সং সাজে কে জানে। অমিয় দেখেছে—কিছু যাত্রী এই সময়টায় ট্রামের জানালায় মাথা রেখে ঘুমোয়।

ট্রাম থেকে নেমে অন্ধকার দিয়ে হাঁটলে বাড়ি দু' মিনিট। এই রং মাখানো মুখ সে পাড়ার কাউকে দেখাতে চায় না। এমনিতেই রব উঠছে--সুজাতা নাটক নাকি অশ্লীল। একদিন তেতলার দাশদা এসে বলছিলেন, 'কী নাটক নামিয়েছেন এবার? কান পাতা যাচ্ছে না পাড়ায়—'

অমিয় বলেছিল, 'যারা বলছে—তারা দেখেছে?'

—'আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমরা দেখেছো ভাই? বড়দের বলেছি আপনারা দেখেছেন মশাই?'

—'তাঁরা কি বললেন?'

—'এক কথা! আমরা দেখিনি। শুনেছি।'

—'তাদের দেখে আসতে বলুন।'

বাড়ির উল্টোদিকেই খালের নীল পচা জল অন্ধকারে ডুবে আছে। করাতকলের মোটা গোলাইয়ের কাঠ থাক থাক সাজানো। রাস্তায় গর্ত। দোকানঘরের সাইন-বোর্ডগুলো রংচটা। ফ্ল্যাটবাড়ির বৃষ্টিভেজা দেওয়ালগুলো শ্যাওলায় জলে ফেঁপে উঠেছে। বাড়ি বাড়ি এখন মশারির ঘর, মশা, ড্রেনের পচা গন্ধ। এর ভেতর আমি অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় হল ভাড়া করে নাটক করছি। টিকিট বিক্রি করছি। বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। রজনীকে চুমু খাচ্ছি। তাতে পৃথিবীর কি যায় আসে! আমার ব্যক্তিগত যশোলিপ্সার জন্যেই এসব করে বেড়াচ্ছি। এর ভেতর কোথায় শিল্প! কোথায় মহত্ত্ব? স্রেফ ভাঁওতাবাজি।

দরজা খুলে লীলা বলল, 'শো ভেঙেছে রাত ন'টায়। এখন বারোটা বাজতে চলল। রোজ এত দেরি হয় তোমার—'

—'হিসেবপত্র করে ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে যায়—'

—'হাউসের খবর কি?'

—'তিন টাকার রো ফুল ছিল।'

—'এইতো গুড সাইন।'

—'এখনো অনেক দেরি। আরও বিজ্ঞাপন করা যেত।'

—'তোমার হিরোইনের খবর কি?'

—'ভালোই। সন্ধ্যায় এমন কি কাজ থাকে রোজ। দেখতে গেলে পার।'

লীলা বলল, 'ওমা! আমার স্কুলের কাজ থাকে না বুঝি। ওদের পড়াশুনো থাকে। সকালের রান্নাগুলো গরম বসাতে হয়। একটা কিছু নতুন রাঁধি।'

—'ভাত দাও। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

—'তোমাদের থিয়েটারে ছানাটানা কিছু করে রাখলে পারো। অতক্ষণ থাকো খিদে তো পাবেই।'

—'এর পর ছানা খেলে থিয়েটার উঠে যাবে। খেতে দাও।'

ভাত বেড়ে দিতে দিতে লীলা ভীষণ খুশির ভঙ্গীতে বলল, 'আমাদের স্কুলের বড়দিদিমণি ধরেছেন-তাঁকে আর তাঁর স্বামীকে পাশ দিতে হবে। তোমার বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে—সর্বপ্রকার ফ্রি পাশ বন্ধ—তাই আর আমি বলতে সাহস পাইনি—যখন সুবিধে হয় দেবে—'

—'কালই পাঠিয়ে দেব। তোমাদের স্কুলের সব দিদিমণির জন্যে।'

—'সে তো অনেক পাশ। তোমার লস হবে।'

—'একটু না হয় হল।'

—'তুমি তো বেলা এগারোটায় হলে যাও। রিহার্সেলে থাকলে ভুলে যাবে না তো।'

—'এসব আমার ভুল হয় না লীলা। থার্ড পিরিয়ডের আগেই টিচার্স রুমে পাঠিয়ে দেব।'

—'তাহলে ষোলখানা দিও। দু'জন ক্লার্ক আছেন। মাইনে নেওয়ার সময় তাঁরাও বলেছিলেন।'

—'বেশ তো।' ভাত মেখে অমিয় বলল, 'কোথায় তোমার নতুন রান্না?'

—'দিচ্ছি। ভালো হয়নি নিশ্চয়। পাড়ার গোয়ালার দুধ বেশি হয়েছিল। দিয়ে গেল তিন সের। সস্তায়। তাই ছানা কাটিয়ে আলু দিয়ে গরমমশলা দিয়ে ডালনা করলাম। ভাত ভাঙো আরেকটু দিই।'

—'ছেলেমেয়েদের দিয়েছো?'

—'ওরা তো শুধু এই দিয়েই ভাত খেল। তোমার জন্যে এটুকু রাখতে পেরেছি।'

—'আমি আর খাব না। তুমি নাও লীলা।'

—'আমার খিদে নেই আজ।' তারপর ভীষণ খুশির গলায় অমিয়কে বলল,

'হিস্ট্রির মিস গাইন বললেন, লীলা! তোর স্বামী একজন হিরো। আর তুই এই শাড়ি পরে থাকিস?'

—'বললাম, তা কি পরে থাকব? বেনারসী?'

—'তা কেন? ফেমাস লোকের বউ যেমন থাকে তেমন থাকবি।'

—'তা তুমি কি করলে?'

—'মাথা গরম হয়ে গেল। স্কুল ছুটির মুখে শাড়ির সেই ছেলেটি এসে হাজির। দু'খানা শাড়ি ইন্সটলমেণ্টে নিয়ে ফেললাম। ভেবো না। তিন মাসে শোধ হয়ে যাবে।'

—'আমি তো ভাবছিলাম—কিছু টাকা চাইব তোমার কাছে। বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার—বড় করে।'

—'কত টাকা?'

—'এই ধর চার হাজার—'

—'ওরে বাবা! অত টাকা কোথায় পাব?'

—'নাও ভাত খেয়ে ফেল লীলা। অনেক রাত হল।'

শুতে শুতে আরও অনেক রাত হয়ে গেল ওদের। দুটো একটা কথা জানতে চাইল অমিয়। যেমন, ছেলে পড়াশুনো করছে কেমন? ভোরে উঠে বড় মেয়ে সাঁতারে যায় কিনা। ভিজে কসটিউম পরে থাকে না তো বেশিক্ষণ। ইত্যাদি।

শেষের জবাবটুকু শুনতে পেল না অমিয়। ঘুম এসে এক চড়ে নিমেষে তাকে অজ্ঞান করে দিল। লীলা চেষ্টা করেও জাগিয়ে রাখতে পারল না। শেষে সব রাগ গিয়ে পড়ল থিয়েটারের ওপর। খানিক চুপ করে থাকল মশারির ভেতরেই।

তারপর লীলা বাইরের ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে পরিষ্কার কিছুই দেখা যায় না। যে কোন একটা জিনিস পরিষ্কার দেখার জন্যে তার চোখ দুটো সারাটা অন্ধকার চিরে ফেলতে চাইছিল।

কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না লীলা। স্কুলের টিচার সে। মনে মনে একটা আন্দাজ নিতে চেষ্টা করল। স্টেজের পেছনে গ্রীনরুমের জায়গা কতখানি?

॥ দশ ॥

'তোমার বাবা ফেরেন নি খোকেন ?'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো খোকন। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মা' এবার মায়ের দিকে ভালো করে তাকালো খোকন। 'মেকআপ তুলে এসো। আমি খেতে দিচ্ছি।'

—'তোরা খেয়েছিস তো ? আমার খিদে নেই। বাইরে খেয়েছি।'

—'একদম খাবে না ?'

—'না রে। তোদের বাবা কোথায় যেতে পারেন বল তো ?'

—'ফড়েপুকুরে দাদুর ওখানে গিয়েছিলাম। তারাও বলতে পারল না। কোথায় যেতে পারে ?'

—'আমিও তো তাই ভাবছি। এক মাস হয়ে গেল। নে শুয়ে পড়।'

—'কিচ্ছু খাবে না মা ?'

—'না রে !'

—'রাত উপোসে হাতি মরে কিন্তু।'

—'আমি তো আর হাতি নই।'

—'তুমি তো খুব শুকিয়ে গেছ।'

আলো নিভিয়ে দু'ঘরে দু'জন শুয়ে পড়ল। খালি পেটে শুয়েছিল বলে অন্ধকারের ভেতর রজনীকে স্বপ্নে পেল।

...ভরত হলের সামনে পুলিশ লাঠি চার্জ করছে। ভিড় সামলাতে। হাউস ফুল। শুধু তিন টাকার টিকিট লাইন দিয়ে কেনা যাচ্ছে। শোয়ের আগে গাড়ি থেকে নামতেই মেইন গেটে রজনীর চোখ গেল। একখানা টিকিটের জন্যে প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি চলছে। ভিড়ের চাপে লাইন বেঁকে যাচ্ছে। ভরত হলের দু'জন দারোয়ান মিলেও সে লাইন সোজা করতে পারছে না। লোকের চাপে লাইন থেকে যে প্রথম পড়ল সে আর কেউ নয়—'কবিয়ালে'র রাজন—তৃপ্তি। পড়েই উঠবার চেষ্টা করল তৃপ্তি। পারল না। তার ওপর আরও দু'জন ছিটকে এসে পড়ল।

...ফার্স্ট বেলের আওয়াজ। আর দাঁড়ানোর মানে হয় না। এখুনি সাজঘরে যাওয়া দরকার। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। ভরত হলের উল্টোদিকেও ট্রাম

লাইনের ওপারে লোক দাঁড়িয়ে। অনেকেই টিকিট পায়নি। তাদের ভিড় ফুটপাথে। ট্রাম লাইনে। রাস্তার ওপর। গিজগিজ করছে।

…রজনী যতবার গেটে ঢুকতে যায়—ততবারই কোন না কোন ভিড়ে সে জড়িয়ে পড়ে। কিছুতেই গেটের কাছে এগোতে পারছে না। পা আটকে যাচ্ছে বারবার। এই সামান্য দু পা সে পার হতে পারছে না। গুণগ্রাহীর নমস্কার, প্রতি নমস্কার, অটোগ্রাফের খাতায় সই দিতে দিতে রজনী বুঝলো এ ভিড় থেকে সে আর বেরোতে পারবে না কিছুতেই। অথচ এখুনি গিয়ে মেকআপে বসা দরকার। এই যাঃ। সেকেণ্ড বেলও পড়ে গেল।

…রজনী পড়ি মরি করে এগোতে গেল। ভিড়ের চাপে তার দম আটকে আসছে। একটু এগোয় তো আবার ভিড়ের চাপে চার হাত পিছিয়ে যায়। সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের। এখুনি আমাকে একটু পথ দাও। পার্ট মুখস্থ আছে আমার। মেকআপ নেওয়ার দরকার নেই। আমি ছুটে গিয়ে স্টেজের বাঁ দিক থেকে এনট্রান্স নেব। ত্রিদিববাবুরা মিউজিকে বসে গেছেন। এখুনি ড্রপ উঠবে। আঃ! অমিয় আমি যাচ্ছি—

… এতক্ষণের ভিড় ঠেলাঠেলিতে রজনী এই প্রথম একটু মুক্তি পেল।

চোখ মেলে দেখল এখন খুব সকাল। ভোর হতে শুরু হয়েছে। বসার ঘরের টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ধরল। তা হলে সেকেণ্ড বেল নয়। ফোন বাজছিল।

—'আমি অমিয় বলছি। একটা বিজ্ঞাপন মাথায় এসেছে। লিখে ফেলেছি।'

রজনী তাকে থামিয়ে দিল। 'রাতে ঘুমোওনি?'

—'ঘুমিয়েছিলাম। অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল। বসে বসে লিখে ফেললাম। এ বিজ্ঞাপনে অন্তত হাজার তিনেক টাকা চাই। পর পর তিনদিন রিপিট করতে হবে।'

—'উফ বাবাঃ! ভালো কথা বলেছো। অত টাকা কোত্থেকে আসবে!'

—'লীলা কিছু দিচ্ছে। আজই ওদের টিচার্স কোঅপারেটিভ থেকে তুলে দেবে। দু'টোর ভেতর। তুমি ভ্যাখো না কিছু। আমি বলছি—এ কপি ক্লিক করবেই। আমি জানি।'

—'আগে তো ম্যাটারটা দেখি। হলে আসছো কখন?'

—'যখন বলবে।'

—'আছা! এখন টাকার বেলায় খুব বাধ্য ছেলে। দেখি—হলে গিয়ে সব বলবো।'

—'শশাঙ্কবাবুর ঘুম ভাঙাইনি তো?'

—'হ্যাঁ। ভাঙিয়েছো।' বলেই ফোন রেখে দিল রজনী।

অমিয় ফোন করে বাড়ি ফিরতেই লীলা বলল, 'এই দেখলাম—আলো জ্বালিয়ে লিখছো। এর ভেতর কোথায় গেলে? চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

অমিয় বলল, 'যে টাকাটা দেবে বলেছো—দেবে তো?'

—'বললাম তো দেব। ওই কটা টাকাই আছে আমার কোঅপারেটিভে। শেয়ারের জন্তে কিছু হয়ত কেটে রাখবে।'

—'আমি তোমার সব নিয়ে নিচ্ছি।'

—'আরও থাকলে দিতাম।' তারপর অন্ত জায়গা থেকে শুরু করল লীলা। 'কতকাল পরে আমরা এমন ভোরে উঠে চা খাচ্ছি আবার। তোমার থিয়েটারই তোমাকে অনেকটা নিয়ে গেছে।'

চায়ে চুমুক দিতে দিতে অমিয়র চোখ গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপরের প্যাডে। পাশের ডটপেন থেকে রিফিল বেরিয়ে আছে। অন্ধকার থাকতে থাকতে আলো জ্বালিয়ে ভূতে পাওয়ার মত লিখে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে টাইপের সাইজ পর্যন্ত মাথায় এসে গিয়েছিল।

ভরত

পঞ্চমুখ

পঞ্চাশ রজনীর পথে

সুজাতা

প্রতিটি দৃশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্ত

আজ, কাল ৩ ও ৬-৩০ মি × বৃহস্পতি ৬-৩০ মি

রজনী অমিয় কল্যাণী ও শংকর

নাটক ও নির্দেশনা : অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বপ্রকার ফ্রি পাশ বন্ধ

খালি চায়ের কাপ কলঘরে নিয়ে যেতে যেতে লীলা বলল শংকরকে ছুটোর ভেতর পাঠিয়ে দিও। আমি টাকা তুলে রাখবো।

আজকাল অফিসযাত্রীর মতই অমিয় সকাল সকাল চান করে। দুটি মুখে দিয়ে ভরতে ছোটে। সেখানে আগের দিনের বকেয়া পেমেন্ট থাকে। রিহার্সেল থাকে। বিজ্ঞাপনের টাকা পাঠানো থাকে। থাকে কাগজের লোকজনদের কিছু কিছু অনথক ফোন করা। কেউ তো এগিয়ে এসে একটি রিভিউও করল না। রজনী সেদিন মেঝের দিকে তাকিয়ে নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল সাজঘরে। কত প্রাইজ আজ-কাল। কত সভা সম্বর্ধনা। আমায় কিন্তু কেউ কোনদিন কোথাও ডাকে নি। অথচ প্রায় তিরিশ বছর হল একটানা স্টেজে আছি। কি যে ব্যাপার বুঝি না।

আজ কিছু আগেই এসে সাজঘরে ঢুকলো অমিয়। গম্ভীর থমথমে সাজঘর তখন একটি গানে গমগম করছে। মিউজিকের লোক কেউ আসেনি। রজনী অরগ্যানে রিড টিপছে। চণ্ডীদা তিন রঙের তিনটে পাঞ্জাবি নিয়ে পড়েছে ইস্ত্রি করতে।

রজনীর একার গলায় সারা হল বোঝাই হয়ে গেল।

'বাঁধিয়া বিনোদ বেণী—'

'বিনোদে' এত সুন্দর একটা টান। কোন জানান না দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল অমিয়। নতুন রেকসিনের প্রতিটি শূন্য সিট যেন এই মুহূর্তে দর্শকে ভরে গেছে। গানের শেষে অমিয় তিনটি পজ় দিয়ে আলাদা করে তিনটি ক্ল্যাপ দিল।

রজনীকে লজ্জা অনেকদিন পর আক্রমণ করে কাবু করে ফেলল। কোন মতে মাথা তুলে বলল, 'কখন এলে ?'

—'এই তো। তুমি কখন ?'

—'অনেকক্ষণ। প্রভাতের বার্তা পেয়েই—'

—'বন্ধকের দোকানে চলে গেলে। কত এনেছো ?'

—'সতেরো শো। হবে তো ?'

—'খুব হয়ে যাবে। শশাঙ্কবাবুর ঘুম ভাঙাইনি তো সকালে ?'

—'নাঃ !'

—'উনি বুঝি দেরিতে ওঠেন।'

—'হ্যাঁ' তারপর অমিয়র দিকে ঘচ করে ঘুরে তাকিয়ে রজনী বলল, 'সে তো সেই ফার্স্ট নাইটের পরদিন থেকে হাওয়া। কোথায় গেছে কিছু বলেও যায় নি।'

—'কি বলছো তুমি। এত দিন বলোনি কেন ?'

—'বলে কি হবে ? কাছাকাছি আছে। মনে হয় আমি বেরিয়ে এলে ছেলে-

মেয়েদের দেখতে আসে। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি—বসার টেবিলের ছাইদানিতে আধপোড়া সিগারেট জ্বলছে—টেবিলে খবরের কাগজ খোলা। হয়ত বসে বসে পড়ছিল'—

নিজে ধরিয়ে অমিয় বলল, 'একটা সিগারেট খাবে ?'

'উঁহু। আমি তো বৃহস্পতি, শনি, রবিবার শুধু সিগারেট খাই।'

বলেই দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলো। এই তিনদিনে পাঁচটি শোয়ে সারা হপ্তায় মোট দশবার দর্শকদের সামনে সুজাতাকে বারবনিতার রোলে সিগারেট ফুঁকতে হয়।

—'কই ? ম্যাটার দেখি।'

অমিয় বুকপকেট থেকে বের করে দিল। রজনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো খনিকক্ষণ। তারপর বলল, 'আমাদের তো বন্ধু চারদিকে ! এই বিজ্ঞাপন বেরোলে সবাই আমাদের গায়ে অশ্লীল বলে দাগ মেরে দেবে না তো ?

—'দেওয়ার কি কিছু বাকি আছে রজনী ? এখন যেভাবে নাটক চলছে—তাতে টিকিট সেল থেকে কোনদিনই ধার শোধ হবে না। বরং সুদের পাহাড়টাই উঁচু থেকে আরও উঁচু হতে থাকবে। একটা কিছু তো করতেই হবে আমাদের। থেমে থাকলে তো চলবে না। কোথাও তো ঝুঁকি থাকবেই।'

—'এতগুলো টাকা।'

—'তবে ঝুঁকি নিও না। ধুক ধুক করে চলতে থাকো। তারপর একদিন নিভে যাবে। কেউ টেরও পাবে না।'

—'বেশ। দাও বিজ্ঞাপনটা।' বলে রজনী গুনগুন করে গান ধরল। খুব চাপা স্বরে। গ্রুপের কেউ এখনো আসেনি। তাই নির্জন। চণ্ডীবাবুর মুখে তো কথাই নেই। চাপা সুর থেকে যে গানটি উঠে আসছিল তা হল—

'নতুন এ পথ চলিতে
চরণ কাঁপে—'

চণ্ডীদার ইস্ত্রি থেমে গেল। সাবধানী লোক। পাছে গানে তন্ময় হয়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবিগুলো পুড়িয়ে বসে—তাই প্লাগ খুলে ইস্ত্রিটা সোজা দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর বাবুর বাড়িতে যেভাবে চাষী এসে বসে থাকে—ঠিক সেইভাবে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসল।

অমিয়র কান ছিল গানে। তাতে মাথার ভেতর যেখানে যেটুকু আনন্দ হওয়ার তা হচ্ছিল। কিন্তু মন ছিল অন্য জায়গায়। মন বলছিল, আমি দু'জন মেয়ের শেষ

টাকা ক'টি নিয়ে নিচ্ছি—তা কি ফেরত আনতে পারব? যদি না পারি? তা হলে কি হবে? কোত্থেকে দেব? গান থামলে অমিয় বললে, 'কাজ নেই। থাকগে!'

রজনী অবাক হয়ে বলল, 'কি থাকবে?'

—'বিজ্ঞাপন দিয়ে দরকার নেই। অতগুলো টাকা। বিজ্ঞাপনের পরেও যদি টিকিট বিক্রি না বাড়ে তখন কি হবে?'

—'অত ভাবলে চলে? এর নাম হল গিয়ে শো বিজনেস—।' বলতে বলতে রজনী দেখলো ভরত হলের পুরনো বাসিন্দা সেই পায়রা ছুটি নিজেদের মধ্যে প্রেম বিনিময়ে ব্যস্ত। ঠোঁটে ঠোঁটে নানান কিছু হয়ে যাচ্ছে। হয়ত পুরুষ পায়রাটি ঠোঁটে করে কোন সুস্বাদু পোকা এনেছে—বউকে খাওয়াবে বলে। বউ রেলিশ করে খাচ্ছে আর স্বামীর শিকারের তারিফ করছে খেতে খেতে।

পরদিন সকালে অমিয় বিছানায় বসে চায়ের সঙ্গে কাগজে প্রায় চার হাজার টাকার বিজ্ঞাপনটি বার বার পড়ল। লীলাকে ডেকে ডেকে দেখালো।

বেলা এগারোটায় খেতে বসেছে অমিয়। এমন সময় বুকিংয়ের রবি এসে হাজির! এক রকম ছুটতে ছুটতে। উদভ্রান্ত চেহারা। বুকপকেট ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলে পড়েছে।

—'কে মারলো তোমায়?' অমিয় খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়াল।

—'মারেনি কেউ। আপনি দাদা আগে পুলিশে খবর দিন।'

—'কী হয়েছে বলবে তো।'

—'বেলা সাড়ে ন'টার ভেতর বুকিং শেষ। আজকের পর পর ছুটো শো-ই হাউস ফুল।'

—'কি বললি?'

—'হাউস ফুল।'

—'কি ম্যাটিনির?'

—'ম্যাটিনি, ইভিনিং—ছুটোই দাদা। পাবলিক ভেঙে পড়েছে ওইটুকু বুকিংয়ের ওপর। আপনাদের ছবি টাঙানো কাঁচের বাক্স ভেঙে পড়েছে। এখন লোক সামলাবে কে? পুলিশ দরকার। বাইরে তিন টাকার টিকিট বাইশ টাকায় ব্ল্যাক হচ্ছে। আমি চণ্ডীদাকে বসিয়ে ছুটে এসেছি। সোডার বোতল ছুড়েছে ছু'বার। প্রাইভেট বাস বন্ধ হয়ে গেছে।'

—'সত্যি বলছিস! অ্যা! ওঃ! হো। হো—' অমিয়র হাসি আর থামছে না। 'শুনে যাও লীলা—ও লীলা।'

লীলা দেরি করে স্কুলে বেরোচ্ছিল। ফিরে এসে বলল, 'কি হয়েছে? এত চেঁচাচ্ছো কেন?'

—'ম্যাটিনি, ইভিনিং—দুটো শো হাউস ফুল।'

—'কী বললে? আবার বল তো।'

—'ডবল শোয়ের দু'টোই হাউস ফুল। এই তো বুকিংয়ের রবি ছুটে এসেছে জানাতে—'

লীলা সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। হাতের খাতার বাণ্ডিল কোল থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। অমিয় হাত ধুতে ভুলে গিযে জামা পরতে যাচ্ছিল।

রবিই থামালো। 'হাত ধুয়ে নিন। আমি কোথায় সাহায্যের জন্য আপনার কাছে ছুটে এলাম—আর আপনি হাসছেন হো হো করে—'

—'পরে কথা হবে'খন। ট্যাক্সিতে এসেছিস?'

'হ্যাঁ।'

—'চল চল। গাড়িতে বসে বলব।'

অমিয় ট্যাক্সিতে ওঠার মুখে ঝুলবারান্দা থেকে লীলা ঝুঁকে পড়ে তাকে বলল, 'আমি আজ আর স্কুলে যাচ্ছিনে।'

এক পা গাড়িতে দিয়ে অমিয় দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'বেশ তো যেও না। হাউসে এসো না হয় একবার।'

লীলা মনে মনে হেসে ফেলল। হাউসটা বুঝি তার আর অমিয়র বিয়ের যৌতুক! এমনভাবে বলছে অমিয়। জোরে বলল, 'আমার সেই বোলখানা পাশ কিন্তু মনে থাকে যেন—'

সেদিন বেলা আড়াইটের সময় কেউ যদি ভরত হলের সামনে এসে দাঁড়াত—তাহলে দেখতে পেত—ওই ভিড়ের ভেতর মাত্র একজন মহিলাই টিকিট চাইছেন না। তিনি শুধু একবার ভেতরে যেতে চান। দারোয়ান গেট খুলতে রাজি হল না। চেঁচিয়ে বলল, 'অমিয়বাবুর হুকুম নাই।' লীলার পক্ষে সেই ভিড়ে কিছুতেই বলা সম্ভব হল না যে হুকুমদার অমিয়বাবু আমার স্বামী। তাকেও আমি মাঝে মাঝে হুকুম করে থাকি। এসব কথা ভিড়ে বলার বিষয় নয় বলে লীলা উল্টোদিকের ফাঁকা ট্রামে করে ডিপোয় গেল। সেখান থেকে সিধে বাড়ি। আজ ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরে মাকে এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে দেখতে পেয়ে খুব খুশী হবে। ফাঁকা বাড়িতে ভরদুপুরে গান গাইতে গাইতে লীলা হালুয়া রাঁধতে বসল। কিন্তু

হাত-পা যে একদম অবশ অবশ লাগছে। হালুয়া নামিয়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল। সেখানেও তার ঘুম এল না।

অন্য দিন ডবল শোয়ের পর রো গুনে গুনে হিসেব কষতে সময় চলে যায়। কতগুলো ফাঁকা সিট—কতগুলো পাশ—তার লিস্ট মিলিয়ে তবে হিসেব আসে। ততক্ষণে রাত সাড়ে দশটা-এগারোটা হয়ে যায়।

আজ শোয়ের আগেই হিসেব। অঙ্ক কষার কিছু নেই। যত সিট গুণিতক রোওয়াবি তত টাকা। তারপর একটা সিম্পিল যোগ। হাউস ফুল হলে উনত্রিশশো চল্লিশ টাকা হয়। দুই শো তে তাব দ্বিগুণ হল ক্যাশ বাক্সে ভরে চণ্ডীদার হাতে চাবি তুলে দিল অমিয়।

ফার্স্ট বেলের পর রবি এসে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়াল। 'অনেক ভাল ভাল ঘরের মেয়ে-বৌরা টিকিট না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।'

—'যাচ্ছেন তো আমি কি করব?'

রজনী সালোয়ার পরতে পরতে বলল, 'এক্সট্রা চেয়ার দাও।'

- 'চেয়ার থাকলে তো।'

—'কেন আগেকার চেয়ারগুলো কি হল?'

—'সে তো ভাঙা সব।'

—'বেছে দেখ না রবি। চণ্ডীদা একটু দেখবে?'

রজনীর কথায় চণ্ডী গেল। খানিক পরে এসে বলল, 'পঁয়তাল্লিশখানা কোন রকমে হতে পারে।'

অমিয় বলল, 'দশ টাকার রোয়ে এক্সট্রা দিয়ে দাও।'

রবি হাসতে হাসতে চলে গেল। খানিক পরে গুনে টাকা দিয়ে গেল। টাকা বুঝে নিয়ে রবিকে টিজ করতে শুরু করল অমিয় আজ ভীষণ রিল্যাকসড্ লাগছে তার।

—'কী রে রবি—তুই ব্ল্যাক করছিস না তো।'

—'সেইটেই বাকি আছে দাদা।' তারপর সিরিয়াসলি বলল, 'এরকম বিজ্ঞাপন আর দেবেন না।'

—'পাগল নাকি! এবার থেকে দু'উইকে এক বার বিজ্ঞাপন যাবে। বেলা বারোটা থেকে মাইকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা বসে গেছে।' সেরকম গলা নকল করে অমিয় বলতে লাগল, 'বন্ধুগণ'! আপনাদের সহানুভূতির কথা আমরা কোন দিন ভুলবো না। আজকের মত আমাদের মাপ করে দিন। আর টিকিট

নেই। দয়া করে রাস্তায় ভিড় করে ট্রাফিক জ্যাম করবেন না। তাতে আমাদেরই সুনামের ক্ষতি। বন্ধুগণ !!'

—'আজ সকাল শুরু হয়েছিল তোমার টেলিফোনে।'

—'উঁহু। আজ নয় কাল। আজ দুপুর শুরু হল আমার বিজ্ঞাপনে রজনী। এবার দয়া করে ম্যাসকারা লাগিয়ে নাও চোখে। বি স্টেডি।'

অমিয় পরিষ্কার বুঝতে পারছিল—রজনী এখুনি কেঁদে ফেলতে পারে। এসব ব্যাপারে এখন মন দিলে মুশকিল। শোয়ের বারোটা বেজে যেতে পারে। নিজের মুখের রিংকেলের ওপর লাইনিংয়ের সেড দিতে দিতে রজনীর চেয়ারে চোখ পড়ল। রজনী ঝুঁকে পড়ে বেস অয়েণ্টমেণ্ট মাখাচ্ছিল মুখে। ঘেমে গেছে। মাথার ওপর একটা পাখা দিতে হবে ওখানে।

রজনী তার আয়নায় অমিয়র মুখ দেখতে পেল। অমিয়ও ঠিক তখনি তার আয়নায় রজনীর মুখ দেখতে পেল। অনেকটা আয়নার টেলিফোন। কেউ কাউকে মুখোমুখি দেখছে না। সবই আয়না দিয়ে। রজনী হাসলো। অমিয়ও হাসলো। তখনই রজনী স্টেজের সুজাতার ভঙ্গীতে প্রতিবিম্বের অমিয়কে আয়নায় একটি ছুটন্ত চুমু পাঠালো।

অমিয় মুখে বলল, 'ভালো হচ্ছে না কিন্তু। শশাঙ্ক বাবুর সঙ্গে দেখা হলে বলে দেব।' মনে মনে অমিয় জানে এখন ঠাট্টায় ঠাট্টায় কাটিয়ে দিয়ে রজনীকে স্টেজে পাঠাতে না পারলে ও আজ নির্ঘাৎ ডোবাবে। যে কোন সময় হু হু করে কেঁদে উঠতে পারে। এখনো হাউস ফুলের ধাক্কা সয়ে উঠতে পারেনি। কাল শেষ রাতে টেলিফোন। শশাঙ্ক নিরুদ্দেশ। কিংবা ঘাপটি মেরে কাছাকাছিই আছে হয়ত। তারপর এই কাণ্ড। কান্নার আর দোষ কি।

—'দেখা পাচ্ছো কোথায়। তিনি হয়ত মদের দোকানে আমার প্রেমিক তৃপ্তি-বাবুকে সঙ্গ দিচ্ছেন। সরল সঙ্গ। নিজে মদ ছোঁবে না। মাতাল হয়ে তৃপ্তি হয় আমার রূপ, স্বভাব, অভিনয়ের স্তুতি করবে। কিংবা মুণ্ডুপাত। তুই-ই নির্বিকার মুখে শুনে যাবে। সত্য-মিথ্যায় মেশানো তৃপ্তির নানান তথ্যে মাথাটি বোঝাই করে গোপনে এসে ছেলেমেয়েদের দেখে যাবে। তাদের মনে মা সম্পর্কে অভিযোগের কুণ্ডুলী পাকিয়ে তুলবে। আর নিজের বউয়ের কীর্তিকলাপ শুনবে তৃপ্তির মুখ থেকে। শুনে সুখ পাবে।'

ভাল সাবজেকট। এ বিষয়ে রজনীকে অন্যমনস্ক করে দিতে পারলে রজনীর আর কিছু মনে থাকবে না। বিষয়টা পেয়ে অমিয়র ভালোই লাগছিল।

—'আমরা কেন তৃপ্তিকে ধরে নিয়ে এলাম? ও নিজে কেন আসে নি? এই কথা ভেবেই শশাঙ্কবাবু আমাদেব ভালো'চোখে দেখতে পারছেন না।'

—'হবে। কিন্তু ও কি নিজে কোন দিন তৃপ্তিকে শাসিয়ে কথা বলতে পারতো? আজও পারবে? কক্ষনো না। আমি শশাঙ্ককে বুঝি না। আমার প্রমিনেন্স আমাকে ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল। ও চায় আমি রান্নাবান্না করে বউ হয়ে থাকি। কিন্তু সংসারের টাকাটা ও এনে দিতে পারবে না। সেটা আমাকেই জোগাড়যন্তর করে আনতে হবে। আনতে গিয়ে যা-কিছু হয়—তা ওর ঘোর অপছন্দ। কিন্তু সে-কথাও মুখ ফুটে বলবে না। এতকাল পরে আব সয় না।

বলতে বলতে রজনী উঠে এল। তখন অমিয়র আয়নার বাইরে চলে গেছে সে। তাই অমিয় আদৌ বুঝতে পারেনি—কি হতে যাচ্ছে।

রজনী সোজা উঠে এসে পেছন থেকে অমিয়র গলা জড়িয়ে ধরল।

—'এই! দেখেছো। কি হচ্ছে—কি হচ্ছে—'

—'আমি তোমায় একটা চুমু খাই—চেঁচিয়ো না ষাঁড়ের মত—'

—'বেশ তো খাও না। কিন্তু শংকর, চণ্ডীদা, কল্যাণী ওরা রয়েছে—দেখে খেয়ো।'

—'সব সময় মাস্টারী ভাল লাগে না।' মাথা নামিয়ে রজনী অনেকক্ষণ ধরে অমিয়র মাথার ওপর গাল রাখল।

সেকেণ্ড বেল বেজে উঠে ওদের সতর্ক করে দিল। এবার যা কথাবার্তা তা সেই স্টেজে। হাউস ফুল। একস্ট্রা চেয়ার দিয়ে সুজাতা নাটকের অভিনয় এই প্রথম।

ড্রপ উঠতেই স্কোর করল রজনী।—

'আমার এই ধনুক চোখে
মুহব্বতের—'

গানটার সঙ্গে রজনী যেন কাওয়ালির একটি টুকরো সুর হয়ে খাটের এপাশে-ওপাশে পিছলে যেতে লাগল। ছদ্ম টাগ অব ওয়ারের টানাটানিতে রজনী একবার অমিয়র বুকে এসে পড়ল। পড়েই হাসি-ছোটনো গান দিয়ে স্টেজের অন্যদিকে চলে গেল। আজ যেন রজনীর বয়স দশ বছর কমে গেছে।

স্টেজে উঠে ফুট লাইটের এলাকা পেরোলে শুধু কালো কালো মাথা। সবাই স্টেজের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে।

রজনী হাসছে, গাইছে, নাচছে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরকার উষ্ণীষের

মতই মুকুটের ওপরকার শাদা পেখমটা আলোর নিচে ঘুর ঘুর করে ঘোরে। বেশ লাগে তখন। পার্ট ভুলে গিয়ে আজ তার টাঁডিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছিল।

ঠিক এই সময় কোন দিক থেকে ঢুকতে না পেরে বিষ্ণু দত্ত পাশের ভাজা-ওয়ালার গলিতে ঢুকে গেল। জায়গাটা অন্ধকার। কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। তাই সই। কয়েকটি ডিম সেদ্ধ এবং ছোট একটি রামের পাইট খুব সাবধানে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ভরত হলের কম্পাউণ্ড ওয়ালের ওপর চড়ে বসল। এদিকটায় আলো আসেনি। আবার গাঁথুনি হবে বলে ভাগ্যিস অর্ধেক গাঁথা ইটের দাঁত বেরিয়ে ছিল। তাই বেয়ে সে উঠেছে। এখন নামা দরকার। ভেতরেই ভরত হলের ঘাসে ঢাকা ছোট্ট প্রাঙ্গন। আজ শো নেই নাকি! কোন হৈ হট্টগোল নেই। তাহলে রজনীর গলায় টপ্পা শোনা যাবে বেশ ধীরে সুস্থে। ওরা আছে তো। না বেরিয়ে গেছে? শেষে শুধু ইস্ত্রিওয়ালা চণ্ডীর মুখ দেখতে হবে না তো।

অনেক ক্যালকুলেশন করে ছিপির মুখ নিচের দিকে রেখে পাইন্টটা নিচে ছেড়ে দিল বিষ্ণু। ভাঙেনি। তারপর ঠোঙাসুদ্ধ ডিমগুলো। শেষে একটি অসতর্ক বস্তার মত বিষ্ণু নিজেকে নিচে ফেলে দিল। যাক লাগেনি বিশেষ

উঠে দাঁড়িয়ে ডিম ও পাইট সমেত বিষ্ণু দত্ত আবিষ্কারকের ভঙ্গীতে পা ফেলে ফেলে গ্রীণরুমে এল। যা ভেবেছে। শুধু চণ্ডী একা রয়েছে।

—'কি? আজ শো বন্ধ নাকি? কোন সাড়া শব্দ নেই?'

—'চুপ! বলে চণ্ডী স্টেজের দিককার দরজাটা আলগোছে বন্ধ করে দিল।'

সেই সেকেণ্ডের ভেতর বিষ্ণু দেখতে পেল নাটকের ভেতর সেই নাটকটি হচ্ছে। মহাভারত থেকে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সিনটুকু। এখানে অমিয় পাবলিককে খুব হাসায়। নিজের অজান্তে নাটকের নিয়তির দিকে এগোয়। আর তাহলে মিনিট পনেরো।

—'দরজা মরজা সব আটকানো কেন?'

—'আজ কি হয়ে গেল জানেন না বুঝি।'

—'কি হয়েছে? লোক হয়নি একদম?'

—'লোক! হাঃ। হাঃ'

চণ্ডী হেসেই যাচ্ছে দেখে বিষ্ণু বলল, 'আস্তে, স্টেজে অভিনয় হচ্ছে।'

—'সে তো জানি। কী বলছিলেন? লোক? একেবারে লোকে লোকারণ্য।'

—'মানে?'

—'হাউসফুল। পরপর দুই শো হাউসফুল। বসুন আপনি, জল খাবেনতো। ডিম খাবেন তো। গ্লাস, ডিস, নুন—সব এনে দিচ্ছি।'

গন্ধর্ব অফিস থেকে বেরিয়ে এক জায়গায় বসে যেটুকু অন্য রকম ভাব হয়ে আসছিল এতক্ষণ—প্রথমে দেওয়াল টপকানো—তারপর চণ্ডীর কথা শুনে তা একদম কেটে গেল। বলে কি! ডবল শো হাউসফুল। একি নতুন দুর্গাদাস এলো।

একা-একাই বিষ্ণু দত্ত সেদ্ধ ডিম সহযোগে দু'বার রাম নিল পনর মিনিটের ভেতর। ফুল শো যখন ভাঙলো—তখন বিষ্ণু আবার আগেকার মতোই তৈরি। চেয়ার থেকে ডান হাতখানা ঝুলিয়ে দিয়ে মেঝেতে ডিম ঠুকছিল।

ঘামে নেয়ে ওঠা অমিয় আর রজনী উইংসের পাশ দিয়ে গ্রীণরুমে এসে এই পরিচিত দৃশ্য দেখে ভীষণ খুশী হল। বিশেষ করে আজ। ড্রপ পড়ে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ অডিটোরিয়ামে ক্ল্যাপ থামেনি।

—'এসব কি শুনছি?'

রজনী বলল, 'বোসো। শাড়ি পাল্টে এসে বলছি।'

অমিয় গরমে, ঘামে হাঁফাচ্ছিল। 'চণ্ডীদা' বলে ডাকতেই লোকটা এসে একটা বড় তোয়ালে দিয়ে অমিয়কে মুছতে লাগল। তারপর দু'ভাজ করা একখানা শাড়ি এগিয়ে দিল। সেটা লুঙ্গির মত করে পরে নিয়ে অমিয় ধুতি ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদা তা প্লাস্টিকের বালতিতে গুঁড়ো সাবানের জলে ফেনায় ডুবিয়ে দিল।

—'কি খাবে বল আজ?'

—'কি আর খাব এখন। পাইটটা তো ধরাই আছে একরকম।'

অমিয় স্পিরিট গাম তুলতে তুলতে বলল, 'এই ছাখো—তোমার কথা মত এক-জোড়া জুলফি লাগাই রোজ। তুলতে লাগাতে বড় ঝামেলা।'

—'তোমার জুলফিহীন ঈগলনাকের দুপাশের দৃষ্টি স্বয়ং নিয়তির কথা মনে পড়িয়ে দেবে।'

—'কতটা হল আজ?'

—'এই চার ছিপি!'

—'না, চার গ্লাস!'

—'হবে!'

॥ এগারো ॥

পরদিনও তাই হল। ডবল শো হাউসফুল। চেয়ার ভাড়া নিয়ে পঁচাত্তর খানা একস্ট্রা চেয়ার দিতে হল। তাও অনেকেই ফিরে গেল। তিন টাকার টিকিটের ব্ল্যাকে হাইয়েস্ট দর উঠলো তিরিশ টাকা। রবি একবার বুকিংয়ে যায় আর এক একটা খবর নিয়ে আসে। হিসেব নিকেশের কোন অসুবিধে নেই। উনত্রিশ শো তিরিশ ইনটু টু।

সোমবার কোন শো থাকে না। দেরি করেই ঘুম থেকে উঠে একটা অঙ্ক কষছিল অমিয় মনে মনে। হপ্তায় পাঁচটা শো। মাসে কুড়িটা। এক মাস ধরে এমন চললেই তো সব দেনা শোধ। বরং শোধ করে বেশি হয়ে যাবে।

চা খেয়ে ভেবেছিল আজ তার ছেলের সঙ্গে বসে বসে ক্যারম খেলবে। বড় মেয়েকে গাইতে বলবে। সে সব কোন সুযোগ হল না তার।

প্রথমে এল দুর্গালাল।

—'বাড়ি চিনে এলেন কি করে?'

—'সে আপনি ফেমাস লোক এখন। আপনার বাড়ি চিনতে অসুবিধে কিসের—'

—'আপনার কিস্তি আমিই গিয়ে দিয়ে আসতুম।'

—'ছিঃ। ছিঃ। ও কথা বলবেন না। আপনাদের মত লোকের কাছে আমরা তাগিদায় আসি না।'

এখানে অমিয় নিজেকে বলল, তা হলে কি গত মাসে আমি ভুল দেখেছি? তা তো নয়। কিন্তু তার নিজেরই গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, 'তা তো বটেই। তা তো বটেই। কি মনে করে বলুন।'

—'কাল আপনার অ্যাকটিং দেখলাম। তিন টাকার টিকিট সাতাইশ টাকা দিয়ে কিনে।'

—'আমাকে বলবেন তো। আপনি কেন টিকিট কাটলেন? এ তো আপনার থিয়েটার।'

—'নিশ্চয়? কিন্তু একটা কথা বলি অমিয়বাবু।'

—'বলুন।'

—'ভেতরে বড্ড গরম। স্টেজে আপনি ঘামছিলেন। রজনী ঘামছিলেন। আর পাবলিকও ঘামছিলো।'

—'তা সত্যি। কিন্তু অনেক টাকার ব্যাপার।'

—'টাকার অসুবিধা হবে না। টাকা আমি দেব। শয় কড়া ষোল টাকা সুদ। আপনি এয়ার কণ্ডিসন করিয়ে নিন। আপনার থিয়েটার ডবল চলবে।'

—'আগেকার টাকাগুলো শোধ করি আগে।'

দুপুরে বিষ্ণুর চিঠি নিয়ে একজন লোক এল। চিঠিখানা ছোট।

বিষ্ণু লিখেছে: 'সোম মঙ্গল বুধ—তিন দিন শো নেই। এই ফাঁকে দুদিকের দেওয়ালে এগঝসট্ পাখা বসিয়ে নাও। সামান্য সিমেন্টের ব্যাপার। আর কয়েকটা পাখা। ঘুরলেই হল। নয়ত এত ভিড়ে বসে লোকের নিঃশ্বাসেই লোক গরম হয়ে উঠছে। স্টেজে তোমাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। পত্রবাহক মল্লিক বাজার থেকে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ভালো জিনিস দেখেশুনে কিনে দিতে পারবে।'

কথাটা মন্দ বলে নি বিষ্ণু। মনে ধরল অমিয়র। চিঠি দিয়ে চণ্ডীদার কাছে লোকটিকে পাঠিয়ে দিল।

যাবার সময় লোকটি বলল, 'কমা দামের জিনিস নেব? না একটু সরেস?'

—'সরেসই নেবেন। বছর দুই তো চলা চাই।'

—'হল মালিকরা কিছু বলবে না তো?'

—'অল্টারেশন, ভালো করার চুক্তি রয়েছে আমাদের সঙ্গে।'

অমিয় মনে মনে বুঝলো, লোকটা ভারি টকেটিভ।

এমন সময় তেতলার দাসদার স্ত্রী এলেন। 'লীলার জন্যে কাজের লোক নিয়ে এসেছি- '

লীলা বেরিয়ে এসে বলল, 'ওমা! তা কেন? ঠিকে কাজ তো করে দিয়ে যায় একজন।'

—'তুই চুপ কর তো। এখন তোর কিছুটা বিশ্রাম দরকার। পায়ের ওপর পা তুলে শুয়ে থাকবি। এতদিন তো করনি।'

এখানে অমিয় বলল, 'আর কটা দিন যাক। এখনো অনেক দেনা বৌদি।'

—'ও আপনার হুস করে শোধ হয়ে যাবে এবারে—'

—'আগে যাক। তারপর বলবেন। দাসদাই বোধহয় দু-একটা রেশনের টাকা এখনো পান।'

'লীলা দিয়ে দিয়েছে।'

বেলা এগারোটা বাজতেই এখন একটা বিশ্রী অবস্থা হয় অমিয়র। ভরত মঞ্চ তাকে অদৃশ্য চুম্বক হয়ে টানতে থাকে। সাজঘর। স্টেজ—স্টেজের সামনেকার সাত সারির লাল গদির সিট। ক্যান্টিন থেকে ফোন করে চা আনা। নির্জন স্টেজে মিউজিক হ্যাণ্ডের সঙ্গে রজনীর গলা মেলানো। ড্রপ। তার কুচি দেওয়া ঝালর। ঝালরের নিচে লম্বা টানা অন্ধকার ছায়া। এ সবই তাকে ডাকে। তখন লীলা স্কুলে। ছেলেমেয়েরাও স্কুলে। নির্জন ফাঁকা বাড়ি থেকে সে তখন পারলে উড়ে গিয়ে সাজঘরে পৌঁছোয়।

এমন কিছু নয়। ধুলো মাখা স্টেজ। পোকা চরে বেড়ানো মেঝে। ঘুপচি মত সাজঘর। তাও বাথরুম অনেক দূরে। তবু যেন কি আছে ওখানে। ফ্লাড লাইটের ভেতরে রঙীন মুখ। মিউজিকের সঙ্গে মায়াজাল।

ওরা কেউই আজ স্কুলে যায়নি। অনেকদিন পরে দুপুরে একসঙ্গে খেতে বসা গেল।

কিন্তু বেলা দেড়টায় আর থাকতে পারল না অমিয়। 'আমি চলি লীলা।'

—'কোথায়? এই তো বললে, সবাইকে নিয়ে আজ দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাবে—'

—'ভরতে যাচ্ছি। চণ্ডীদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার সঙ্গে বাচ্চারা ঘুরে আসুক।'

—'ওরা ওদের বাবার সঙ্গে যাবে। নইলে যাবে না—'

—'তুমি এত অবুঝ কেন বলতো লীলা? আমার কত কাজ থাকে ওখানে জানো? পেণ্ডিং কাজকে আমি বড় ভয় পাই।'

—'ওদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়াও একটা কাজ। তুমি ওদের বাবা। আমার কথা বাদই দাও। আজকাল কত রাতে তুমি ফেরো খেয়াল আছে?'

—'বেশ চল।'

—'না। ওভাবে আমি যাব না। ওষুধ গেলার মুখ নিয়ে তুমি বেরোবে—তাতে কেউ আনন্দ পাবে না। তার চেয়ে আজ তুমি ঘুরে এস। অন্যদিন যাব।'

—'এই বল যাবে। এই বল যাবে না। তুমি যে কি বল আমি বুঝি না। আজ তো সময় ছিল। ঘুরে আসি না—'

—'না।'

একটা কাটা সুর মাথার মধ্যে নিয়ে অমিয় সাজঘরের ইজিচেয়ারে এসে ধপাস করে শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণের ভেতরে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল অমিয়। ঘুম যখন

ভাঙলো—তখন, তিনটি নতুন জিনিস চোখে পড়ল। ঘুমোনোর সময় এরা কেউ সামনে ছিল না।

এক নম্বর হল, রজনী। সে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে কথা বলছে। এই ভদ্রলোক তাহলে দু নম্বর। আর তার ঠিক উল্টোদিক থেকে একটি দাঁড়ানো পাখা তাকে প্রবল বেগে হাওয়া করে যাচ্ছে। একদম নতুন। এটি কোন-দিনই এখানে ছিল না।

রজনী কোন বিস্ময় নয়। কিন্তু এই ভদ্রলোক এবং পাখা? এদের কোনদিন আগে দেখেনি অমিয়। কিন্তু সে-ভুল ভাঙিয়ে দিল রজনী। শ্রীরাম ট্রাস্ট থেকে এসেছেন ইনি।

রজনীর কথায় তড়াক করে উঠে বসল অমিয়। নামটা মনে পড়ছে না। আরে! এই ভদ্রলোকের সঙ্গেই তো দুর্গালালের গদিতে আলাপ হল। শেষে ফুল পেমেণ্ট দিয়ে ছ'মাসের চুক্তি। ভদ্রলোকরা স্টাফের মাইনে দিতে পারছিলেন না বলে দুর্গালালের কাছে ধার করতে এসেছিলেন। তখন দুর্গালালই ওদের ভজিয়ে দেয় তার কাছে। আঃ! কি যেন নামটা?

—'বলুন?'

—'ভালোই তো করে নিয়েছেন হলটা। দেখে ভাল লাগল।'

—'হ্যাঁ। খরচ করতে হয়েছে।'

—'এগজস্ট্ পাখা বসাচ্ছেন। দেখলাম মিস্ত্রীরা পাখা নিয়ে এসেছে। ভালোই হল আমাদের হলের।' তারপর থেমে বললেন, 'অ্যাটর্নি বাড়ি যাচ্ছিলুম। ভাবলুম ঘুরে যাই একবার। কেমন আছেন দেখি। তা ভালোই আছেন—'

কি জবাব দেবে অমিয়। হাসলো।

—'তখন টাকার দরকার ছিল। তাড়া-হুড়োয় এগ্রিমেণ্ট হয়ে গেল। নয়ত ভাড়া বলতে তো কিছুই দিচ্ছেন না আপনি। অন্তত প্রফিটের দিক থেকে—'

—'লাভ কোথায় দেখলেন। এখন পর্যন্ত চল্লিশ হাজারের ওপর লোন রয়েছে। আরও খুচখাচ তো অনেক রয়েছে।'

—'আপনার নাটক তো লেগে গেছে। ওসব ধার তো হুস করে শোধ হয়ে যাবে। এবার ভাড়াটা বাড়িয়ে দিন।'

—'ছ'মাসের এগ্রিমেণ্ট। দু'মাসও তো যায়নি।'

—'আমাদের এটা একটা ট্রাস্ট। হল ভাড়া ইত্যাদিতেই তো চলে। আপনার লাভের দিকটা ভেবে নিয়ে তবে আমাদের কথাটা চিন্তা করুন।

অমিয় বুঝলো, ভদ্রলোক চাপ দিতে চাইছেন। তবু চুপ করে থাকলো।

—'আর কী নাটক আপনি করছেন এখানে ?'

—'কেন ?'

—'ট্রাস্ট মেমবাররা কেউ কেউ বলছেন অশ্লীল।'

—'তাঁরা দেখেছেন ?'

—'তা জানি না।'

—'ট্রাস্টের সবাইকে আমার নেমন্তন্ন রইল। তাঁরা এসে দেখে যান। তারপর বলুন।'

বিকেল হয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক চলে গেলেন। রজনী কয়েকটা ফুলের টব এনে তাতে দোপাটির চারা বসিয়েছিল। বর্ষার জল পেয়ে সেগুলোতে এখন ফুল। নানা রংয়ের। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়েই তা দেখতে পাচ্ছিল অমিয়। একটা টবে চণ্ডীদা লঙ্কার চারা দিয়েছিল। সে চারা এখন ঝাঁকালো মস্ত গাছ হয়ে উঠেছে। চায়ের পাতা আর লিকর গোড়ায় দেওয়ায় গাছটা ঘন কালো হয়ে উঠেছে। ফুল এসেছে। এবার লঙ্কা আসবে।

—'একটা কথা বলি অমিয়। বাইরে কল শোয়ে তোমার অপত্তি আছে ?'

—'টাকা পয়সা নিয়ে ঝামেলা হয়। বলে এক—দেয় আরেক।'

—'তা কেন ? অ্যাডভান্স নিয়ে কাজ হবে। তাহলে গ্রুপের লোন টাগগিরি শোধ হয়ে যাবে।'

—'পার্টি এলে তো!'

—'এসে বসে আছে।'

—'অ্যাঁ ?'

—'হ্যাঁ। তুমি ঘুমোচ্ছিলে দেখে আমি বসিয়ে রেখেছি। এবার কথা বল।'

—'কিন্তু কত বলব ?'

—'যাতায়াত খরচ সব ধরে—তুমি যা ভাল বোঝ। ওঁরা কোলাঘাট থেকে এসে বসে আছেন তোমার জন্যে। ওঁদের ওখানকার এক ডাক্তারবাবু আমাদের নাটক দেখে গিয়ে ভীষণ প্রশংসা করেছেন। তাই শুনে ওঁরা এসেছেন। একটু কম করে দিও—'

—'দরই তো এখনো মাথায় আসেনি। ভাল কথা। পাখাটা কোত্থেকে এল ?'

—'সেকথা পরে বলছি। ওদের সঙ্গে আগে কথা বলে এস।'

গ্রিনরুমে ঢুকতেই দরজার পাশে দু'জন ভদ্রলোক ভাড়ার টিনের চেয়ারে বসে আছেন। একজনের হাতে ফাইল, কাগজপত্র।

অমিয় যেতেই বলল, 'আপনি তিন হাজারের বেশি চাইবেন না। আমাদের স্কুল বিল্ডিংয়ের জন্যে চ্যারিটি। একদম রূপনারায়ণের তীরে—

অমিয় বুঝতে পারল না—রূপনারায়ণের তীরে স্কুল? না রূপনারায়ণের তীরে স্টেজ করে থিয়েটার হবে? 'কত করে টিকিট করেছেন?'

—'পাঁচ, তিন, দুই।'

—'কত লোক হবে আশা করেন?'

—'তা আমরা মাইক ভাড়া করে চারদিক জানিয়ে দেব। দশ হাজার লোক তো হওয়া চাই। আমাদের ওদিককার লোকজন যাত্রা থিয়েটার দেখতে ভালোই বাসে—'

—'তাহলে ওটা চার হাজার করুন। আর যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়ার খরচ আপনাদের।'

—'মরে যাব স্যার। আমাদের দিক একটু বিবেচনা করুন না। আমরা জানি আপনার নাটক কোলাঘাট জয় করে ফিরবে। ডাক্তারবাবু আমাদের বলেছেন। উনি আমাদের স্কুলের সেকরেটারি।'

অমিয় টের পাচ্ছিল তার ভেতরে একটা প্রতিশোধ জেগে উঠছে। কতদিন ফাঁকা চেয়ারের সামনে বাতি জ্বালিয়ে নাটক করে এসেছে। এখন তার শোধ তুলবে। সুদে আসলে তুলে নেবে। তাকে দেখতে এখন এক্সট্রা চেয়ার দিতে হবে। চাপা গলায় বলল, 'ওই টাকার এক পয়সা কম নয়। পুরোটা আগাম দেবেন। চেক নেওয়া হয় না। বুঝতেই পারছেন—ভরত হলের বাইরে এই আমাদের প্রথম মফঃস্বল শো। একথা আপনাদের পাবলিসিটিতে দিতে পারেন।'

এতটা আশা করেনি অমিয়। ফাইল হাতে ভদ্রলোক নগদ চল্লিশখানা একশো টাকার নোট গুণে দিলেন। যাতায়াতের জন্যে অ্যাডভান্স আরও তিনখানা একশো টাকার নোট। রসিদ নিয়ে উঠবার সময় বললেন, 'আমরা সন্ধ্যে থেকেই শুরু করব। যাতায়াত খাওয়া-দাওয়া আর যা খরচ হয় পাবেন। আপনারা বেলা তিনটের ট্রেন ধরলেই সবচেয়ে ভাল হয়।'

অমিয়র বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওদের শুধু যাবার অপেক্ষা। পাশেই পর্দার ওপাশে রজনী তার থার্ড সিনের জরি পাড় শাড়িতে লাইন দিয়ে পুঁতি বসাচ্ছে। চণ্ডীদা এগারসট্ট পাখার মিস্ত্রীদের সঙ্গে ধুকধুকেম ওদিকে রয়েছে। শংকর এখনো

আসেনি। রোগা হবার জন্যে নিশ্চয় বাড়ি থেকে হেঁটে আসছে। কল্যাণী এল বলে। লীলা স্কুলে যায়নি। ফোন থাকলে করে জানাতো।

ওরা চলে যেতেই অমিয় প্রায় লাফিয়ে রজনীর কাছে এল। এসেই আলতো করে ওর মাথার ঘ্রাণ নিল। 'কি হল বলতো?'

—'সব শুনেছি এখান থেকে। আবেক হাজার চাইলে পারতে—'

—'হয়ত দিতে পারতো না।'

—'পারতো। ওদের নোট গোনা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। পকেটে আরও অন্তত দু' হাজার টাকা নিয়ে এসেছিল ওবা। আমি সিওর।'

—'আশ্চর্য কাণ্ড। তাই না?'

—'মোটেই না। এ বকমই তো হয়। তাইতো হওয়ার কথা।'

—'এতদিন কিন্তু হয়নি। নাও টাকাটা রাখো। চণ্ডীদা এলে দিয়ে দিও।'

—'সব দেব না। এর থেকে এই পাখাটাব দাম ক্লিয়ার করব।'

—'টাকা আসতেই ভীষণ খরচে হয়ে উঠেছো তুমি।'

—'এটা কাজের খরচ। ঘামতে ঘামতে মেকআপ নিতে ভাল লাগে তোমার?'

পাখার হাওয়া ভালই লাগছিল। মনে মনে বলল, থিয়েটাবেব বায়নার টাকায় পাখা। ফাইন! রজনীকে বলল, 'বাসের জোগাড় দেখতে হয়। শংকর আসুক। সোমবার কোলাঘাট।'

—'শুধু বাসে হবে না। একটা গাড়িও ভাড়া নিতে হবে।'

—'না না। বাসে লাইট, সেট যাবে। সমব ওরাও চলে যেতে পারে। আমরা সবাই ট্রেনে।'

ঝাঁজিয়ে উঠল রজনী। 'অতটা পথ ওভাবে ঠেঙিয়ে গিয়ে গলায় কারও স্বর আসবে না। আমি তো গাইতে পাবব না।'

—এতটা পথ প্রাইভেট মোটর তো অনেক ভাড়া নিয়ে নেবে। সে-টাকায় একটা লাইট হয়ে যাবে। একটা টেপ রেকর্ডার পেয়েছিলাম—'

—'কিনে নাও।'

—'কিনবো?'

—'হ্যাঁ। এতো তোমার টাকা। মানে গ্রুপের টাকা। গ্রুপের কাজে দরকার পড়লে কিনবে না?'

—'তুমি তো বেশ ডিশিসন নাও।'

—'আমরা মেয়েরা পারি।'

—'আমার ব্যাপারে কোন কিছু ঠিক করেছো।'

—'কি ঠিক করব অমিয় ?'

—'আমি তোমার কে ?'

—'কেউ না।'

—'সত্যি ?'

—'হ্যাঁ। আমাদের বোজ এক জায়গায় দেখা হয়। তার নাম থিয়েটার। কখনো স্টেজে। কখনো গ্রিনরুমে। ব্যস, তারপর তুমি তোমার। আমি আমার।' কি মনে করে রজনী অন্য কথায় চলে গেল। 'এখানকার দেওয়ালটা ভেঙে পিছিয়ে দিতে হবে। ওপাশে তো জমি আছে—'

—'তারপর ! ট্রাস্টেব লোক এসে আমাদেব তুলে দিক। তাই চাও তুমি ?'

—'আমরা তো কোন ক্ষতি করছি না। বরং ভালো করে দিচ্ছি। দেওয়াল সবিয়ে মাথার ওপর অ্যাসবেসটস দিলে অনেকটা জায়গা হবে সাজঘরে। দুটো বাথরুম দরকার।'

—'তাহলে ট্রাস্ট ঠিক আমাদের তুলে দেবে দেখো।'

—'ওরা কিছুতেই তুলবে না। ওদের টাকার বড় দরকার। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছি !'

গিয়াসুদ্দিন এসে পড়াতে আর কথা হল না। রজনী খবর দিয়েছিল। সুজাতার দুটো নতুন ব্লাউজ বানাতে হবে। ছোট মাপের ঘটিহাতা। আভার জন্যে চাই ফুল স্লিভের জামা। জীবনের একটা নীলচে পাঞ্জাবি।

অমিয় বলল, 'বেশতো চলে যাচ্ছিল। আবার কেন ?'

রজনী শুনলো না। গিয়াসুদ্দিন ফিতে ফেলে অমিয়র মাপ নিল।

দু'ধারের দেওয়াল কেটে তিনদিনের ভেতর এগঝসট্ ফ্যান বসে গেল বারোটা। বৃহস্পতিবারের ইভনিং শোয়ের পর রজনী বলল, 'আর কোন রকম বিজ্ঞাপন দিও না অমিয়। টেনশান থাকে। তার চেয়ে বিনা বিজ্ঞাপনেই আমাদের এখন হাউস ফুল যাবে। যারা দেখে যাচ্ছে—তারাই গিয়ে ছড়াচ্ছে।'

চীনে খাবার এসেছে। অনেকদিন পর বোঁদে আর মুড়ির বদলে চীনে খাবার দেখে গ্রুপের সবার মুখে হাসি। সমর পকেট থেকে সট করে একখানা ডাক্তারের প্রেসক্রপসন বের করে বলল, 'ওষুধ লাগবে দাদা।'

রজনী বলল, 'কত ?'

—'ষোল টাকা পঞ্চাশ পয়সা।'

অমিয় বলল, 'চণ্ডীদার কাছ থেকে ভাউচার সই করে নিয়ে নাও। এখন থেকে গ্রুপের সবাই মেডিকাল বিলের পয়সা পাবে।'

শংকর খেতে খেতে হেসে বলল, 'আমি দাদা হাওয়া বদলাতে যাব। বিল দেব?'

রজনী বলল, 'তোর আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। যা মুটিয়েছিস।'

অমিয় বলল, 'আজ বিষ্ণু এলে খুব ভাল লাগতো।'

—'কেন? বিষ্ণুবাবু কি মারা গেছেন? অমনভাবে বোলছো! সময় হলেই আসবেন তিনি।'

খেতে খেতে রাত প্রায় এগারোটা। এমন সময় ফোন এল। ফোনটা ধরেছিল রজনী। 'তোমার ফোন অমিয়। বাড়ি থেকে। লীলা ডাকছেন বোধহয়।'

—'হ্যালো।'

—'তোমার শো ভাঙলো?'

—'অনেকক্ষণ। এই যাচ্ছি।'

—'এখুনি এসো।'

—'যাচ্ছি' বলতে বলতে অমিয় রজনীর মুখ দেখলো। ফোন রেখে দিয়ে হেসে বলল, 'হিসেব মেলানোর তো কিছু নেই। হাউস ফুল। আর দশ টাকার রোয়ে একাশিখানা একস্ট্রা চেয়ার। এই তো মোট। রজনী ও তুমি দেখে রেখো। নয়ত কাল দেখবো আমি। বাড়িতে যে কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। যেতে হবে এখুনি।'

—'উঁহু। তা হয় কি করে? এভাবেই কিন্তু থিয়েটার উঠে যায়। তুমি 'পঞ্চমুখে'র চেয়ারম্যান। তোমার নাটক। তোমার ডিরেকশন। তোমার টাকা পয়সার হিসেব বুঝে নিয়ে তবে বাড়ি যাও।'

—'রেখে দাও। কাল দুপুরে দেখবো।'

—'তখন অন্য কোন কাজে আটকে যেতে পারো। হিসেবটা দেখে যাও।'

—'লীলা কোনদিন এরকম করে না। আমি চললাম।' বেরোবার সময় অমিয় দেখলো, রজনী তখনো বুকিংয়ের খাতা আর কাটা টিকিটের কাউণ্টারফয়েল বই-গুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

দোর খোলাই ছিল। লীলা হাতমেশিনে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ফ্রকের কুঁচি সেলাই দিচ্ছিল। ঘুমন্ত নির্জন বাড়িতে লীলাকেও সেলাই কলের পাশে আরেকটা মেশিনের মত দেখাচ্ছিল। লাল ব্লাউজ। বাসন্তী রঙের শাড়ি। কালো খোঁপা ভেঙে পড়েছে কাঁধে। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। বাঁ হাত নন-স্টপ মেশিন চালাচ্ছে। ডান হাত ছুঁচের চারধার থেকে ফ্রকের নতুন কুঁচি এগিয়ে নিচ্ছে, পিছিয়ে দিচ্ছে।

—'এসেছো।'

—'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

—'তুমি এত দেরি করছিলে। তাই দাশদার ঘর থেকে গিয়ে একটা ফোন করলাম। আমাদের ফোন কবে আসবে গো?'

—'ও ওয়াই টি স্কীমে তো টাকা জমা দিয়েছি। শীগগিরি দিয়ে যাবে। কিন্তু ডাকলে কেন?'

—'এগারোটা বেজে যাচ্ছে—ডাকবো না? কেন? কাজের ক্ষতি হল?'

—'নাটক করতে আমার এমন দেরি হয়ই।'

—'নাটক তো সেই ন'টায় শেষ হয়েছে। আমরা বেরিয়ে ট্রাম ধরলাম ন'টা কুড়িতে।'

—'তোমরা? কে কে?'

—'স্কুলের আমরা ষোলজন একসঙ্গে দেখলাম।'

—'আমায় বলোনি তো। পাশ নেবে বলেছিলে—'

—'বড় দিদিমণি বললেন, আয় সবাই আমরা চাঁদা করে দেখি।' আরও কিছু বলতো লীলা। ঠিক এই সময় বড়দিদিমণির আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। শো ভাঙার পর ট্রামে ওঠার আগে বললেন, লীলা তোর স্বামীকে এ ভাবে ছেড়ে দিসনে। তাহলে আর পাবিনে—

ট্রামের জানলায় বসে এ-কথাটাই তার কানে বাজছিল। তাহলে আর পাবিনে। আর পাবিনে। তখন নাটকের প্রতিটি সিন তার চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছিল। অভিনয় হল গিয়ে অভিনয়। ও কি বাড়াবাড়ি। থিয়েটারে কি মেয়েরা এতটা জড়াজড়ি করে। এর কতটুকু অভিনয়। কতটুকুই বা আসল।

ছেলে প্রথমে খেয়ে ঘুমোলো। তারপর মেয়েরা। এবার থেকে ঠিক করেছে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো করবে। পাঁচালীর বইখানা ধুলো ঝেড়ে বের করেছে। ফাঁকা বাড়িতে বড়দিদিমণির কথাটা বারবার ভেসে আসছিল। তাহলে আর পাবিনে। আর পাবিনে—

থাকতে না পেরে ফোন করে ফেলেছে অমিয়কে। অমিয়ও কিছুটা অপরাধী ছিল। আজ ওদের সবাইকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাবে ভেবেছিল। যাওয়া হয় নি।

—'ডেকেছিলে কেন? কোন কাজ ছিল?'

—'বাঃ! তুমি আমার স্বামী—তোমায় ডাকবো না। জানি শো শেষ হয়ে গেছে।' হঠাৎ লীলা বলল, 'আজ তুমি দারুণ অভিনয় করেছো। দারুণ দেখাচ্ছিল তোমায়। এক এক সময়—জানো আমার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠছিল তোমায় দেখে।'

—'কেন?'

—'আমরা দিদিমণিরা সবাই বসে আছি এক রোয়ে। সুশীলাদির বিয়েই হয়নি। আর তো হবেও না। রেণুর স্বামী আর আসে না। দিদিমণিদের অনেকের ভাগ্যই তো তুমি জানো—ভাবছিলাম—আমার কি এত সুখ সইবে? ভয়ে—কি আনন্দে জানি না—বুকের ঠিক এখানটায় একটা ব্যথা টনটন করে উঠলো।'

দু'হাত দিয়ে শক্ত করে লীলাকে ধরল অমিয়। 'আমায় ডেকেছিলে কেন? বল? বলতেই হবে তোমাকে।'

কোন একটা সুখের ভেতরে লীলা এতক্ষণ ছিল। ঝাঁকুনিতে তার ভেতর থেকে এক ঝটকায় বেরিয়ে এল।

—'কেন? তোমার কোন কাজের ক্ষতি হল? মিসেস দত্ত চলে গেছেন?'

—'না। আছেন। হিসেব তোলা বাকি ছিল।'

—'তোমরা রাতের বেলা হিসেব কর কেন? পরদিন করলে পার।'

—'টাটকা টাটকা না করলে জমে যায়।'

—'তোমার হিরোইন জমা কাজ তুলে দেয় বুঝি।'

—'একবার মিসেস দত্ত বলছো। একবার হিরোইন। ওর একটা নাম আছে।'

—'জানি, রজনী। থিয়েটারে তুমি সুজাতা, সুজাতাবাণী বলে ডাকো।'

—'সে তো নাটকের নাম।'

—'আহা! নাটকে তো আরও কত কি কর। আমি কি কিছু বলেছি? ওসব তো অভিনয় মাত্র! তাই না?'

—'এতদিন তো বলোনি। যাগ্‌গিয়ে। ডেকেছো কেন বল? বলতেই হবে তোমাকে—'

—'এখনো কি বলা হয়নি আমার?'

অমিয় নিজের গলার গর্জন শুনতে পেয়ে লজ্জা পেয়ে গেল। তখন ঠাণ্ডা গলায় নিরুত্তাপ লীলা কথা বলছিল।

—'তাহলে শোন লীলা। আমি বলি। আমাদের নাটকের সাকসেসের কেন্দ্রে রজনী। একথা আমিও জানি। তুমিও জান। তুমি নিশ্চয় অনেক করেছো আমার জন্যে—'

—'কিচ্ছু করিনি।'

—'করেছো। আমার জন্যে। নাটকের জন্যে কোনদিন করোনি। কী হলে আমার ভেতরকার আমি পুরোপুরি জেগে উঠে নিজেকে নাটকে দিতে পারি—তা তুমি জানো না। তোমার দোষও নেই কোন।'

লীলার চোখ সরু হয়ে এল। ঠিকই করে রেখেছে—কিছুতেই কাঁদবে না। কিন্তু এখন হাত না ওঠালে যে বাঁদিকের গালে দু'এক ফোঁটা খসে পড়তে পারে। আস্তে ভিজে গলায় লীলা বলল, 'জানি। রজনী তা জানে। তুমি তো ওসব কোন-দিন শেখাওনি আমাকে—'

—'যার যা ভূমিকা! এতো কিছু করার নেই লীলা।'

—'আমাদের বিয়ের পর এই আঠারো বছরে তোমার একুশখানা নাটকে আমি কিছুই দিতে পারিনি।'

—'অনেক দিয়েছো। গায়ে আর গয়না নেই তোমার। কো-অপারেটিভের শেষ টাকাটা তুলে দিয়েছো। আমি তোমাকে ফেরত দিতে শুরু করেছি।' এখানে নিজেকে কারেক্ট করে নিল অমিয়। 'অবশ্য তোমার জিনিসও ফেরত আসলে দেওয়া যায় না। কী কষ্টে সংসার চালিয়ে তুমি টাকা জুগিয়েছো আমি জানি। তবু যা পারি দিয়ে চলেছি। তোমার ঋণ কোনদিনই শোধ হবার নয় জানি—'

—'আমি কিছুই দিইনি।'

—'যার যা ভূমিকা! এ তো পাল্টানো যায় না লীলা। রোল অদল-বদল করে রিহার্সেল দিলে সামান্য ইমপ্রুভ করতে পারে হয়ত। শুনতে নিষ্ঠুর—কিন্তু সব কথাই সত্যি। দরজা ভেজিয়ে রেখো। আমি যাব আর আসব।'

—'কোথায়?'

—'হাউসে যাচ্ছি। রজনীর হিসেব মেলানো বাকি। কোথাও চলে টলে গিয়ে একটা সিন করো না যেন—'

—'কোথায় আর যাব! কাল সকালে তো স্কুল।'

॥ বারো ॥

নিশ্চয় একথা বলার দরকার নেই যে সে-রাতে হাউসে গিয়ে রজনীর সঙ্গে অমিয়র দেখা হয়নি। ফেরার জন্যে ট্যাক্সি, ট্রাম, বাস কোনোটাই না পেয়ে বিখ্যাত অভিনেতা অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীদার ডেকে দেওয়া একটি টানা রিকশায় চড়ে চার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে রাত দু'টোয় বাড়ি ফেরে। সামনের ভেজানো দরজা বাতাসে খুলে গিয়ে হা-হা করছিল। সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে। লীলা সোফায় ঘুমিয়ে। সেলাই-কল তোলা হয়নি। অমিয় আলগোছে ঘুমন্ত লীলাকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। তারপর নিজে পাশে শুয়ে পড়ে। তখন পাশ ফিরে শোয়ার ভঙ্গীতে লীলা অমিয়র গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল। অজান্তেই।

সে-রাতেই অমিয় ঘুমের ভেতরে কিংবা জাগন্ত অবস্থায় ঠিক করেছিল—একটা গাড়ি কিনবো। বোধহয় অত রাতে অতখানি রিকশায় চড়বার পর এরকম ভাবনা এসেছিল তার মনে।

এখন ডিসেম্বর মাস। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে—শত রজনী অতিক্রান্ত। হাউস ফুল এখন নিত্য ব্যাপার। একশো আট কি নয় রজনী যাচ্ছে। বাইরে কোলাঘাটের কল শোয়ের পর খয়রাশোল, ক্যানিং, চাঁপাডাঙা—সব নাম মনেও নেই—অন্তত বিশ জায়গায় প্লে করে এসেছে 'পঙ্কমুখ'। গ্রিনরুমের দেওয়াল পেছনে প্রায় দশ ফুটের মত সরে যাওয়ায়—ওপরে অ্যাসবেসটসের ছাদ নিয়ে এখন প্রমাণ সাইজের তিনটি বেডরুমের সমান। ক্যানিংয়ের কল-শোয়ের পর ফ্রিজ এসেছে সাজঘরে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা পাখা। মেকআপের জন্যে আলাদা আয়না। ক্যান্টিনের ফ্রিজে এখন তিন রকমের আইসক্রিম থাকে। দুর্গা-লালের টাকা শোধ। আফগান ব্রাদার্সও শোধ। ড্রেসের জন্যে বেঙ্গল ব্রাদার্সে কিছু বাকি আছে এখনো। কল শোয়ের দর উঠেছে সাত হাজার। যাতায়াত খাওয়া-দাওয়া আলাদা। অগ্রবাল বাস সিণ্ডিকেট সব সময় অমিয়র ডাকের জন্যে বাস নিয়ে রেডি থাকে।

শনিবার ডবল শোয়ের ঘণ্টা দু'য়েক আগে এক অপেরার অধিকারী এসে হাজির। রজনীর শরীরটা খারাপ। ঘুমোচ্ছিল। পাছে কথাবার্তায় ঘুম ভেঙে যায়

—তাই অমিয় অধিকারী-মশাইকে নিয়ে ফাঁকা স্টেজে উঠে এল। ড্রপ তোলা রয়েছে সামনে ফাঁকা অডিটোরিয়াম। দু'জনে দু'খানি চেয়ারে বসল।

—'কত সিট ?'

—পাঁচশোর কাছাকাছি। একস্ট্রা দিয়ে প্রায় ছ'শো হয়।' অমিয় দেখলো অধিকারী মশায়ের পাম্প-সু চিকচিক করছে।

—'এত ছোট জায়গায় আপনার মত আর্টিস্টের আটকে থাকার কথা নয়। আপনার দিকে সারা বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে।'

অমিয় মনে মনে বলল, ওরে বাবাঃ! সে কি কথা ? মুখে শুধু হাসি ফুটিয়ে রাখলো।

—'আপনি রয়েল অপেরায় আসুন।'

—'চা খাবেন ?'

—'না আপনি এসে জয়েন করুন। বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়ালটি। গাছাড়া মাস মাইনে। সে আপনি যা ঠিক করবেন—'

অমিয় হেসে ফেলল, 'আমার মাইনে আমি ঠিক করব!'

—'হ্যাঁ। আপনিই করুন। চাঁপাডাঙায় আপনার শো আমি ভিড়ের ভেতর বসে দেখেছি। বাঙালী আপনাকে চায়।'

অধিকারী মশায়ের গোঁফ, হাসি, চাদর সব মিলিয়ে বাংলাদেশ, বাঙালী ইত্যাদি ডায়ালগের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছিল। অমিয় এবার বলল, 'তবে ঠাণ্ডা কিছু বলি।'

—'আপনি কথা না দিলে আমি এখন কিছু মুখে দেব না।'

—'সে কি করে হয়! আপনি এসেছেন নিজে—'

—'আপনার কথা পেলে তবে বসব।'

—'ভেবে দেখি। এ নাটক তো মোটে হাণ্ড্রেড নাইট পার হল—'

নানারকম কথার পর অধিকারী মশায় উঠলেন পৌনে দু'টোয়। বেলা একটার ভেতরেই ডবল শো হাউস ফুল হয়ে গেছে। দু'টোর সময় রজনী বলল, 'একবার সুনীল সেনকে ডাকবে। ডকটর সেন আমার বুক দেখেছেন আগে।'

ফোনে সব শুনে ডকটর সেন সন্ধ্যেবেলা চেম্বারে আসতে বললেন। 'এখনকার মত একদম রেস্ট। অন্তত দুদিন।'

অমিয়র কাছে রজনী মুখ দেখাতে পারছিল না। একঘণ্টার ভেতর কোথায় 'সুজাতা' পাওয়া যাবে ? বুকিং থেকে ঘুরে এসে অমিয় বলল, 'লজ্জার কিছু নেই। চল, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই—'

—'শোয়ের কি হবে?'

—'কি আবার হবে। রিফাণ্ড দেওয়া শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণে। অনিবার্য কারণে···নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে এলাম। আজ শো বন্ধ।'

—'ছ' হাজার টাকা রিফাণ্ড?' রজনী বলেই মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগল। সাজঘরে বিশ্রাম, বসাবসির জন্যে একখানা খাট এসেছে মাস খানেক। তাতে রজনী অনেক সময় শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়। এখন তারই কোণে বসে কুণ্ডলী পাকিয়ে কাঁদছে। অমিয় রজনীকে এই অবস্থায় দেখে হেসে ফেলল। 'তুমিই না দু'মাইল ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে কুলপিতে পনের হাজার লোকের সামনে সুজাতা করেছো। এখন তার দাম দিতে হবে না! শরীর তার ওষুধবিষুধ বিশ্রাম কড়ায়-ক্লান্তিতে আদায় করে নেয়।'

রজনী চোখ মুছে তাকালো।

শেষে বলল, 'আমার জন্যে—'

—'যারা তিন-চারগুণ বেশি দিয়ে ব্ল্যাকে টিকিট কিনেছে—তাদের কথা ভাবো তো। তারা তো রিফাণ্ড পাবে টিকিটের শুধু আসল দাম—'

—'খুব রেগে যাবে তাহলে আমাদের ওপর।'

—'কি করা যাবে। চল বাড়ি দিয়ে আসি তোমাকে। গাড়ি বার করতে বলেছি।'

—'তুমি চালাবে?'

—'স্তাখোই না। চাকরি করার সময় অফিসের গাড়ি চালিয়ে শিখেছিলাম ভয় নেই।'

গাড়ি মাস দুইও হয়নি। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কিনে সারিয়ে নিয়েছে। ডিফারেন-সিয়ালের একটা বাসের ডাক উঠতো। রিপেয়ার করে এখন একদম নতুন গাড়ি। কোন আওয়াজ নেই। রজনীকে পাশে বসিয়ে কথা বলতে বলতে দিব্যি গিরিশ পার্কে গাড়ি চালিয়ে চলে এল অমিয়। যেন অনেকদিন চালায়।

—'আমি কথা বলতে পারছি না অমিয়। হাঁফ ধরে যাচ্ছে।'

—'আর কল-শোতে বাইরে যাব না। বিচ্ছিরি খাটুনি।'

রজনী এই প্রথম তার ছেলে, ছোট দুই মেয়ের সামনে অমিয়র হাত ধরে কথা বলল, 'বিকেলে এসো। ডকটর সেনের ওখানে নিয়ে যেও।'

হাউসে ফিরে এসে দেখল—এখনো লোকে লাইন দিয়ে রিফাণ্ড নিচ্ছে বুকিং থেকে। তাকে না পেয়ে বিষ্ণু গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে আসছিল।

স্টিয়ারিংয়ে বসা অমিয়কে দেখে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলো, 'এই যে হিরো! কোন বড় অসুখ নয়তো!'

—'সন্ধ্যেবেলা জানা যাবে।'

—'আমায় একটু গন্ধর্বে পৌঁছে দেবে?'

—'উঠে বোসো।'

বসবার পর গাড়ি উল্টোদিকে যাচ্ছে দেখে বিষ্ণু বলল, 'এ কি হল?'

—'আজ অনেকদিন পরে স্বাধীনতা পেলাম। শনি-রবিবার বিকেল দেখি না কতদিন।'

—'ওই তো নায়ক হবার প্রাইজ। কিছু নিলে কিছু দিতে হয়।'

—'আজ ছ' হাজার টাকা রিফাণ্ড করে আবার স্বাধীনতা ফিরে পেলাম। চল ভি. আই. পি. রোডে যাই।'

—'আমি একটা কাজে এসেছিলাম অমিয়।'

—'আজ কোন কাজের কথা নয়। রোজ শুধু কাজ থাকে দায়িত্ব থাকে। আজ আমাদের ছুটি। একদিন টিকিট বিক্রির জন্যে বুকিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আজ টিকিটের টাকা রিফাণ্ড করতে পেরে কি আনন্দ পেলাম বিষ্ণু তা তোমায় বলতে পারব না।'

—'আমি গন্ধর্ব অফিস থেকে একটা প্রোপোজাল নিয়ে এসেছিলাম।'

—'পরে শুনবো। সল্ট লেক দেখেছো?'

—'না। দেখা হয়নি, কাগজে ছবি দেখেছি।'

—'চলো ঘুরে আসি। কী সুন্দর জায়গা হয়েছে। চওড়া চওড়া রাস্তা। যে-কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের যে-কোন মেঘ পরিষ্কার দেখা যায়। কলকাতার গায়ে—অথচ কলকাতার মত নয়।'

ফাঁকা রাস্তা। স্টিয়ারিং অমিয়র হাতে মসৃণ ডট পেনের মত ব্যবহার করছিল। ফাইন বাতাস জানলা দিয়ে এসে দু'জনের মাথার চুল সরিয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছিল। দু'ধারে নতুন নতুন বাড়ি। স্পিডের কাঁটা আশি ছুঁই-ছুঁই।

—'লীলা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু বেরোলে পার।'

—'হয় না বিষ্ণু। আরেকখানা গাড়ি কিনছি শীগগিরি। গ্যারেজ থেকে নতুন হ'য়ে বেরোবে। লীলা আর ছেলেমেয়েদের স্কুলে দেওয়া-নেওয়া করে হাউসে চলে আসবে গ্রুপের কাজে। ভালো করিনি?'

—'তা তো ভাল। কিন্তু লীলা এসব কীভাবে নিয়েছে?'

খচ করে গাড়ি থামালো অমিয়। সেকটর তিনে জলের ট্যাঙ্ক ঢালাই করছে মিস্ত্রীরা। মিকশ্চার মেশিনের ঘড়ঘড় আওয়াজ সিধে অমিয়র মাথার ভেতরে ঢুকে গেল।

অমিয়র তার পাশে বসা বিষ্ণুকে বলল, 'কী সব?'

—'এই তোমার থিয়েটার। তার সাকসেস? রজনী?'

—'ওঃ! শুনেছি ওর স্কুলের দিদিমণিরা নাকি ওর কাছে প্রায়ই খেতে চায়। আর মুখরোচক গল্প শুনতে চায়। লীলার মন আমি সবটা বুঝি না। বোঝাতে চাইলেও লীলা বুঝবে না। লোকে কী জানে—আমি অনেক সময় রজনীর অ্যাডমায়ারার?—ওকে ভক্তি করি? আবার ওর সঙ্গে স্টেজে কম্পিটিশনে অভিনয় করে বুঝতে পারি—আমার অভিনয়ের সবটুকু ও আমার ভেতর থেকে টেনে বের করে আনছে। এ কাজ ক'জনে পারে! আমি ওর কাছে মাঝে মাঝে শিখি। রজনী আমায় জাগিয়ে তোলে—'

বিষ্ণুর ভয় করতে লাগল। ঈগল নাসা। দীর্ঘ চোখ। ঈষৎ পুরু দু'খানি ঠোঁটের ওপর জীবন চরিত্রের উপযোগী একটি গোঁফ রেখেছে অমিয় ক'মাস। অন্যমনস্ক দৃষ্টি। কোন জুলফি নেই। এখন গাড়ির সাইড উইং দিয়ে বাতাস ঢুকে পড়ে অমিয়র মাথার অবাধ্য দু'একটি চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। চোখের সামনে নতুন জনপদের গা ধরে হিলহিলে কাশবন সেই বাতাসেই দুলছে। বিষ্ণু পরিষ্কার বুঝলো অমিয়র জন্যে মৃত্যু ওৎ পেতে বসে আছে। অমিয়র মুখে এখন স্বয়ং নিয়তি বসে আছে। সে সব জানে। পরিণাম সে আগাম জানে।

কথা ঘোরাবার জন্যে বিষ্ণু বলল, 'রজনীর ব্যাপারটা?'

—'রজনীর কী ব্যাপার?'

—'এই যে বেলা এগারোটা বাজলেই টিফিন ক্যারিয়ারে তোমার জন্যে রান্না করা খাবার নিয়ে এসে বাড়ির একতলার ফুটপাথে এসে দাঁড়ায়—তুমি গাড়ি চালিয়ে এসে ওকে তুলে নিয়ে হাউসে চলে আসো। লীলাও দুপুরের খাবার ড্রাইভার লালুর হাত দিয়ে হাউসে পাঠিয়ে দেয়। তোমরা একসঙ্গে খেতে বস। হিসাব ছাখো। বিজ্ঞাপন প্ল্যান কর। ঘুমিয়ে থাকো একই খাটে দু'জন।'

—'বাঃ! ঘুম পেলে মেঝেতে ঘুমোবো নাকি?'

—'গ্রুপের লোকজন না হয় মানলো। তবু তো ডিসিপ্লিনের প্রবলেম দেখা দিতে পারে। তাছাড়া এসব নিশ্চয় লীলার কানে গেছে—'

—'যাবেই জানতাম। ও আজকাল রজনীর নাম মুখে আনে না। মিসেস দত্ত

কিংবা তোমার হিরোইন—এ সব বলে। কেমন আছে জানতে চায় ক্যাজুয়ালি। আমিও তেমনি জবাব দিই ক্যাজুয়ালি।'

—'তোমার কোন প্রবলেম নেই?'

—'কিসের প্রবলেম?'

—'এই যে তুমি একজন মানুষ। আর দু'জন মানুষকে দুই বেলায় আলাদা করে ভালোবাসা দিতে হয়—মনোযোগ দিতে হয়—আলাদা আলাদা প্রয়োজন মনে রেখে মিশতে হয়। কোন গোলমালে পড় না তাতে?'

—'হাসালে বিষ্ণু! ভালোবাসা কি বেহুলার লোহার ঘর? না তক্তি-কাটা সন্দেশ? আলাদা করা যায়? লীলাকে বলেছিলাম—যার যা ভূমিকা। লীলা মনের কথা আমায় বলেনি। আমি জানি-- রজনী আমার ছেলেমেয়েদের ভালোবাসতে পারে। রজনীর বড় মেয়েকে এবার পুজোয় কাপড় পাঠিয়েছিলাম। কী সুন্দর চিঠি লিখেছে আমায়—'

—'এ সব তো ভেক উত্তর দিচ্ছো অমিয়।'

—'এটাই আমার উত্তর। এ রকম উত্তর আগে কোনদিন শোনোনি বলে ওরকম মনে হচ্ছে।'

—'শীতের দুপুরেই বিকেলের গুঁড়ো মেশানো থাকে। তার খানিকটা বাতাসে ভাসছিল। আলো তাই কালো রংয়ের হয়ে আসছিল। তোমার আর রজনীর সম্পর্কটা কী? রজনীকে ভালোবাসো?'

—'এ ভাবে বলা যায়! তবে রজনীর জন্যে ভাবি। রজনীও ভাবে নিশ্চয়। লাভ ইজ টু প্রোটেকট হার অলওয়েজ। কোন্ একটা বিজ্ঞাপনে একথাটা দেখেছিলাম।'

—'আরেকটু স্পষ্ট করে বলবে?'

—'বলতে পারো আমরা দু'জনে একসঙ্গে আছি। নাটক করি। হিসেব রাখি। কল-শোয়ে যাই। দু'বছর পরে একসঙ্গে নাও থাকতে পারি।'

—'হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে অমিয়। ভালোবাসি অথচ বাসি না।' এখানে বিষ্ণুর মুখ রসিকতায় টইটুম্বুর হয়ে গেল। মুখ স্বাভাবিক হয়ে এলে বলল, 'কিংবা বাসিলেও বাসিতে পারি। সেই গোছের জবাব হয়ে গেল না!'

—'আর জবাব দিতে পারছিনে বিষ্ণু। এই খানিকক্ষণের ফ্রিডম তুমি প্রশ্নোত্তরে মাটি করে দিও না। সন্ধ্যেবেলা রজনীকে নিয়ে ডকটর সেনের ওখানে যাব। তারপর রজনীর ডাবল জোগাড় করতে হবে। আগামী বেস্পতিবারের

মধ্যেই তালিম দিয়ে অন্তত চলে যাওয়া গোছের মত তৈরি করে নিতে হবে। নতুন মেয়ে সন্ধানে আছে?'

—'আমি কি থিয়েটারের ঘটক! আমি তো ক্রিটিক।'

থেমে থাকা গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে দু'হাতে বিষ্ণুর গলা জড়িয়ে ধরে অমিয় শব্দ করে একটা চুমু খেলো।

—'কী হচ্ছে এ সব। ছাড়ো—'

—'তুমি আমাদের একজন খুব বন্ধু। আমাদের কোন বন্ধু নেই। নাটকটা অশ্লীল বলে হুইসপার ক্যামপেন চালানো হচ্ছে। বড় কাগজ বিজ্ঞাপন নিচ্ছে হাজার হাজার টাকায়। লাখখানেক লোকের এ-নাটক দেখা হয়ে গেছে বিষ্ণু। আরও কয়েক লক্ষ লোক দেখবে। কিন্তু বড় কাগজগুলো চোখ বুজে আছে। এক লাইনও রিভিউ করেনি আজও। মজার ব্যাপার চলছে! হয়ত একটা বড় পার্টি দিলে কাজ হত। কিন্তু আমি সে-পথে যাব না বিষ্ণু। আমি ওয়েট করব। আমি দেখবো—না রিভিউ করে কোথায় যায়। এ-নাটক হাজার নাইট চলবে দেখে নিও। হাউস ফুল আমাদের এখন শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাইনের লোকজন এখন না দেখে রটিয়ে বেড়াচ্ছে—সুজাতা? ওরে বাবাঃ! অশ্লীল—ভাবছি চিফ মিনিস্টারকে এনে দেখাবো?'

—'তিনি রায় দিলেও কি ওরা মানবে? যাগ্‌গিয়ে আমি ছোট কাগজের মানুষ। নাটক দেখে তার কথা লিখি। জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে গন্ধর্বের বিনোদন সংখ্যা বেরোবে। আমরা সুজাতার রিভিউ করব। তোমার দিক থেকে কিছু বিজ্ঞাপন চাই। বোঝই তো কাগজের দাম প্রেস, আর্টিস্ট, ব্লক—হাজারো খরচ।'

—'বেশ তো। বসে কথা বলা যাবে। ভি. আই. পি. রোড দিয়ে একটু জোরে চালিয়ে দেখব।'

—'আমি নেমে যাই।'

—'চল না। দশ মিনিট মোটে। উঃ! কতদিন পরে হাউস থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম আজ। ভয় নেই। খুব জোরে চালাব না। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি উঠছে। এখানে জমিও হয়ত পাওয়া যায়। কিন্তু নাটক করলে কেউ কি এতদূর দেখতে আসবে—এখানে হল হলে?'

—'কেন? বেশ তো আছো ভরতে।'

—'না বেশ নেই। ওরা মামলা ঠুকেছে। উচ্ছেদের মামলা।'

—'তাহলে কি হবে ?'

—'হবে আর কি। ওদেরই গণ্ডগোল। চুক্তির মেয়াদ না ফুরোতেই অভাবে পড়ে এক বছরের ভাড়া রসিদ দিয়ে চেকে নিয়েছে।'

—'তাহলে কোনদিনই তো তোমায় তুলতে পারবে না।'

—'উকিল তো তাই বলছে। মামলার নিষ্পত্তি হলেও সবাব আগে আমারই সঙ্গে লিজে আসতে হবে, আমি তো জানুয়ারিতে মিস্ত্রি লাগাচ্ছি। দোতলায় দু'খানা ঘর দরকার। 'পঞ্চমুখে'র অফিস, লাইব্রেরি , গেস্টরুম হবে দোতলায়—'

স্পিডের কাঁটা আশির ওপর থরথর করে কাঁপছিল। কাজি নজরুল ইসলাম অ্যাভেন্যু। শর্টে ভি. আই. পি. রোড। পাশের খালে নৌকো বোঝাই দিয়ে পৌষ ধানের খড় এসেছে গাঁ থেকে। এবার লবিতে উঠবে। মাঝে মাঝে মাঠের মাঝখানে এয়ার-লাইন্‌সের ঢাউস ঢাউস হোর্ডিং।

—'আমি তোমাদের নাটকের কথা লিখব। এ নাটকের ইকোনোমিকস্‌ লোকে জানতে চায়। কেন অশ্লীল নয় সে কথাও লেখা দবকার। দরকার তোমাদের কথা লেখা। রজনী। শংকর এমন কি লীলার কথাও। আসলে তোমাদের মানসিক গঠনটা কেমন তাই পাবলিককে জানাতে চাই। 'গন্ধর্ব' কাগজ প্রতিটি নাটকের দলের দ্বিতীয় ঠিকানা হয়ে উঠুক।'

'মানে বিজ্ঞাপন চাইতো ? দেব। তার চেয়ে বলি কি আমাদের একজন দর্শকের কথা লিখবে ?'

—'যেমন ?'

- 'বুকিংয়ের রবি বলছিল। প্রথম দিন ভদ্রলোক পকেটের মানিব্যাগ বের করে তার ইনসাইড পকেট থেকে একখানা পাকানো টিকিট বের করে হলে ঢুকলেন। চারিদিক তাকিয়ে। কেউ দেখে ফেলল কিনা সেই ভয়। পরের দিন সেই দর্শকই এল। সঙ্গে গিন্নি। রীতিমত বুক ফুলিয়ে হলে ঢুকলেন। মুখে পান। আঙুলে চুন। এই হল গিয়ে আমাদের নাটকের রিভিউ। এরপরেও কি অশ্লীল বললে লোকে বিশ্বাস করবে ?'

এয়ারপোর্টের গায়ে নতুন হোটেল চালু হয়েছে। তার আট-দশ তলায় পটপট করে আলো জ্বলে উঠলো। প্লেন উঠছে। নামছে। ওরা এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে বারাসত যাওয়ার মোড়ে এসে পড়ল। তখন অন্ধকার। পথের পাশের দোকানে আলো জ্বলতে শুরু করেছে। 'এবার ফিরি বিষ্ণু।'

—'অত জোরে চালিয়ো না এখন। আমি হিরো নই। অ্যাকসিডেন্টে মারা

গেলে আমার বউ ষোল বিঘের ধান একা কেটে তোলার ব্যবস্থা করতে পারবে না।'

—'কী ধান দিয়েছো ?'

—'রত্না। কিছু আগে পাকে। বেশ সরু ধান।'

অমিয় আর এগোল না। জানে, ধানের কথা বিষ্ণু এখন রাত দশটা অব্দি বলে যেতে পারে। 'আচ্ছা, ধান আর নাটক—কোনটা তোমার নেশা ?'

—'দুটোই। ওদের দু'জনেরই তোয়াজ চাই। তবে না মাঠ ভরে ফসল দেবে। তুমি আজ ফসল তুলছো না অমিয় ?'

—'কোথায়! দর্শক হলেই যে সেটা একটা আহামরি নাটক—তার কোন মানে নেই। আমায় এখন এ নাটক থেকে বেরিয়ে আসবার পথ নিজেই তৈরি করতে হবে। এত এস্টাব্লিশমেণ্ট বেড়ে গেছে। মোট সাতাশি জনের ফ্যামিলি এই নাটকের চলা-চলির ওপর নির্ভর করে।'

—'বল কি!'

—'হ্যাঁ! নয়তো আমি কোন দিন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তাম। অবিশ্যি এ নাটকে আমাদের এখনো অনেক কিছু করার আছে। ফার্স্ট নাইট থেকে এখন অভিনয় কত পাল্টে গেছে। জীবন চরিত্র তো আমার রোজ স্টেজে নেমে নতুন মনে হয়। আমি রোজ জীবনকে আবিষ্কার করি বিষ্ণু। ডায়ালগ কত পাল্টে যাচ্ছে। ক্যারেকটারের ইণ্টারপ্রিটেশনও রোজ পাল্টাচ্ছে একটু একটু করে। এই তোমার গন্ধর্ব অফিস এসে গেল।'

—'দেরি করলে যে—'

—'কোথায় দেরি। বিষ্ণুকে ছেড়ে এলাম। চেম্বারে ঠিক সময়েই পৌছোবো।'

—'বিষ্ণু এসেছিল।' চুপ করে গেল রজনী। তারপর বলল, 'নিশ্চয় আমায় দায়ী করল। এতগুলো টাকা রিফাণ্ড দিতে হোল। আমরা বড়লোক হয়ে গেছি বলে ঠাট্টা করেছে সিওর। ছ'হাজার টাকা। কম না তো—'

—'তোমার এই গিল্ট কমপ্লেক্স কেন বলতো রজনী ? মানুষের শরীর খারাপ হয় না ? শরীরের চেয়ে ছ'হাজার টাকা বেশি ?'

রজনী কোন জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে গাইতে লাগলো—

'তুমি চাঁদের জোছনা হয়ে থাক সুখে—
কলঙ্ক আমি নেব হাসি মুখে—'

ট্রাফিকের মোড় পেরিয়েই অমিয় বলল, 'এমন বিসর্জনের গান গাইছো কেন? কি হয়েছে—'

রজনী কোন কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে গাইতে থাকল—

'তুমি চাঁদের জোছনা হয়ে থাক সুখে।
—কলঙ্ক আমি নেব হাসি মুখে—'

'জোছনাতে' এসে রজনীর গলা এমন সুন্দর একটা মোড় নেয়। ভারি ভাল লাগে অমিয়র। এই জোছনা কথাটি আখতারির বিখ্যাত গানেও রয়েছে। সেও আর এক রকম। স্টেজে অভিনয়ের সময় রজনীর গলায় জোছনা কথাটি এলে দু-একদিন এক-হল দর্শকের সামনে খানিকক্ষণের জন্যে অমিয় অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। নিয়মিত অভ্যেস বলে ডায়ালগ থেমে থাকে নি তার মুখে।

—'জানো রজনী সুজাতার এই গানের মত তারাশংকরের 'কবিতেও' এমন একটা গান ছিল। ফেইণ্টলি মনে পড়ে—'

—'ছিলোই তো।'

—'বিষ্ণু বলছিল—তোমার আমার সম্পর্কটা কি?' রাস্তায় চোখ রেখে চালাতে হচ্ছিল অমিয়কে। তাই রজনীর মুখে সেই মুহূর্তের ক্ষণিক অদৃশ্য ছায়াটি দেখতে পেল না।

—'তুমি কি বললে?'

—'যা সম্পর্ক তাই বললাম।'

—'কি রকম?'

—'তুমি অভিনয়ের সময় আমাকে জাগিয়ে তুলতে পার। তোমার অভিনয় আমাকে জাগিয়ে দেয়।'

—'আর কিছু না?'

—'আরো কত কি। সব কি বলা যায় রজনী?'

ডকটর সেন রজনীর ই. সি. জি. করলেন আধঘণ্টা ধরে। তারপর গ্রাফ দেখে বললেন, 'কিছু তো পেলাম না। তবে ওভার এগজারসন। সাবধান থাকতে হবে। পুরোপুরি বিশ্রাম চাই। অন্তত মাস খানেকের—'

ওষুধ সামান্যই। একটার নাম পড়ে অমিয় বুঝলো ঘুমের ওষুধ।

ফেরার পথে অমিয় বলল, 'এখন তোমার কাছে শশাঙ্কর থাকা উচিত।'

—'সে তো আসে মাঝে মাঝে।'

—'কি বলে?'

—'আমার সঙ্গে দেখা হয়নি কোনদিন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলেই চলে যায় বোধ হয়।'

—'ওরা তোমায় কিছু বলে নি ?'

—'কোনদিন না। সেটাই আশ্চর্য। আমিও ওদের মা। শুধু অ্যাবসেণ্ট থেকে একটা লোক রোজ কী ভাবে যে ওদের চোখে আমায় কাঠগড়ায় তুলছে—কী বলব। আমি যদি একটু অডিনারি হতাম ! আমার বিরুদ্ধে ওদের চোখে অনেক অভিযোগ দেখি। অথচ ওরা কিছু বলে না। চুপ করে তাকিয়ে থাকে শুধু। এই লোকটাই তৃপ্তির সঙ্গে জোট পাকিয়ে থিয়েটাবের সব হুণ্ডি আমায় দিয়ে সই করিয়েছে। সাজঘরে। যখন আমি ব্যস্ত থাকতাম। হয়ত সেকেণ্ড বেল পড়েছে—এমন সময় হুণ্ডির কাগজ ধরিয়ে দিয়েছে আমার হাতে। তখন স্টেজে ঢুকবো। ঠিক সেই সময়। তখন কি কেউ মাথা ঠাণ্ডা করে সই করতে পারে অমিয় ? আমাকে পথ দেখানোর কেউ ছিল না। আমি মেকআপ নিচ্ছি—এমন সময়ে তৃপ্তি এসে বলেছে—টাকা চাই হাউসের—তিন দিনের ভাড়া বাকি—না হলে শো বন্ধ করে দিতে হবে। সই করো। সই করেছি আমি। জানি না এ সব টাকা শোধ করেছে কিনা। না করে থাকলে কি করে শোধ হবে তাও জানি না। চিন্তায় চিন্তায় আমার ঘুম নেই।'

—'আমায় না হয় একটু ভাবতে দাও রজনী। তৃপ্তির আর কোন ফোন পেয়েছো ?'

—'না তো।'

॥ তেরো ॥

প্রথমেই সব কটা কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগে টেলিফোন করে রজনীর নামটা তুলে দিতে বলা হল। বিজ্ঞাপনের অ্যাড্‌ভান্স কপি থেকে। টেলিফোনগুলো করে শংকর বলল, 'এখন চারদিনের ভেতর সুজাতা পাবে কোথায়? গলায় গান চাই। হাসলে কাঁদলে ভালো দেখানো চাই। হাউসের লাস্ট রো অব্দি গলা পৌঁছনো চাই। তারপর আছে পার্ট মুখস্থ। মিউজিক হ্যাণ্ড আর লাইটের সঙ্গে প্র্যাকটিস—'

সাজঘরে অমিয় গুম হয়ে বসে ছিল। 'তিনজনকে খবর পাঠিয়েছি। দেখি—'

রবিবারের ডবল শোও গেল।

অমিয় চুপ করেই ছিল। অরগান আর তবলার লোক বসে। তিনজন নায়িকাকে তিন সময়ে আসতে বলা হয়েছে। বেলা দুটো। বিকেল পাঁচটা। আর সাতটায়—

প্রথমজন ঠিক দুটোয় এলেন। দু'খানা ছবিতে স্যুটিং চলছে। স্টারে কিছুদিন শনি-রবি-বৃহস্পতিবার—হপ্তায় পাঁচটি করে শো করেছেন। মাথায় অনেক চুল। নাক মুখ চোখ সুন্দর। কিছু মোটা এবং বেঁটে।

গলায় ডায়ালগ উঠলেও গান হচ্ছে না। মধু খাওয়া শেষ—এ গানের শেষে এসে গলা যেখানে ঘুরে যাওয়ার কথা—তা একদম ঘুরছে না। তবলার লোক স্টেজ থেকে উঠে এসে একবার অমিয়কে বলল সে কথা।

অমিয় বলল, 'কি করব? তোর করে নিতে হবে।'

পৌনে পাঁচটা অব্দি ধস্তাধস্তি চলল। শেষে তাকে বলা হল, কাল বেলা এগারোটায় আবার রিহার্সেলে আসবেন। মেয়েটির নাম রমা। হাত তুলে নমস্কার করে রমা চলে গেল।

বেলা পাঁচটায় এল নন্দনা চক্রবর্তী। গানের গলা আছে। ডায়ালগও মন্দ বলে না। কিন্তু মুখের আদলে সে ব্যক্তিত্ব কোথায়? যার ডায়ালগের থ্রোতে অমিয় স্টেজে একটু একটু করে ছোট হয়ে নিভে যাবে। উপরন্তু মেয়েটির পিঠে অতিরিক্ত মাংস। বলল, 'তিন মাস ধরে ও জাপানী হোমিওপ্যাথির বড়ি খাচ্ছে। ডায়েটিং

চালাচ্ছে। ঠিক স্লিম হয়ে যাবে।' অমিয় মনে মনে বুঝলো, একে নিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে।

সন্ধ্যা সাতটায় এলেন মালিনী রায়। চমৎকার হাইট। হাসলে বয়স বেরিয়ে পড়ে। ব্যক্তিত্ব আছে। গানও মন্দ হয় না। কিন্তু ডায়ালগ ডেলিভারির সময় কেমন একটা ঘোড়া ঘোড়া ভাব আসে। অমিয় বলল, 'আপনাকে খবর দেব।'

তিন-চারদিনের মধ্যে নন্দনা কাজচলা-গোছের তৈরি হয়ে গেল। বৃহস্পতি-বারের ইভিনিং শো পার হওয়া গেল। কিন্তু কোথায় সেই দাপট? সিন থেকে সিনে নাটকের ক্লাইমাকস্ যত জমে ওঠে রজনী ততই অভিনয়ে তীক্ষ্ণ ধারালো হয়ে উঠতো। কিন্তু নন্দনা সেখানে পৌঁছতে পারে না। ফলে অমিয়র ভেতরকার অভিনয়ও প্রতিযোগিতার মুখোমুখি না হওয়ায় বেরিয়ে আসতে পারছিল না।

গোটা কুড়ি নাইটের মাথায় নন্দনা বলল, 'আপনি এবার কলশো নিতে পারেন। আমি রেডি!'

অমিয় মনে মনে বলল, নন্দনা চালিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু মাত্র একদিনের নন্দনাকে নিয়ে একটা মুশকিল দেখা দিচ্ছে। আসবে তার স্বামী পরিমলকে নিয়ে। সময় নেই, অসময় নেই—খালি টাকা চায়। দুশো দিন। একশো দিন। তিনশো। দিন। পঞ্চাশ দিন। এ একদম লেগেই আছে। ইরিটেটিং।

দেউলটির কলশোর পর বাড়ি ফিরতেই লীলা বলল, 'ইনকাম ট্যাক্সের লোক এসে ঘুরে গেছেন! আজ বিকেলে হাউসে যাবেন ওঁরা।'

সেকথায় কান না দিয়ে অমিয় বলল, 'রজনীর কোন ফোন এসেছিল?'

—'হ্যাঁ। ওর ছেলে করেছিল। একই রকম আছেন।'

—'একই রকম মানে?'

—'তাতো জানি না।'

—'ফোন এসেছে বাড়িতে। তুমি নিজে তো একটা ফোন করে খবর নিতে পারতে—'

—'কেন? উনি কি অসুস্থ অনেকদিন? কই? আমি তো জানি না।'

—'কাগজের বিজ্ঞাপন গ্যাখোনি? নন্দনার নাম ছাপা হচ্ছে তিন হপ্তা ধরে—'

—'বিশ্বাস কর, আমি দেখিনি।'

—'তোমার স্বামীর থিয়েটার। 'পঙ্কমুখের' নাটক। কাগজটা উল্টে দেখার ইচ্ছে হয়নি তোমার?'

—'কেন! তুমিই তো বলে দিয়েছো—যার যা ভূমিকা! অবশ্য কোনদিনই

আমার কোন ভূমিকা ছিল না। যেটুকুও ছিল কোনদিন, সেটুকু আমি ফাঁকি দিইনি কখনো।'

—'স্বামী হিসাবে আমিও কোন ফাঁকি দিইনি লীলা। এখন নতুন বছর থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো ভালো স্কুলে পড়ছে। তোমাকে বিশ্রাম দিতে লোক রেখেছি। এখন গাড়ি থাকায় তোমাদের আর বাস-ট্রামের ভিড় ভাঙতে হয় না—'

—'স্বামীর এ-ছাড়াও কি কোন কাজ নেই?' বলতে বলতে গরম জলের গামলা এগিয়ে দিল লীলা। অমিয় কলশো থেকে ফিরেই পা ডুবিয়ে শরীর চাঙ্গা করে। বিশেষত শীতকালে। —'তুমি বলবে—আমাদের তুমি সুখে রেখেছো। এর নাম সুখ?'

—'আর কি করব?'

—'আর কিছু করার নেই?'

—'আমার তো থিয়েটারেই সময় চলে যায়।'

—'সবটাই থিয়েটারে? আর এর নাম কি থিয়েটার?'

—'কেন?'

—'নাটক লেগেছে। ভাল হয়েছে। কিন্তু সেখানেই আটকে থাকবে তুমি?'

—'এখন বেরোবার পথ নেই লীলা। এত বড় এসটাবলিশমেণ্ট। নয়ত আমি নতুন নাটকের কথা ভাবছি। কিন্তু ঝুঁকি নিই কি করে? যদি না লাগে; যদি ফেল করে। তাহলে এতগুলো লোক কোথায় যাবে?'

—'একে আর যাই হোক থিয়েটার বলে না। একে বলে সিকিউরিটি। আরাম। নিশ্চিত টাকা।'

—'পাবলিক তো নিচ্ছে।'

—'পাবলিক তো যে কোন জিনিস নেয়। তোমার আর বেরোবার উপায় নেই। দুপুরে দু'বাড়ি থেকে খাবার যায়। দু'জন ড্রাইভার। দু'টি গাড়ি। কলশো ধরলে উইকে সাতটা শো। তুমি এখন চেক কাটতে ভালবাসো। তুমি এখন টাকা আয়ের যন্ত্র মাত্র। নয়ত ফিরে এসেই তোমার যন্ত্রের পার্টস রজনীর খবর নিলে আগে। আমাদের খবর তোমার কাছে খবরই নয় এখন। তুমি নেশায় আছো। ভাবছো আমাদের সুখে রেখেছো। সুখ কাকে বলে?'

—'ভুল কোরো না। এর নাম শো বিজনেস—'

—'হ্যাঁ, বিজনেস ভালো করছো।'

—'তার নিয়ম মেনেই আমাকে এগোতে হয় লীলা। সে জন্যেই রজনীর খবর নিচ্ছিলাম।'

—'তুমি শেষ কবে এ-বাড়ির জন্যে সকালে থলে হাতে বাজারে গেছ বলতে পার?'

—'আমি ও সব পারি না।'

—'তোমার নাটকের নিয়মের মত—শো বিজনেসের নিয়মের মত—সংসারেও এটা একটা নিয়ম। তুমি তোমার ছোট মেয়ের উইকলি পরীক্ষার রিপোর্ট জান? জান না। কারণ এ সংসার এখন আর তোমার কাছে কিছু নয়।'

অমিয় এখানে এগিয়ে এসে লীলার ঠোঁটে ঠোঁট বসিয়ে তাকে নিরস্ত্র করতে চাইল। লীলা মুখ সরিয়ে নিল; অমিয়র মুখের ভেতরটা ফসকানো চুমোটা ফিরে এসে মন তার তেতো করে দিল। 'খেতে দাও। খিদে পেয়েছে—'

স্নান না করেই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল অমিয়। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে দেখল, লীলা স্কুল থেকে ফেরেনি। ছেলেমেয়েরাও ফেবেনি। কাজে' নতুন ছে'লেটি চ' দিল।

হাউসে এসে দেখে ইনকামট্যাক্স-এব লোক বসে আছে। তাদে' স'ঙ্গে বসে 'পঞ্চমুখের' অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট নাতিশ ইনভেনটরি তৈরি ক'রছে। দুটি ফ্রিজ, দুটি গাড়ি, তিন সেট লাইট, একটা পিয়ানো, একটা মাইক, তিনখানা স'ইকে'ল স'·'শিজন কর্মী। এর ভেতর মেকআপম্যান, ড্রেসার, লাইটেব লোক, মিউজি' হ্যাণ্ড সবাই আছে।

গন্ধর্ব থেকে ফোন এল বিষ্ণুর। গন্ধর্ব বিনোদন সংখ্যার মলাটে কা' ছবি যাবে? নন্দনা? না, রজনীর?'

অমিয় বলল, 'রজনীর—'

ওপাশ থেকে বিষ্ণু বলল, কিন্তু এখন তো নন্দনা অভিনয় কবছে। এত টাকার বিজ্ঞাপন। যে অভিনয় করছে না—তার ছবি ছাপা যায় নাকি!'

—'সেও বটে।' মনে মনে হিসেব করে দেখল অমিয় -বিজ্ঞাপন দেখে যারা থিয়েটারে আসবে—তারা তো বিজ্ঞাপনের ছবি মিলিয়ে নেবে মনে মনে। মলাটে রজনীর ছবি দেখে থিয়েটারে যদি নন্দনাকে দেখে—তাহলে এত টাকার বিজ্ঞাপন তো জলে যাবে।

ফোন রেখে দেওয়ার আগে বলল, 'পরে জানাচ্ছি'।

নিজেই চালিয়ে রজনীর ওখানে গেল। গাড়ি লক করে ওপরে উঠবার মুখে সিঁড়িতে, দুর্গালালকে দেখে অবাক হল অমিয়। —'কি ব্যাপার?'

—'কিছু টাকা পাই অমিয়বাবু—'

—'কিসের টাকা?'

—'কবিয়াল থিয়েটারের। রজনী দেবী হুণ্ডিতে সহি করেছেন।'

—'কত টাকা?'

—'অল্প। সে আপনার কাছে খুব বেশি না।'

—'কত?'

—'ঊনসত্তর হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে সুদ নিয়ে।'

অমিয়র মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। দোতলায় উঠবার আগে দুর্গালালকে বলল, 'আপনি হাউসে আসুন না। ভবতে বসে কথা হবে—'

—'সে তো খুব ভাল কথা।'

দোতলায় উঠে রজনীকে পার্কের উল্টো দিকের জানলার সামনে ইজি-চেয়ারে পেল। পুরনো আমলের একটা শাড়ি পরেছে। নীলাম্বরী পাড়ের জায়গায় মুগা সুতোর কাজ। অমিয়কে দেখেই বলল, 'জানো, আমি একটা দামী জিনিস খুঁজে পেয়েছি। আমার মায়ের তিনখানা ডাইরি।'

—'তখনকার কথা লিখে গেছেন—'

—'আশ্চর্য। একদম সে সব কথা লেখেন নি। শুধু টাকার হিসেব। ছাখো—'

তিনখানা ছোট ছোট ডাইরি। অমিয় নেড়ে চেড়ে দেখল। বিভিন্ন পাতায় টাকার হিসেব। আজ দুইশত পাইলাম। আজ পাচশত পাইলাম। রজনী একশত। আমি চারিশত।

—'ছাখো। কত কথাই মা লিখতে পারতেন। লিখেছেন কয়েকটা অঙ্ক শুধু।'

অমিয়র মাথার ভেতর তখন একটা অঙ্কই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। উনসত্তরের পিছনে তিনটে শূন্য। কী করে এত টাকার জালে পড়ল রজনী।

—'ডক্টর সেন বলছেন, আমি এখুনি শো করতে পারি—'

—'আরও কিছুদিন যাক। শশাঙ্ক এসেছিলেন?'

—'একবারও না।' অমিয়র হাতখানি দু'হাতে ধরল রজনী। 'তুমি এখুনি চলে যেও না। জানি তোমার ওপর দিয়ে ধকল যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? নীলা?'

—'ভাল। আচ্ছা তৃপ্তির কোন টেলিফোন পেয়েছো?'

—'নাঃ! তারপর থেকে আর পাইনি।'

—'কলশো কেমন হোল? কত লোক হয়েছিল?'

—'ভাল। হাজার দশেক হবে।'

ঘণ্টাখানেক পরে হাউসে ফিরে এসে অমিয়র মনটা আরও খিঁচড়ে গেল। নন্দনার স্বামী টাকার জন্যে বসে আছে। ভদ্রলোকের সব সময়েই টাকার দরকার। প্রতিবারেই বলবে—এই একটু দরকার। তাছাড়া আরও অনেক রকমের বায়না আছে। যেমন—একটা লাল বুশশার্ট কিনে রাখবেন আমার জন্যে। কিংবা একটা টুকটুকে ডটপেন। একদিন বলেছিল—বিশ্বরূপায় ইভনিং শোয়ের দু'খানা টিকিট কিনে রাখবেন। বুঝে ফেলেছে - চালু, নাটকের হিরোইন অসুস্থ। এখন শো বন্ধ রাখা যাবে না। চালু রাখতে হলে নন্দনাকে চাই-ই। অতএব আমার বায়না মিটিয়ে আমাকেও চালু রাখো।

সাজঘরের বারান্দায় অন্ধকার বেঞ্চে নন্দনার স্বামী বসে ছিল। অমিয় সুইচ টিপলো। লোডশেডিং?

চণ্ডীদা বলল, 'না। লাইট ফোন—দুইয়েরই লাইন কেটে দিয়ে গেছে।'

—'কেন? বিল তো ক্লিয়ার।'

—'আমরা ছিলাম না। ট্রাস্টের লোকজন এসে কেটে দিয়ে গেছে। আবার শাসিয়ে গেছে—ভরত হল ছাড়ো—নয়ত গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। বুকিংয়ের রবিকে বলেছে—'

—'বাঃ! ভাড়া ক্লিয়ার। কোর্টে কেস চলছে। নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি তো আমরা থাকছিই। আবদার নাকি? বলেও অমিয়র মনে হল—এই অন্ধকারে সে একা। পাশে কেউ নেই তার। লীলা দূরে। রজনী আরও দূরে। দুর্গালালের উনসত্তর হাজার টাকা। উচ্ছেদের মামলা। তার শুনানীর দিন উকিলের টাকা রেডি রাখা। দোতলায় তিনখানা নতুন ঘরে প্লাস্টারিংয়ের কাজ হচ্ছে। দুটো গাড়ির পেট্রল। এত জন লোকের মাস গেলে মাইনে। তারপর তার লাইনের লোকজনের সঙ্গে আজ কাল দেখা হলে তারা যে রকম নির্বাক ভঙ্গীতে তাকায়—তার একটাই অর্থ—তোমার হাঁউস ফুল নিত্য ব্যাপার হলেও নাটকটি অশ্লীল। অন্ধকারে নিজেকেই মনে মনে বলল, বেশ আছি!

চণ্ডীদা মোম জ্বালিয়ে নন্দনার স্বামীকে ভাউচারে সই করিয়ে একশো টাকা দিল—তবে সে উঠলো। নন্দনা কোনদিন পুরো মাইনে চোখে দেখতে পাবে না। নন্দনার জন্যে কষ্টও হয়। আবার রাগও হয়। এবার কলশো যাওয়ার পথে গাড়িতে তাকে একটা চিঠি দিয়েছে। খুলে দেখে—তাতে ইনিয়ে বিনিয়ে একটি কথাই লেখা। দাদা—আপনি পেপার পাবলিসিটির ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। আমি নামভূমিকায় অভিনয় করছি—অথচ আমার নামই যাচ্ছে ছোট টাইপে। তা হবে কেন ?

অমিয় চিঠি পড়েই পাশে বসা নন্দনাকে বলেছে, 'এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। সময় হলে সবই হবে।'

চলন্ত গাড়ির জানলার দু'ধার দিয়ে স্লিক স্লিক করে শালবন সরে যাচ্ছিল। সন্ধ্যেবেলা মাঠের ভেতরে শো। নন্দনাকে বোঝায় কী করে—আজ যে তুমি মাস গেলে দেড় দু'হাজার টাকা পাচ্ছো—সে তো রজনীর জন্যেই। রজনী এ নাটক দাঁড় করিয়েছে বলেই তো তুমি আজ দর্শক পাচ্ছো। রজনী অসুস্থ বলেই তার নাম মুছে দিতে হবে ?

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এসে লাইন ঠিক করার পর অমিয় বলল, 'চণ্ডীদা তৃপ্তি কোথায় থাকে বলতো ?'

—'কোন্ তৃপ্তি ?'

—'তৃপ্তি আবার ক'টা !'

—'কবিয়ালের তৃপ্তি। সে তো বি. কে. পালের দোকানের পাশের গলিতে—'

—'আজ আমি বাড়ি গিয়ে এখন ঘুমোই বুঝলে।'

—'কেন ? শরীর খারাপ ?'

—'নাঃ ! কিচ্ছু ভাল লাগছে না।'

—'তুমি একটু ব্রাণ্ডি খাওয়া অভ্যেস কর। চাঙ্গা লাগবে। খাটুনির তো শেষ নেই।'

—'কিছু খাই না—তাতেই রটে গেছে লম্পট। সুজাতা বইএর জীবন এখন আমার ইমেজ বাইরে ! এরপর কিছু খেলে আর রক্ষে থাকবে না চণ্ডীদা। এখনই আমি আউটকাস্ট !

—'সে তোমার সাকসেসের জন্যে—'

—'তুমি তো বেশ সাইকোলজি বোঝ। সব বুঝে জামাকাপড় ইস্ত্রি করে যাচ্ছ।'

—'গ্রুপ রাখতে হবে তো। টিকিয়ে রাখতে না পারলে তো সব ভণ্ডুল। নতুন নাটক তাহলে আর কোনদিন করা যাবে না। আবার গোড়া থেকে শুরু করার শক্তি আর নেই অমিয়।'

—'আমরা সুজাতা এখন তুলে দিলে কেমন হয়। অনেকদিন তো হল।'

—'না। এখনো অনেক রাত হওয়া দরকার। দেখাই যাক না—লোক আমাদের কতদিন নেয়। সেটাও তো একটা পরীক্ষা।'

—'আমরা কি টিকিট সেলের নতুন আবামে ডুবে যাচ্ছি না?'

—'যাচ্ছিলাম। কিন্তু নতুন নাটকও তো তুমি তৈরি করছো।'

—'সম্রাটের কথা বলছো। অনেক ঘষা মাজা বাকি।'

—'সোম মঙ্গল—রিহার্সেল চলুক না।'

—'মন্দ বলনি। চলি চণ্ডীদা।'

বি. কে. পাল এভিনিউর মোড়ে গাড়ি রেখে অমিয় গলিতে ঢুকলো। কলকাতার আদি পাড়া।

জঙ্গল কেটে বসতি যারা করেছিল—তাদের সব বাড়ি। জানলাগুলো যাকে বলে গবাক্ষ। বেঁটে আর চওড়া। বিশ ত্রিশ ইঞ্চি ওয়াল। তৃপ্তির বাড়ি বিশেষ খুঁজতে হল না। একটা ভাঙা দেওয়ালের পাস থেকে শশাঙ্ক বেরিয়ে আসছিল।

দাড়ি রেখেছে। মাথার চুলও বড়। ধুতির ওপর খাকির হাফশার্ট। দেখলে যে কেউ বলবে—পুরনো বাঙালীবাবু। পায়ে লাল কেম্বিশের জুতো। গলির মোড়ের আলো এতদূর আসেনি। দু'জন মুখোমুখি দাঁড়ালো।

—'রজনী আমাকে ঘরে নিয়ে যেতে পাঠায়নি নিশ্চয়।'

—'না। আমি নিজে এসেছি। রজনী জানেও না। তার তো অসুখ। জানেন নিশ্চয়—'

—'জানি ডাক্তার দেখছে।'

—'একবার গিয়ে দেখা দিলে পারেন।'

—'না। তার আর দরকার নেই।'

অমিয় এবার কঠিন হল। 'অসুস্থ স্ত্রীকে অতগুলো ছেলেমেয়েসুদ্ধ দেনার

পাহাড়ে ডুবিয়ে রেখেছেন। তারপর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না আপনার ?'

—'আপনি তো আছেন।'

—'হ্যাঁ। আমি আছি। আমি পালাই না। কিন্তু অতগুলো টাকা কী করলেন আপনারা ? কিসে ওড়ালেন ? আপনি তো মদ-ভাং খান না। মেয়েমানুষেরও দোষ নেই। তাহলে টাকাগুলো গেল কোথায় শশাঙ্কবাবু ?'

—'আপনি হিসেব চাওয়ার কে ? কৈফিয়ৎ চাওয়ার কে ?'

—'কেউ না। কিন্তু আমি আপনার স্ত্রীকে দেখাশুনো করি। ডাক্তার ডাকি।'

—'ওঃ ! রজনীর বিনে মাইনের কর্মচারী !'

—'না। আপনার সংসার খরচ আমিই চালাই। মাস গেলে খোঁজখবর নিয়ে সব শোধ করি। আমি হিসাব চাইব না তো কে চাইবে ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা হয় না। চলুন। তৃপ্তির বাড়ি কোথায় দেখিয়ে দিন আমাকে। সেখানে বসে দু'জনের কাছেই আমি হিসেব চাইব। হিসেব আমাকে দিতেই হবে। দুর্গালালের ঘরেই উনসত্তর হাজার টাকা। কম টাকা !'

শশাঙ্ক একটুও মচকালো না। পরিষ্কার বলল, 'রজনীই আপনার 'সুজাতা' হিট করিয়েছে। তার সংসার তো এমনিই চালাবেন। দরকার হলে উপহার দেবেন। রজনীকে খুশি রাখবেন।'

—'সে আমি বুঝবো। তৃপ্তি কোথায় ?'

—'আমরাও তেমনি বুঝবো—হিসেব কাকে দেব, কাকে দেব না। রজনী চাইলে নিশ্চয় দিতাম।'

—'কেন শুধু শুধু মিথ্যে বলছেন ? সে বেচারী আর কি চাইবে ? তাঁর আর বাকি রেখেছেন কি ? বাড়ি ভাড়া। বাজার খরচ। ওষুধ-বিষুধ তো আছেই। তারপর আছে দুর্গালাল। সই করাবার সময় হুণ্ডি কেন ওরই কাছে এগিয়ে দিতেন ? আপনারাও তো ছিলেন ?'

—'দুর্গালাল আমাদের সইতে টাকা দিতে রাজি ছিল না।'

—'তার মানে জানতো—আপনারা ফেকলু পার্টি। এই তো ! পথে আসুন ! সেই টাকা দু'জনে মিলে উড়িয়েছেন। কীসে ওড়ালেন এত টাকা ? তাছাড়া টিকিট সেলের টাকা ছিল। সে তো অনেক টাকা। 'কবিয়াল' নাটক অন্তত সাত আট লাখ টাকার বিজনেস করেছে।'

—'খরচও ছিল।'

—'ধরলাম ছিল। কিন্তু তারপর?'

—'আপনার এত দরদ কেন? জানি কেন।'

—'হ্যাঁ। রজনীর জন্যে আমি চিন্তা করি। ওর জন্যে আমার কষ্ট হয়। রজনী বাংলা স্টেজের লাস্ট অব দ্যি মোহিকান্স। ওই লেভেলের আর্টিস্ট আর কেউ বেঁচে নেই এখন। তিন ডিকেড ধরে দাপটে অভিনয় করে আসছে। সব রকমের রোল। বড়বাবু, অহীনবাবু, ছবি বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র—সবার সঙ্গে অ্যাপিয়ার হয়েছে স্টেজে। আবার এখনকার নাটকও চুটিয়ে হাউস ফুল করে দিয়েছে রাতের পর রাত। অথচ বাংলা স্টেজ ওকে কী দিল? কী পেল ও? আপনার মত স্বামী যে কিনা তাঁরই প্রেম-প্রার্থীর সঙ্গে জোট বেঁধে তাঁরই টাকা ওড়ায়—তাঁকেই দেনার পাহাড়ে তলিয়ে দেয়—তারপর সংসার ফেলে পালিয়ে বেড়ায়—অসুখের সময় ওষুধ এনে দিতে হয় আরেকজনের—'

সমান পজ দিয়ে আরো অন্ধকার গলিতে শশাঙ্ক তিনটি ক্ল্যাপ দিল। 'সুন্দর রিহার্সেল দিয়েছেন আপনি! পার্ট টনটনে মুখস্থ। এবার নাটক স্টেজ করুন। আমি টিকিট কেটে দেখব।'

গলির অন্ধকার থেকে একটা হাতে টানা রিক্শা ঠুনঠুন করে বেরিয়ে আসছিল। প্যাসেঞ্জার একটা বস্তা—না, মানুষ বোঝা যাচ্ছিল না। বড় রাস্তায় বেশি রাতের লরি তীক্ষ্ণ হর্ন বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

অমিয় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। খপ করে কলারটা ধরল শশাঙ্কর।

—'চলুন তৃপ্তির সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। কোনদিকে? চলুন। দেখা করবই আমি।'

—'এখন দেখা করে আর কোন লাভ নেই। জামা ছাড়ুন।'

অমিয় অবাক হয়ে গেল। কত বড় বাড়ি। ভিত মাটির মধ্যে বসে গিয়ে মেঝে কলকাতার চেয়ে অন্তত চার ইঞ্চি নিচে। উঠোনের জল থলল থলল করে ঘরে ঢুকতে চাইছে। জোরে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার—কলকাতার ভেতর এত বড় এত পুরনো একটা বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। ঘরে ঘরে হারিকেন। শরিকানি বারান্দার ওপর দিয়ে অনেকটা হাঁটিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক যে ঘরটার সামনে এসে দাঁড় করালো—তার দরজা থেকেই হারিকেনের আলোতে প্রথম যা চোখে পড়ল অমিয়র—তা হল—একটা টুলের ওপর গীতাচণ্ডীর

মত ভক্তি ভরে থাক থাক সাজানো—বাণ্ডিল বাণ্ডিল রেসের বই। তার পাশের টেবিলে হরেক ওষুধের ফাইল লাগোয়া খাটে তৃপ্তির মত একটা লোক শুয়ে।

পায়ের শব্দে মাথা ফিরিয়ে তাকালো তৃপ্তি।

অমিয়র বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। সামান্য আলোয় তৃপ্তির গালের সরানো মাংস দিয়ে মাড়ির দু'পাটি শাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। তৃপ্তির ডান দিকের গালে পুরনো কাঁচা টাকার সাইজের একটা বড় গর্ত।

—'কে? অমিয়।'

চোখ নামিয়ে নিল অমিয়। কিন্তু কান বন্ধ করতে পারল না।

—'আমায় ক্ষমা করে দিও অমিয়। আমি আর নেই—'

শশাঙ্ক আস্তে বলল, 'ক্যানসার।'

অমিয় অনেক কষ্টে চোখ তুলে তাকালো। বউয়ের মত একজন মেয়েলোক সেই অন্ধকার ঘরটায় তৃপ্তির পায়ের কাছে বসে। তৃপ্তির চোখ হারিকেনের ফ্যাকাশে আলোয় আরও সুদূর। কিন্তু এত অল্প আলোতেও গালের মাংস সরিয়ে দু'পাটি শাদা ঝকঝকে দাঁত যেন হাইজিনের ডাক্তারি চার্ট থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—'ক্ষমা করে দিও অমিয়। রজনী বড় ভালো—'

আর বলতে পারল না তৃপ্তি। একদম খুলে ফেলা ইঞ্জিনের ছড়ানো পার্টস হয়ে খাটে পড়ে আছে।

অমিয় দরজা থেকে সরে এল। বি কে পালের দোকানের কাছাকাছি এসে অমিয় বলল, 'কোনদিকে যাবেন শশাঙ্কবাবু? চলুন আপনার বাড়িতে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। রজনী খুশি হবে দেখলে।'

—'না। ওদিকে এখন যাব না।'

—'কোনদিকে যাবেন? নামিয়ে দিয়ে যাই।'

—'আমি হেঁটে যাব।'

—'ওঃ! আমার গাড়িতে চড়বেন না।'

—'না।'

অমিয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শশাঙ্কর চলে-যাওয়া দেখলো। অভিনেত্রীর স্বামী। অভিনেত্রীর প্রেমিকের বন্ধু। অভিনেত্রীর বন্ধুর শত্রু। অভিনেত্রী বেরিয়ে গেলে বাড়ি গিয়ে ছেলেমেয়েদের দেখে আসে। অভিনেত্রী মায়ের বিরুদ্ধে তাদের

চোখে অভিযোগ সাজিয়ে রেখে আসে। চুল দাড়ি কাটা বন্ধ করে দিয়ে এখন খরচ বাঁচাচ্ছে। ভিড়ে হারিয়ে গেল শশাঙ্ক।

স্টিয়ারিংয়ে বসে প্রথম কথাই মনে হল অমিয়র—আমি এখন কোথায় যাব? হাউসে? লীলার কাছে? তৃপ্তির ক্যানসারের কথা বলতে রজনীর বাড়ি?

কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখেই অমিয়র চোখ বুজে এল। তার এখন তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। কোন কিছুই দেখার ইচ্ছে নেই। তৃপ্তিদা। আমি তোমার অভিনয় দেখেছি কলেজে পড়ার সময়। এইতো কিছুকাল আগে দেখলাম—'কবিয়ালে'— রাজনের রোলে। তুমি গ্রুপ থিয়েটারের একেবারে গোড়ার দিককার লোক। কী অভিনয়! কোনদিন ও রকম পারব না। কোনদিনও না—'

ক্লান্তি কয়েক সেকেণ্ডে তার ঘুম গাঢ় করে দিল। ঘুমের পাড়া শেষ হয়ে গিয়ে স্বপ্নের পাড়া শুরু। সন্ধ্যে রাতে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুমন্ত অমিয়র চোখের সামনে গরম ইস্ত্রি দাঁড় করিয়ে রেখে চণ্ডীদা বলল, 'এবার একটা বাড়ি কর অমিয়। তোমার ছেলেমেয়ে আছে। ভবিষ্যৎ আছে। থিয়েটারের টাকা কিন্তু দাঁড়ায় না—'

—'তাহলে তো আবাম আমাকে খেয়ে ফেলবে চণ্ডীদা।'

এসব স্বপ্ন ক্ষণস্থায়ী হয়। বিশেষত রাস্তার ওপর। কারণ ট্রাফিক পুলিশ এসে জাগিয়ে দিল অমিয়কে।

॥ চোদ্দ ॥

মুখ্যমন্ত্রী 'পঞ্চমুখের' প্যাডের কাগজে লিখে দিলেন, আই এনজয়েড দি শো ভেরি মাচ। তিনশো রজনীর অভিনয় এইমাত্র শেষ হয়েছে। প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ত্রাণ ভাণ্ডারে এই শোয়ের টিকিট বিক্রির পুরো টাকা রজনী মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিল। ফটোগ্রাফাররা ক্লিক ক্লিক ছবি তুললেন। বছর ঘুরে গিয়ে শীত ফুটে গরম আসছিল।

মুখ্যমন্ত্রী দোতলার নতুন ঘরে নাটকের লাইব্রেরি দেখলেন 'পঞ্চমুখে'র। তারপর এক সময় হুস করে চলে গেলেন। আজ সুজাতা হয়েছিল রজনী। অনেক দিন পরে আভা হয়েছে নন্দনা।

অমিয় শংকরকে বলল, 'মালপত্র বাসে তুলতে। কম রাস্তা নয় পুরুলিয়া।'

—'এখনি রওনা দেবে?'

—'রাতে রাতে চলে গেলে কাল বারোটার ভেতর পৌঁছবো। পুরুলিয়া ছাড়িয়ে তো রঘুনাথপুর। দুপুরটা ঘুমিয়ে সন্ধেবেলায় শো। আবার রাতের বাস। কলকাতায় ফিরে পরশু ডবল শো আছে।'

শংকর তাকে থামিয়ে বলল, 'এত টাকা আয় করে লাভ হচ্ছে কি শুনি অসুখে পড়বে ঠিক তুমি। দিদি মাত্র মাস দুই সেরে উঠেছে—'

রজনী বলল, 'আমি ঠিক আছি।' তারপর অমিয়র দিকে তাকিয়ে বলল, 'না গেলে নয়? তোমার শরীর কী হয়েছে দেখেছো একবার আয়নায়—'

—'বাঃ। পুরো টাকা অ্যাডভান্স নেওয়া সারা। সেখানে পোস্টার দিয়েছে। দশ হাজার লোক ফিরে যাবে?'

শংকর লাইটের সেট তুলছিল—ড্রাইভারের সিটের পাশে। গ্রুপের সবাই হৈ-হৈ করে বাসে উঠছিল। অমিয় আস্তে বলল, 'দুর্গালাল ফিরে যাবে? তার কিস্তির টাকা তো পরশু দিতেই হবে।'

রজনী আস্তে ওঃ! বলে থেমে গেল। এই দীর্ঘ দেনাটি শশাঙ্ক আর তৃপ্তি তাকে উপহার দিয়েছে। কথাবার্তা বলে মোট টাকার একটা কাটছাঁট করিয়েছে অমিয়। দুর্গালালও রাজি হয়েছে। শশাঙ্ক সেই যে ফেরার—তারপর আর রজনীর চোখের সামনে আসে না। রজনীর বলার ইচ্ছে ছিল—আমার খরচ থেকে না হয়

আস্তে আস্তে দুর্গালালকে দিতে। কিন্তু তা হয় না। তার সংসারে তাহলে খরচ-কমানো দরকার। আর সুদও বেড়ে যাবে অনেক।

বাসে সাতটা টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার উঠল। নন্দনার স্বামীও উঠেছে। ভদ্রলোক এখন কল-শোয়ে 'পঞ্চমুখের' সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরেন। শংকর একবার হেসে বলে ছিল 'পাহারা!'

নন্দনা হাতের চিরুনী ছুঁড়ে মেরেছিল, 'সবটাতে তোর ইয়ারকি। বিয়ে তো করোনি। জানবে কি করে। শুধু হাঁটা হচ্ছে শ্লিম হবাব জন্য।

নন্দনা এখন ওদের একজনের মতই। সেদিন নিজের একটা ইনসিয়র করালো। প্রথম প্রিমিয়ামটা অমিয় পঞ্চমুখ থেকে দিয়ে দিয়েছে। ফ্ল্যাট বদলাবে। অ্যাডভান্সে চার হাজার টাকা ধার দিয়েছে 'পঞ্চমুখ'। তাছাড়া শোয়ের দিন গাড়ি যায়। নিয়ে আসে। বাড়ি পৌঁছে দেয়। অমিয়কে একখানা বই দিয়েছে নন্দনা। ব্রেখটের "ব্যাড ওম্যান অব সেজুয়ান"। তার ফ্লাই লিফে লিখেছে—দাদার জন্মদিনে। নন্দনা।

রজনীর অসুখ থেকে ওঠার পর আজ ছিল বড় শো। গেস্টদের দিয়েও অনেক মালা বেশি হয়েছে। রজনী মালার গোছা হাতে নিয়ে গ্রুপের সবার গলায় পরিয়ে দিচ্ছিল একটা করে। মেকআপ তোলা হয়নি। পরনে লাস্ট সিনে সুজাতার বিদায় নেওয়ার সেই শাড়ি।

অমিয় মুখ তুলে বলল, 'মেকআপ তুলবে না? এখনি বেরোতে হবে। কি ব্যাপার? আজ তোমার [illegible]ের মনে হচ্ছে।'

—'এখুনি তুলছি। নাও।'

মালা পরিয়ে দিতে অমিয় হেসে ফেলল, 'আমরাও তোমার গেস্ট নাকি?'

সেকথায় কান না দিয়ে রজনী নন্দনাকে ডাকলো, 'এসো এদিকে ভাই।' মালাটা পরিয়ে দিয়ে রজনী বলল, 'তোমার জন্যে একটা নাকছবি এনেছি। পরে নাও তো।'

—'এখন ইচ্ছে করছে না দিদি।'

—'পরো না দেখি। এই তো। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ছাখো। গলায় মালা। নাকে নাকছাবি। আজ খুব মানিয়েছিল তোমায় আভার রোলে।'

বাস ছাড়বার মুখে গন্ধর্ব অফিস থেকে পিওন এসে দশ কপি বিনোদন সংখ্যা দিয়ে গেল। দুখানা রেখে আটখানা বাসে পাঠিয়ে দিল অমিয়।

—'বিষ্ণুবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। একটা সই করে দিন।'

সই দিয়ে অমিয় জানতে চাইল, 'কবে বেরিয়েছে ?'

—'এই তো বেরোলো। ঘণ্টাখানেক আগে।'

বাস চলে গেল আগে আগে। অমিয়র গাড়ি ছাড়লো প্রায় সাড়ে দশটায়। ড্রাইভার ছাড়া ওরা তিনজন। সামনের সিটে অমিয়। পেছনে রজনী আর নন্দনা।

কলকাতা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার রাস্তায় পড়তেই পেছনের সিটের দু'জন দুখানা গন্ধর্ব হাতে নিল। নন্দনা ভেতরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল। তারপর একই সঙ্গে দু'জন দু'জনের মুখের দিকে তাকাল। রজনী নন্দনার। নন্দনা রজনীর। আবার যে যার বইতে চোখ। গাড়ির অয়েল ইণ্ডিকেটরটা থিরথির করে কাঁপছিল। রজনীর হাতে গন্ধর্বের মলাট বাতাস পেয়ে কাঁপছিল।

মলাটে সুজাতার পোশাকে নন্দনা শুয়ে আছে তার সঙ্গে কোলাজ করে আরও তিনটি ছবি মেশানো। অমিয় নন্দনাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়ানো।

রজনী আর দেখতে পারল না। পেছনের তাকে কাগজখানা রেখে দিল। চোখ সরু হয়ে তখন তার সামনের সিটে বসা অমিয়র মাথা, দীর্ঘ গ্রীবা ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল।

নন্দনা বিষ্ণু দত্তর লেখা প্রবন্ধ পড়ছিল। সুজাতা নাটক এবং হুইসপার ক্যামপেন—বিষ্ণু দত্ত।

রজনী বলল, 'ঘুম পাচ্ছে, আলো নিভিয়ে দিই।'

—'আরেকটু দিদি, আরেকটু।'

—'এই আলোতে পড়ে চোখ খারাপ করিসনে।'—বলেই হাত এগিয়ে সুইচ অফ করে দিল রজনী।

পার্টি বলেছিল বাস থেকে নেমে সামান্য পথ। দেখা গেল সেই সামান্য মানে দু'মাইল। তাও আবার পুরুলিয়া জেলার দুপুরে। রোদের ভেতর।

গাছপালার ছায়াঘেরা একটা বাড়িতে এসে যখন ওরা পৌছালো—তখন বেলা একটা। সারাটা পথ রজনী শুধু অমিয়র একথা সেকথার দায়সারা গোছের হুঁ হাঁ দিয়ে এসেছে।

—'কি হয়েছে তোমার বল তো। মেজাজ খারাপ!'

—'কোথায় !'

এর বেশি আর কথা এগোয়নি।

বাসে এগিয়ে এসে অ্যাডভান্স পার্টি শোবার, গড়াবার জায়গাটুকু দখল করে

বসে আছে। সন্ধ্যেবেলা শো। হাত পা ছড়িয়ে সবার আগে বিশ্রাম করা দরকার রজনীর আর অমিয়র। তারাই শোবার জায়গা পেল না।

অমিয় মনে মনে বলল, এদের কি একটু আক্কেল নেই?

বেলা চারটে নাগাদ সবাই গ্রাম দেখতে বেরলো। অল্পক্ষণের জন্যে। রজনী তখনো বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে বসে আছে। দুপুরে খায়নি। রাগের চোটে অমিয় খায়নি। কেউ সাধলোও না তাদের।

'রজনী' বলে দুবার ডাকলো অমিয়। 'এবার একটু শুয়ে নাও না। তাহলে এতটা জার্নির গায়ের ব্যথা কিছু মরবে।'

রজনী কোন জবাব দিল না। খাওয়া হয়নি। ঘুম হয়নি। তারপর গ্রুপের সবার এমন বেআক্কেলে কাণ্ড। অমিয় উঠে গিয়ে রজনীর সামনে দাঁড়ালো। রজনী তখন শীতকালের কুকুরের মত নিজেকে বেতের বড় চেয়ারটায় কোন রকমে ভরে নিয়ে বসেছিল।

ধাঁই করে এক চড় কশালো অমিয়। রজনী চমকে মুখ তুলে তাকালো। 'তুমি আমায় মারলে?'

অমিয় সেখানে দাঁড়ালো না। হনহন করে হেঁটে গিয়ে কর্মকর্তাদের ভেতরে বসে পড়ল। মেকআপ নেওয়ার সময়েও দু'জনে কোন কথা হল না। স্টেজে কিন্তু ওরা নিজেদের মতই অভিনয় করে গেল। পাবলিকের একটুও বোঝার উপায় ছিল না—কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই একটি চড়ের জন্যে ওদের দু'জনের ভেতরে সবরকম কথা থেমে আছে।

সেই রাতেই ওরা রওনা দিল। কলকাতা—আবার কলকাতা। আজ সকাল থেকেই নন্দনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিষ্ণু দত্তর লেখাটা পড়ে চলেছে। ওদের দিকে মন দেবার মত সময় তার ছিল না। নন্দনার জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় রিভিউ।

ফেরার পথেও রজনী বা অমিয়—কেউ কিছু খেল না।

পরদিন দুপুরে 'ভরত' হলের সাজঘরে রজনীর বাড়ি থেকে খাবার এল। রজনী এল না। শো শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টা আগে অমিয় ফোন করে জানলো রজনী তো যথারীতি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। রজনীর ছেলেও জানালো—মা হাউসে গেছে।

তাহলে কোথায় যেতে পারে। নন্দনাকে সুজাতার মেকআপ নিতে বলে অমিয় কল্যাণীকে আভা হতে বলল। স্টেজে ঢোকার আগে লালুকে বারাসাত পাঠালো। সেখানে রজনীর একজন পাতানো মা থাকেন। হয়তো তার কাছে গেছে।

ডবল শোয়ের মাঝখানে খবর এল রজনী সেখানে যায়নি। কোথায় যেতে পারে? ইভনিং শোয়ের শেষে বেরিয়ে তিনটি থানায় ডায়েরি করল অমিয়। তখন মনে হল আজ যদি শশাঙ্ক থাকতো। অনেক রাতে বাড়ি ফিরলে লীলা বলল, 'বিষ্ণুবাবুর লেখাটা পড়েছো! দারুণ লিখেছেন কিন্তু।'

– 'পড়ার সময় পেলাম কোথায়? রজনী বেপাত্তা—'

—'কি ব্যাপার?'

—'আজ দুপুর থেকে। কেউ বলতে পারছে না কোথায় গেছে—'

অন্যমনস্ক অমিয় কিছুই খেল না। ভাত নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করল শুধু। ফলে লীলারও বিশেষ খাওয়া হল না। লীলা জানে—শশাঙ্ক ক'মাস হল—হাওয়া। ড্রাইভার লালুই বলেছে তাকে। রজনী আর লীলার মধ্যে অমিয় ছাড়াও আরেকটি যোগসূত্র—লালু ড্রাইভার। তারও কষ্ট হচ্ছিল রজনীর জন্যে। কোথায় যেতে পারে? খানিক পরে রাগও হল। এমন করে লোক হাসিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয়!

'কিছু বলেছিলে ওঁকে?'

—'একটা চড় মেরেছিলাম।'

—'এ্যাঁ! সেকি?'

লীলা পরিষ্কার বুঝলো, চড়টা সোজা তার গালেই এসে লাগল। সম্পর্কটা এতদূর যে অবলীলায় চড়ও মারা যায়। কিন্তু কিছু বলল না। অমিয় বলে দিয়েছে যার যা ভূমিকা। দু'জন মানুষ সেদিন একই বিছানায় দু'দিকে ফিরে শুয়ে থাকলো। কারও ঘুম হওয়ার কথা নয়। তবে শেষ রাতের দিকে ক্লান্তিতে অমিয়র চোখ বুজে এল। বেলায় বিছানা থেকে উঠে সোজা 'ভরতে' চলে এল। বিশ্বনাথকে পাঠালো পুরী। মাঝে মাঝে যেন রজনী পুরী হোটেলের কথা বলত।

চণ্ডীদার ডবল—বিমলকে পাঠালো ওয়ালটেয়ার। আর লাইটের তারককে দীঘায়। বলে দিল খবর পাওয়া মাত্র 'ভরতে' ফোন করবে।

সেদিন সারাদিন কোন খবর নেই। পরদিন শোয়ের আগে শংকর চীনে খাবার আনালো। দুটি খেয়ে নাও। নয়ত শরীর গোলমাল হবে। এই মন নিয়ে শো করা যায়? অমিয় কাঁটা চামচ নেড়েচেড়েও খেতে পারল না।

শোয়ের ঠিক আগে পুরীর খবর এল। বিশ্বনাথের গলা। 'দিদি এখানে। কথা বলবে?'

অমিয় বলল, 'না।'

বিশ্বনাথ বলল, 'আমরা কোনারক বেড়াতে যাচ্ছি।'

অমিয় ফোন নামিয়ে রাখলো। শো সেদিন পাঁচ মিনিট দেরিতে শুরু হল। কারণ ফোন নামিয়ে অমিয় নির্জন সাজঘরে সেই ফেলে রাখা চীনে খাবার গোগ্রাসে খেল। জল খেল দু'গ্লাস। পর পর। তার শরীর তখন কাঁপছে। স্টেজে নন্দনা খুব আস্তে বলল, 'পড়ে যাবেন দাদা। আপনার হাত কাঁপছে।'

আরও তিনদিন পরে রজনী ফিরে এল। হাউসে এসে অমিয়র দিকে তাকাতে পারছিল না। 'এ কি করছো শরীরের অবস্থা। সব শুনলাম লালুর কাছে, এই নাও পুরীর প্রসাদ।'

অমিয় অবাক হয়ে তাকালো। মেয়েলোক যে কী জিনিস। কী দিয়ে তৈরি হয়। রজনীর হাতে কোনারকের পোড়ামাটির পুতুল। হাতে শুকনো মালা। কোন মন্দিরের হবে। প্রসাদ দিল যেন—কালীঘাট গিয়েছিল ট্রামে করে—ফেরার পথে এনেছে।

খানিকক্ষণ কোন কথা হল না। তারপর অমিয় বলল, 'চড মেরেছি বলে চলে গেলে ?'

—'না।'

—'তবে ?'

—'নাটকের শুরু থেকে আমি। গন্ধর্বের মলাটে গেল নন্দনা ?'

—'এই কথা। তা বলবে তো আমাকে। প্ল্যানিংয়ের সময় তুমি অসুস্থ। বিজ্ঞাপন তো রানিং শো নিয়েই হয়। এত ছেলেমানুষ !'

—'তারপর দেখলাম ওরা রঘুনাথপুরে শো করতে গিয়ে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছে। ধকলটা সবচেয়ে বেশি আমার। অথচ আমার জন্যে বসবার কোন জায়গা রাখেনি। নন্দনা শুয়ে শুয়ে বিষ্ণুর লেখাটা পড়ছে। মলাট জুড়ে নন্দনার স্প্রেড আউট। তুমি মারলে চড়। ঠিক করলাম—এ জীবন রাখবো না।' এখানে পৌঁছে রজনী কাঁদতে লাগল। শব্দহীন। হাতের পোড়ামাটির পুতুলজোড়া পড়ে গেল পাপোশে। অমিয় নিচু হয়ে কুড়িয়ে রাখলো।

—'ঠিক করলাম—পুরী যাব। মায়ের সঙ্গে খুব ছোটবেলায় গিয়েছিলাম। তখনকার সমুদ্র মনে ছিল। এবার গিয়ে সমুদ্রের কাছে দাঁড়ালাম। ঠিক ছিল ডুবে মরব—কিংবা দূরে ভেসে যাব। কিন্তু হল না।'

—'কেন ?'

—'আমি গেলে আমার ছেলের কি হবে? ছোট মেয়ে দুটোকে কে দেখবে? ওদের তো আমি ছাড়া কেউ নেই।'

—'বেশি দুধ দিয়ে কফি খাবে?' রজনীর সায়ের জন্যে অপেক্ষা না করে অমিয় হিটারে দুধটা গরম করতে দিল। ফিরে আসার একটা লজ্জা ছিল। মরতে না পারার একটা দুঃখ ছিল। রজনী কোন কথাই জোর দিয়ে বলতে পারছিল না। এখন মনে হচ্ছে ভরত হলে সে আগন্তুক। সদ্য সদ্য ফেলে আসা মন্দির সমুদ্রের স্মৃতি—সেখানকার সূর্যালোক তখনো তার গায়ের ওপর লেগে ছিল।

কফি খাওয়ার পর অমিয় তাকে এক সপ্তাহের কাটা টিকিটের কাউণ্টার বইগুলো আর খাতা ধরিয়ে দিল। 'এগুলো সব মিলিয়ে দিয়ে তবে উঠবে।'

রজনী একটা কাজ পেয়ে গিয়ে লজ্জার হাত থেকে বেঁচে গেল। বছরখানেক হয়ে গেল—এই কাজই সে করে আসছে। খানিক পর দেখলো অমিয় একখানা নতুন খাতা খুলে তার ভেতর ঝুঁকে বসেছে।

রজনী উঠে এসে পেছন থেকে উঁকি দিল 'নতুন নাটক?'

—'হ্যাঁ। সম্রাট।'

—'সুজাতা আর করবে না?'

—'কেন করব না। তবে অনেকদিন তো হল। আমাদের আরও নাটক রিহার্সেল দিয়ে তৈরি রাখা দরকার। ধর বৃহস্পতিবার নতুন নাটক করা যায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করলে একটা মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। নয়তো রোজ এক কথা। একই জায়গায় ক্ল্যাপ—একই জায়গায় মিউজিক ফোকাস—কেমন বন্দী বন্দী লাগে রজনী।'

—'আমি তোমায় বন্দী করেছি। না?'

—'একথা আসছে কোত্থেকে?'

—'যে কদিন ছিলাম না—রোজ চণ্ডীদাকে পাঠিয়েছো। নিজে গিয়েছো। খবর নিয়েছো। এটা একটা বন্দীদশা নয়?'

—'এসব আমার ভাল লাগে। বিশেষ করে—ওরা তো ছেলেমানুষ। আমি এখন চল্লিশ পেরিয়ে গেছি। স্নেহটাই সবচেয়ে আগে কাজ করে। রাগ আসে অনেক পরে। আর শশাঙ্ক থাকলে তো আমার যাওয়ার কথাই থাকতো না।'

—'সে একদিনও যায়নি এর ভেতর?'

—'না। হয়তো কোন কাজে ব্যস্ত আছে। তুমি কিন্তু ভুল বুঝে রাগ করেছো।

'পঞ্চমুখে'র কোন নাটকে চণ্ডীদার স্টিল কোন কাগজের কভারে যেতে পারে। অবস্থা বুঝে। নাটক বুঝে।'

—'হয়তো তাই।' তারপর একদম অন্য কথায় চলে এল রজনী। 'তোমার বড় ছেলেকেও আমার খুব ভাল লাগে। লালুর পাশে বসে স্কুলে যেতে দেখেছি। আমাদের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল—ভেতরে ডাকি।'

—'ডাকলে না কেন?'

—'যদি না আসে। যদি লীলা রাগ করে।'

—'করলোই বা। স্নেহ-ভালবাসা কি কোথাও আটকে থাকবার জিনিস!'

—'তোমার নতুন নাটকে আমার কোন রোল নেই?'

—'আছে। দু' চারদিন রিহার্সেল দিলে বুঝতে পারবে। ইতিহাস ঘিরে নাটক। অথচ সবই এখনকার কথা।'

—'কখন লেখো তুমি?'

—'সময় নিয়ে বাঁধাধরা কিছু নেই। গত আঠারো বছরে একুশখানা নাটক নেমেছে 'পঞ্চমুখে'র। যখন লিখি তখন ঘোরে থাকি। কিছু জানি না।'

—'এর সঙ্গে তো চালু নাটকের শো থাকে। তার নানান ঝক্কিও থাকে।'

—'আমার যখন চারদিক থেকে দম আটকে আসার অবস্থা হয়—তখন নাটক আসে আমার ভেতর থেকে। আজকের ইভনিং শোটা করবে? করো না। লোকে তোমার অভিনয় দেখতে আসে।'

—'তা কেন? নন্দনা তো ভালোই করছে। আমার চেয়ে স্পিডেও করে। অ্যাকচুয়াল টাইম বারো মিনিট কমিয়ে এনেছে।'

—'ওর সঙ্গে স্টেজে ঢুকলে আমার ভেতর থেকে কোন কম্পিটিশন আসে না। মনে হয়—করবার তাই করে যাচ্ছি। তোমার সে দাপট ওর ভেতরে নেই। তুমি স্টেজে ঢুকেই সবার চোখ তোমার দিকে টেনে নিতে বাধ্য কর।'

—'সবার অভিনয় তো এক রকম নয়। কেউ অভিনয়ের চরিত্রে ঢুকে পড়ে—সেই চরিত্র হয়ে যায়। আবার কেউ অভিনয়ের চরিত্রে ঢুকেও নিজের আলাদা একটা বিশিষ্টতা বজায় রাখে। সেই স্বাতন্ত্র্য অভিনয়ের চরিত্রে নতুন মানে যোগ করে। তখন তা আরও উজ্জ্বল হয়।'

—'তুমি তো বেশ ও দিয়ে সুন্দর করে বলতে পার।'

—'এই নতুন মানে দিতে গেলে জীবনের অভিজ্ঞতা চাই। দুঃখের, সুখের গানের বিপদের। আমি তো এগারোর নামতা পড়ে আর এগোই নি। তাই চোখে

যা দেখি—কানে যা শুনি—একটু একটু করে সঞ্চয় করি—তুলে রাখি—তা থেকেই নাটকে নিজেকে ঢালি। ভালো কথা। এখনো দুর্গালাল আর কত পাবে?'

—'আট ন' হাজার।'

—'অত টাকা শোধ করে ফেলেছো। তুমি মানুষ না!'

—'কেন?'

—'আমি তোমার কেউ নই। তার জন্যে তুমি ষাট হাজার টাকার দেনা ক্লিয়ার করে দিলে?'

—'কে বললে কেউ নও? আমাকে যে রোজ জাগিয়ে তোল স্টেজে। সে-রকম তো কেউ জাগাতে পারে না। খুব সেন্টিমেণ্টাল শোনাবে রজনী। সেদিন স্বামী, বন্ধু সবার কাছ থেকে ধাক্কা খাওয়া একজন অভিনেত্রী ট্যাক্সির জানলায় বসে বিনা রসিদে তিন দিনের হল ভাড়া না দিলে 'ফেরিওলার মৃত্যু'র লাস্ট নাইটেও স্টেজ পাওয়া যেত না।'

—'ওঃ! সেই সামান্য কথা মনে করে রেখেছো।'

—'আরও মনে করার জিনিস অনেক আছে রজনী। ফার্স্ট নাইটের আগে তুমি বেবি মিররের ফোকাস যোগাড় করে না দিলে 'পঞ্চমুখ' ও সিন স্টেজ করতে পারত না।'

—'কিচ্ছু না।'

—'অনেক। অনেক রজনী। লীলা আমাকে সংসার দিয়েছে পি. এফ. ভেঙে টাকা জুগিয়েছে। চাকরি করে অন্নজল বজায় রেখেছে। সবই আমার জন্যে। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে তো আমার ভেতরকার অভিনয়কে জাগিয়ে তুলতে পারে নি। নাটকের জন্য তুমি অনেক দিয়েছো আমাকে।'

—'তাহলে ইভিনিং শোটা করতে বোলছো।'

—'কর না। আমি এ ক'দিন একদম ঘুমিয়ে আছি।'

—'নন্দনা কি করবে?'

—'নন্দনা আভা করুক। কল্যাণী রেস্ট নিক।'

অনেকদিন পরে ভরতের স্টেজে অমিয়র মনে হচ্ছিল নিজের বারান্দায় বসে আছে। এ কোন অভিনয় নয়। এরই নাম পৃথিবী। রজনীর গলায়—তুমি চাঁদের জোছনা হয়ে থাকো—একদম স্টেজে চলে যাওয়ার-সরে যাওয়ার ভাব এনে দিল। অমিয় প্রায় ছুটে ছুটে রজনীকে ধরবার চেষ্টা করছিল। ধরা কি যায়! একদম অন্য জাতের অভিনয়।

শোয়ের শেষে অনেকেই দেখা করতে এলেন গ্রিনরুমে। এই তাড়াহুড়োর ভেতরে নন্দনা কখন মেক-আপ তুলে চলে গেছে কারও তা খেয়ালই নেই। খেয়াল হল—যখন অনেক দিন পরে আবার সবাই খেতে বসল এক সঙ্গে। আজ রজনী সবাইকে খাওয়াবে বলে রেখেছিল। নন্দনা অ্যাবসেন্ট।

নতুন নাটক পাবলিসিটি বৃহস্পতিবার একটা করে শো অন্য নাটকের ট্রায়াল—এসব নিয়ে কথা হতে হতে দেখা গেল—সাজ-ঘরে শুধু অমিয় আর রজনী আছে। চণ্ডীদা ক্যান্টিনে খেতে গেছে।

এমন সময় অমিয় বলল, 'তোমায় একটা কথা বলা হয় নি রজনী।'

—'কি ?'

—'দিন দশেক হল শুনেছি। কিন্তু বলার সময় পাই নি। শশাঙ্কবাবুর সঙ্গেও দেখা হয় না।'

—'তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাকি মাঝে মাঝে ?'

—'একবার হয়েছিল। তোমার তখন অসুখ।'

—'বল নি তো।'

—'বলার মত কিছু নয়। রাস্তায় দেখা—'

—'তাই বুঝি ! আমাদের কথা—আমার কথা—কিছু বলেছিল ?'

—'না। আমি অন্য একটা কথা বলছি। তুমি কীভাবে নেবে জানি না। তোমার অনেক দিনের বন্ধু।'

—'বন্ধু ?'

—'হ্যাঁ। তৃপ্তির কথা বলছি।'

—'হাঃ ! কি বলছো তুমি। অত ভণিতা কিসের ?'

—'তৃপ্তি নেই।'

—'মানে ?'

—'ক্যানসার হয়েছিল।'

—'ও।' রজনী বসেছিল। উঠে দাঁড়াল।

—'ভালোই হয়েছে মরে গিয়ে। নয়ত ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের অল্প বয়সে ওঁর অভিনয়ে আমরা ইন্সপায়ার্ড হতাম।'

—'এই সেদিনও রাজন করেছে। কী সুন্দর করতেন ! যদি ঠিক ঠিক পথে থাকতেন। রেস মদ—ওঁকে শেষ করে দিল।'

রজনী তার চোখের জল আটকাতে পারল না। 'যখন আমাদের অল্প বয়স ছিল —ওঁকে পাবলিক বোর্ডে বড়দের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে অভিনয় করতে দেখেছি।'

—'তোমায় খুব ভালবাসতেন।'

—'তা বাসতেন। তবে ভুল ভাবে! আমি ওঁকে কখনো সে-চোখে দেখতে পারি নি। আমার সব সময় মনে পড়ত আগেকার ওঁর সেই রূপ। 'বিসর্জনে' তৃপ্তিকে দেখলে তুমি ভুলতে পারবে না কোনদিন। 'চিরকুমার সভায়' অক্ষয়। তুলনাহীন। পরে অবশ্য দেবকাবাবুর বইতে নীতিশ মুখোপাধ্যায়ও অক্ষয় করেছেন। তাঁরও তুলনা নেই। আচ্ছা অমিয়—আমরাও একদিন কারো স্মৃতিতে এমনি হয়তো জায়গা পাবো। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। স্মৃতিও একদিন পুরনো কাগজের মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় '

—'তৃপ্তির শ্রাদ্ধে কাল তিনশো টাকা পাঠিয়ে দেব ভেবেছি।'

—'ক'টি ছেলেমেয়ে?'

—'তা তো জানি না। বউ মত একজনকে দেখলাম—'

—'তৃপ্তির বাল্যবিবাহ ছিল।'

রজনী তখনো চোখ মুছছিল। অনেক কালের অনেক ছবি সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। সবগুলো দৃশ্যই উজ্জ্বল।

॥ পনর ॥

গাড়ি গিয়ে ফিরে এল। নন্দনা আসেনি। চিঠি পাঠিয়েছে। শরীর খারাপ। ডাক্তারের পরামর্শে রেস্ট নিচ্ছে। অমিয়র মুখটা সকালের বিছানায় বসেই গম্ভীর হয়ে গেল। সামনেই আজকের কাগজ। তাতে যাত্রার পাতায় নন্দনার ছবি। রয়েল অপেরায় যোগ দিয়েছে। খবরটা ছবির নিচে লেখা। ছবিখানা কিন্তু সুজাতা নাটকের সুজাতার পোশাকে তোলা। তাড়াতাড়ি অ্যালবাম ঘেঁটে দেখল —ছবির নেগেটিভ তাব কাছে আছে। তাহলে ছবিখানা নিয়ে গেছে শুধু।

লীলাও কাগজ পড়েছে। অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপাব ?'

—'বুঝছি না। লালুব হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে—রেস্ট চাই। অথচ কাগজ বলছে, দু একদিনের মধ্যে রয়েল অপেরার রিহার্সেল শুরু করবে।'

—'তা কি করে হবে! পাওনাব চেয়ে বেশি দেওয়া রয়েছে।'

—'সেই যে পাবলিসিটিটা নিয়ে ওর মনে খিচ্ ছিল—'

—'সেও তো মিটে যাওয়ার কথা। গন্ধর্বের বিনোদন সংখ্যার মলাট জুড়েই তো নন্দনা।'

—'কাগজ বিক্রি হয়ে ফুরিয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি তো আমবা কেউ কোনদিন পাইনি।'

—'তাহলে বেশি ''কায় গিয়েছে।'

—'তা গিয়েছে। কিন্তু তেম'ন মাসের ভেতর ত্রিশদিন বনবাদাড়ে ঘুরতে হবে। পঞ্চমুখ তো বাড়িয়ে দিতেও তৈ'া ছিল। রজনীর শরীর ভাল নয়। হয়তো পাকাপাকি হলেহ কোনদিন সুজাতা রোলের ভার নিতে হত। বোকামি করল।'

—'রজনী ওকে বিঘিয়ে দেয়নি তো। হয়তো অতিষ্ঠ করে তাড়িয়েছে—'

—'কী বাজে বকছো। বিষোবার সময় কোথায় পেল। আসলে না চাইতে কাউকে যদি বেশি দাও—সে তার দাম বোঝে না। কিন্তু একটা কথা—পঞ্চমুখ নাটকের স্টিল দিয়ে তো রয়েল অপেরার নিউজ করা যায় না। এটা হল কী করে ?'

মনে মনে ভেবেই পেল না অমিয়—কেন নন্দনা চলে গেল। ওর কোন কিছুতে তো না বলা হয়নি। ভেবেই রেখেছিল, হাজার নাইট থেকে নন্দনার পাওনা

বাড়িয়ে দেবে। নিয়মিত পাবলিসিটিতেও বড় টাইপে আলাদা করে নাম দেবে।

সকালটা ঠিক করেছিল—সম্রাট নাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসবে। একা একাই ডায়ালগ বলে বলে দেখবে। আর দরকার মত শব্দে গাঁথুনি পালটে পালটে আসল ধার নিয়ে আসবে।

তা আর করা হল না। উকিলের টেলিফোন। উচ্ছেদের মামলার কাগজপত্র চাই। ভাড়ার রসিদ। চুক্তিপত্র। চেক নম্বর। নতুন ইলেকট্রিক লাইন কার নামে। সব কাগজ চাই।

বিষয়-সম্পত্তিওয়ালা একজন লোকের মত ফাইলপত্র বগলে নিয়ে—শাল গায়ে দিয়ে গাড়ির পেছনের সিটে গিয়ে বসল। যাবে উকিলবাড়ি। এর নাম নাটক করা। এন্ট্রান্স একজিট, মিউজিক ফোকাস গানের পরেও আছে মামলা— পাবলিসিটি, হোর্ডিং এগজস্ট পাখা রিভিউ দর্শকদের জন্যে জোড়া বাথরুম, ক্যান্টিনে চায়ের কোয়ালিটি উপরন্তু দোতলায় নাটকের লাইব্রেরি।

বাহা রে গ্রুপ থিয়েটার। বাহা রে শো বিজনেস !! বাহা রে সাকসেস !!! ইংরাজিতে একটা কথা আছে। 'এভরি ফরচুন হ্যাজ এ সিন বিহাইণ্ড।' কিন্তু পাপটা কোথায় করল।

নন্দনার চলে যাওয়া পঞ্চমুখের কেউই ভাল চোখে নিতে পারল না। সোম মঙ্গল বুধের ভেতর ডেবরায় কল শোয়ের ডেট দিতে হল। সেখানে টাকা নেওয়া ছিল পুরো। বৃষ্টির জন্যে শো হয়নি। তারা পাবলিসিটি করে বসে আছে। নয়ত ফিরিয়ে দিত অমিয়। রজনীরও ইচ্ছে ছিল না—অতখানি গিয়ে সুজাতার রোল করে।

দিনে দিনে যাওয়া। অ্যাডভ্যান্স পারটি বাস আগে চলে গছে।

ঘণ্টা তিনেক পরে পেছনের গাড়িতে কল্যাণী আর রজনীকে নিয়ে অমিয় রওনা দিল। অর্ধেক পথ গিয়ে অমিয় হাঁসফাঁস করতে লাগল। লালু মেইন রোডে এক বিরাট নির্জন গাছতলায় গাড়ি থামিয়ে দিয়ে অমিয়কে ঘাসের ওপর শুইয়ে ছিল।

রজনী বলল, 'চল ফিরে যাই।'

—'না। বাস পৌঁছে গেছে। ওদের তাহলে পিটিয়ে ছাতু করে দেবে।'

—'এই শরীরে যাওয়া যায় ?'

লালু আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলল। মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছিল।

কল্যাণী পেছনের সিট থেকে অমিয়র বুকে হাত বুলিয়ে দিল। কোথায় কষ্ট দাদা ?
আরেকটু পথ। ওখানে নিশ্চয় ডাক্তার পাবই।

রজনীর কিছুই করা হচ্ছিল না। পেছনের সিটে বসে এক কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছিল শুধু। বেলা দু'টোয় একটা অসময়ের বৃষ্টি পেল ওরা পথে। গুঁড়ি গুঁড়ি। তাতে পিচ রাস্তা ধুয়ে গিয়ে কালো হয়ে যাচ্ছিল। সামনের কাচে জলের ঘাম দেখা দিল।

ডেবরায় পৌঁছে ডাক্তার পাওয়া গেল। তিনি ওষুধ দিয়ে বললেন, 'শুয়ে থাকুন ঘণ্টা দুই। তারপর চাঙ্গা হয়ে শো করবেন।'

রজনী এখন আর অভিনেত্রী নয়। সে বারবার নিজের মনকে বলল, তোমার ছেলে মেয়ে বউয়ের কাছে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে আমার কাজ শেষ হবে।

অসুখটা যে কি—ডাক্তারবাবু তার কিছুই বিশেষ বললেন না। শুধু বললেন, 'ওভার এগ্‌জারশন। ক্লান্তি।'

অমিয় স্টেজে উঠে দেখল—হ্যাজাকের আলোয় ধানকাটা ক্ষেতের ওপর যতদূর দেখা যায়—শুধু কালো কালো মাথা। সেই দৃশ্যটি তাকে সাহস দিল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, তার জন্যে বিরাট একটা ঘুমের সাগর পড়ে রয়েছে। যতদূর দেখা যায়। এ সে কি করে পার হবে তা ভেবে পাচ্ছিল না।

প্রথম তার সিন কোথাও একটু আটকালো না। দশ মিনিট বিরতির পর পঞ্চম দৃশ্য শুরু থেকেই যেন আর এগোতে চায় না। শেষে এক জায়গায় এসে অমিয় স্টেজের পাশের আড়বাঁশের খুঁটি ধরে খুব আস্তে নিরুপায় গলায় বলল, 'আর পারছি না রজনী। আমি আর পারছি না। কত বাকি ?'

অভিনয়ের ভঙ্গীতে রজনী তার পিঠে হাত রেখে বলল, 'পারতেই হবে অমিয়। পারতেই হবে। এত লোক বসে আছে আমাদের জন্যে।

রজনী কাঁদছিল আর ডায়ালগ বলছিল। কোনরকমে কথার ভেতর দিয়ে সাঁতরে সাঁতরে গান গেয়ে যেতেই রজনীর চোখের জল আর বাধা মানল না। কাঁদছিল আর গাইছিল। হাজার পনের লোক নিশ্চুপ। অমিয় সেই খুঁটি ছেড়ে একটু একটু করে এগিয়ে এল। তারপর খাটে গিয়ে বসল। তাকে খানিকটা বিশ্রাম দিতে রজনী পুরো গানটা ফিরিয়ে ফিরিয়ে দু'বার গাইল।

শংকর টেম্পোরারি সাজঘরের সামনে বেঞ্চে বসে একদৃষ্টে স্টেজের অমিয়র দিকে তাকিয়ে ছিল। ছুটে গিয়ে ধরা দরকার কি না—তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

বেশী রাতে অমিয়কে গাড়ির পেছনের সিটে বসিয়ে রজনী বসল ড্রাইভারের পাশে। অন্ধকারে হেড-লাইটের আলোয় শালবন। একবার মোড় ঘোরার সময় আলোর ভেতরে বিরাট একটা পোড়ো বাড়ি পড়ল। এসব বাড়ি নাকি কোম্পানি আমলের সাহেব জমিদারদের। মাঠের ভেতর এমন পেল্লায় পেল্লায় বাড়ি পড়ে আছে তাও প্রায় একশো বছর।

লালু আস্তে চালাচ্ছিল। পাছে ঝাঁকুনিতে অমিয়র কষ্ট হয়। কলকাতা এগিয়ে আসছিল। ভোররাতে লীলা দোর খুলে দেখে তার দুয়ারে আর কেউ নয়—রজনী দাঁড়িয়ে।

—'বড় কেউ আছে ?'

—'কী ব্যাপার ? এত রাতে ?'

—'তোমার অমিয় অসুস্থ। তুমি আর আমি মিলে তো পারব না।' দাশদা এলেন। লালু ধরল। দোতলার ঘরে খাটে শুইয়ে দেওয়া মাত্র রজনী নেমে গেল। ডাক্তার নিয়ে ফিরে যখন এল—তখন রোদ উঠে গেছে।

ওষুধ-বিষুধ শুনে ডাক্তার বলল, 'ঠিক ঠিক ওষুধই দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত এগ্‌জারশন। বিশ্রাম দরকার।

লীলা এবার লজ্জা পেল। এতক্ষণ অমিয়র জন্যে যে ছোটাছুটি—সারারাত গাড়িতে বয়ে বয়ে আনা—সবই করেছে রজনী। সে প্রায় দর্শক মাত্র। ডাক্তার চলে যেতে জোর করে রজনীকে চেয়ারে বসিয়ে—লীলা বলল, 'একটু ফল কেটে দি—'

—'না। একটু চা খেলে হত।'

—'দিচ্ছি। আপনি বসুন।'

—'ও ঘরে যেন কোন গোলমাল না হয় দেখো।'

ভেবেছিল ভালভাবেই কথাবার্তা বলবে লীলা। কিন্তু রজনীর এ কথায় তার ভেতরটা বেঁকে দাঁড়াল। 'আপনার মত কি দেখতে পারব।'

রজনী কিছু বলল না। রাত জাগার একটা ক্লান্ত হাসি তার মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। চাটুকু নিমপাতার রসের মতই প্রায় এক ঢোকে খেয়ে নিয়ে উঠে গেল রজনী।

ছেলেমেয়েরা ঘুম থেকে উঠে ঘুমন্ত বাবাকে বিছানায় দেখে খুব কোনদিন অমিয়কে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেনি। এ-বাড়িতে [illegible] থেকে সবচেয়ে আগে ওঠে অমিয়। বড় মেয়ে আজ আর সাঁতারে গেল না। ওরা কলকল

করে বাবার কাছে যাচ্ছিল। লীলা যেতে দিল না। কোন গোলমাল নয়। শরীর খারাপ হয়ে ঘুমোচ্ছে—

ওরা তখন দর্শকের মত দরজায় দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখতে লাগল।

অনেকদিন অমিয়র জন্যে বিশেষ করে কিছু করার অভ্যেস নেই বলে—লীলা ঠিকই করতে পারল না—খারাপ শরীরের মানুষটার জন্যে কী করবে। চোখ ফেটে জল আসছিল। আমি ভুলে গেছি—এখন কী করতে হয়।

সন্ধ্যেবেলা একবার জেগেছিল অমিয়।

ঘুমন্ত অমিয়র ঘরে বসেই লীলা তার নিজের বাড়ির ঘরখানা দেখছিল। দক্ষিণের দেওয়ালে দামী স্টিরিওর জোড়া অ্যামপ্লিফায়ার বসানো। টেবিলের নিচে মিস্ত্রি এসে দাগ দিয়ে গেছে। এয়ার-কুলার বসানো হবে। ভরত হলের শ্রীরাম ট্রাস্টি তিনটে মামলা ঠুকেছে। এগারো জায়গায় কল শোয়ের অ্যাডভান্স নেওয়া আছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় গাড়িতে। ফেরেও গাড়িতে। সুজাতার জনপ্রিয়তা দেখে নকল সুজাতা বেরিয়েছে বাজারে। নীলকমল যাত্রা পার্টির সুজাতা। মূল গল্পের লেখক হাজার এক টাকায় কপিরাইট বেচে দিয়েছিলেন। এখন তিনিও মামলার হুমকি দিচ্ছেন। রয়ালিটির জন্যে বড় ছেলেকে পাঠাচ্ছেন ঘন ঘন। অবস্থা এখন ভয়ঙ্কর ঘোলাটে। তার মাঝে এই কাণ্ড।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ অমিয় চোখ খুললো। লীলা চুপ করে টুলে বসে ছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'কিছু বলবে?'

—'তোমরা সবাই কেমন আছো?'

—'আমাদের কথা আর ভেবো না। তুমি ভালো হয়ে ওঠো।'

—'আমার কি হয়েছে?'

—'কিছু হয়নি।'

—'অনু কোথায়? বিল্টু? ছোটোন?'

—'তিনজনেই স্কুলে।'

—'ভালো করেছো। রুগীর পাশে বসে থাকলে মন খারাপ হত। আজ কী বার বল তো।'

দিতে রজ 'বুধবার।'

শংকর 'ল তো সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় হাউসে শো আছে। আমার ডাবল্ যিনি তিনি তো ... উঠেই চিত্তির করবেন। কমলবাবুর এতদিনে ডায়ালগই মুখস্থ হল না।'

—'তার আর দোষ কি বল। একবারও কি স্টেজে উঠেছেন কমলবাবু! মিসেস দত্তর জায়গায় তবু নন্দনা চক্রবর্তী করেছে!'

—'আমার অসুখটা কি? ডাক্তার কি বলছে।'

—'অতশত জানি না। বলেছেন কমপ্লিট রেস্ট। তাই নিতে হবে তোমার।'

—'তাই এবার নেব লীলা। তুমি বলেছিলে—এ থিয়েটার নয়। সিকিউরিটি! আমি হাউসফুলের টিকিট বিক্রির টাকার লোভে এই অভিনয় করে চলেছি।'

—'তা তো বলিনি।'

—'তাই বলতে চেয়েছিলে। লজ্জায় বলতে পারোনি লীলা। তুমি হাঁ করলে আমি তোমার কথা বুঝি। কছু অন্যায় বলোনি। দর্শকধন্য হয়ে আমরা এখন বন্দী।'

—'আর কথা বলো না।'

—'জানি। আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল লীলা। টাকার চিন্তায় আমার পিঠ বেঁকে গেছে। আমি যে কবে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো জানি না। সবাই চায়। কেউ দেয় না কিছু। প্রয়োজনের শর্তগুলো ভরাট করতে রোজ আমি ঘুম থেকে উঠে খাটতে বেরোই। আমারও তো নিজের কিছু কিছু প্রয়োজন আছে। খানিকটা খোলা বাতাস। স্বস্তি। নতুন নাটক।'

—'তাহলে 'সুজাতা' তুলে দাও। সম্রাট ধরো।'

—'নাটকের মৃত্যু—নাটকের বকস অফিস।'

—'তাই তো তোমরা চাও।

—'একবার সেখানে পৌছেই মৃত্যুর শুরু লীলা। সুজাতা আমাদের দেনাদায়িক মিটিয়েছে। মামলায় উকিলের পয়সা দিচ্ছে। এতগুলো .মানুষের সংসার চালু রেখেছে।'

—'একসঙ্গে এত কথা বোলো না।'

—'সম্রাট করতে হলে নতুন কসটিউম দরকার। পিরিয়ড ড্রামা।' বলতে বলতে অমিয় আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কাল রাত থেকেই কড়া সিডেটিভ দিয়ে রেখেছে ডাক্তার। আধো ঘুম আধো-জাগরণে অমিয় দেখতে পেল কলামন্দিরে ভর্তি হলের সামনে তার 'সম্রাট' মঞ্চস্থ হয়েছে। সম্রাটের ইচ্ছাই আদেশ। কবি, সেনাপতি, মন্ত্রী, শ্রেষ্ঠী—সবাই তটস্থ। বিষপানে মৃত্যুকে বরণ করার আদেশ মেনে নিতে সম্রাট এবার কাকে বাছাই করবেন কেউ বলতে পারে না। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, গুপ্তপ্রেম, আত্মহত্যা সমাজের স্বাভাবিক ব্যাপার। দরবারে নটীর আগমন।

প্রতিটি দৃশ্য অমিয় দেখতে পাচ্ছিল। এক সময় সব ঝাপসা হয়ে গেল। সে তখন ঘুমের পূর্ণগ্রাসে।

লীলাকে এখন দিদিমণিদের অনেকেই হিংসে করে। কি ভাগ্য তার! হিষ্ট্রির টিচার স্নুলতা একদিন জানতে চেয়েছিল, 'অত টাকা দিয়ে কী করেন লীলাদি ?'

—'চিবিয়ে খাই।'

চিবিয়ে খাওয়ারই দশা। বেশ ছিলাম আগে। নিজেকেই বলল লীলা।

ডাক্তার যেমন বলেছিলেন—সে ধবনের রান্না পরদিন দুপুরে রজনীর বাড়ি থেকে ক্যারিয়ারে এল। লীলা ভেবেছিল রাগবে না। কিন্তু রাগে তার সাবা শরীর রি রি করতে লাগল। তবু সেই অবস্থাতেই রজনীব রান্না অমিয়কে বেড়ে দিতে হল। খেতে খেতে অমিয় প্রশংসা কবায় লীলা পরিষ্কার বলল, 'আমার রান্না নয়।'

—'সন্ধ্যা রেঁধেছে ?'

—'না। মিসেস দত্তর বাড়ি থেকে পাঠিয়েছেন।'

অমিয় মুখে তুলে একবাব লীলাব মুখখানা দেখে নিয়ে আবাব খেতে লাগল। এবার অমিয়র মুখে চাপা হাসি দেখে লীলা চুপ করে থাকতে পারলো না। 'ভাল লাগছে খেতে ?'

—'তা লাগছে।'

—'লাগবেই তো।'

—'শুধু শুধু রাগ কোরো না। তুমিও তো রাঁধতে পারো।'

—'দরকাব নেই আমার।'

—'ভুলে যেও না। মিসেস দত্তই কিন্তু আমাকে অনেক কষ্টে বাড়ি এনে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এটুকুব জন্যেও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারো।'

—'ওর সে উপকার আমি ভুলবো না। কিন্তু আমার স্বামীব জন্যে আমি থাকতে রান্না কবে পাঠানো। এ কি রকমের আদিখ্যেতা! আমি কি বেঁচে নেই ? তুমি বিপত্নীক ?'

—'ওভাবে দেখছো কেন। ডাক্তাববাবুব কথামতো রান্না করে পাঠিয়ে একজন মানুষ আরাম পেলে তোমার আপত্তি কোথায় ?'

—'সে তুমি বুঝবে কোত্থেকে! এখন তোমার শরীর ভালো নয়। এ নিয়ে আর কথার দরকার নেই।'

—'একজন যদি আমায় ভালোও বাসে তাতে তো তোমারই খুশী হওয়ার কথা।'

—'আমি সাধু নই। আমার হিংসে আছে। রাগ আছে।'

—'তাতে শুধু দুঃখই বাড়বে তোমার। আমার কিছু হবে না। রজনীরও নয়।'

—'জানি।' কান্না চাপতে পাশের ঘরে চলে গেল লীলা। সেখানে বিন্টু আর অনুকে দেখে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালো। পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আঁচলে চোখ মুছে নিল।

ঠিক তখনই হাউস থেকে শংকর এসে হাজির। চণ্ডীবাবুও এসেছেন। করিডরে দাঁড়িয়েই ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিল লীলা।

নন্দনার নাম শোনা যাচ্ছিল। কমলবাবুরও। রজনীরও।

অমিয়কে আস্তে কথা বলতে বলার জন্যে লীলাকে ওঘরে যেতে হল। শংকরের হাসি। চণ্ডীবাবুর নমস্কার। সব সামলে লীলা যখন অমিয়কে বলতে যাবে—'একটু আস্তে কথা বল—শুয়ে শুয়ে বল—'

ঠিক তখনই অমিয় গমগম করে বলে উঠলো, 'সুজাতা আমরা তুলে দেব।'

শংকর অবাক। অবাক চণ্ডীবাবুও। 'কেন?'

—'কারণ বলতে অনেকক্ষণ লাগবে। পঞ্চমুখের স্থায়ী সভাপতি হিসেবে এইটেই আমার মত।'

চণ্ডীবাবু বললেন—'তার মানে আদেশ। কিন্তু অমিয়—'

অমিয় কোন কথা না শুনে 'না' বোঝাবার জন্যে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

শংকর বলল—'আমার একটা কথা আছে দাদা! অন্যের জ্ঞান না। আমার নিজের কথা কিছু বলতে চাই।'

—'বল।'

—'তুমি তো জানো দাদা—আমি ছোটবেলায় মা হারিয়ে সৎ মায়ের সংসার টেনে আসছি। তারা আমায় ভীষণ ভালবাসে। ছোটবেলায় মুদিখানার দোকান করেছি। তখন আমাদের বাড়িতে ফি বেলায় আঠাশখানা পাত পড়ে। জ্যাঠা, কাকা, বাবা—তিনজনের সংসার একত্রে আছে। হপ্তার রেশন তুলতে ছিয়াশি টাকা লাগে। তাও তিনদিনে ফুরিয়ে যায়। জেঠিমা বেঁচে থাকতে এ-সংসার থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারবো না।'

—'আসতে বলেছে কে তোমাকে?'

—'আমার জ্যাঠতুতো বড়দা বিয়ে করে আলাদা হতে চেয়েছিল। বলেছিলাম —যেতে পারো—তবে একটি শর্তে। আমার মৃত্যুর আগে ফিরে আসতে পারবে না।'

—'এসব কথা আসছে কেন ?'

—'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' হাউসফুল হতেই বন্ধ করে দিলে।

—'ভুল করেছি কি ?'

—'না। কিন্তু—'

—'কিন্তু কি ?'

—'এবার যদি নাটক সেরকম না লাগে। তখন ?'

—'লাগবেই কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না। তবে আমরা সব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো।'

—'করলে চেষ্টা। তাও যদি না লাগে তখন ?'

—'সেরকম অবস্থা কি নতুন আমাদের কাছে শংকর ?'

—'তাই বলছিলাম এমন চালু জমাট নাটক—আরও হাজার নাইট চলে যাবে —তাই ফেলে দিয়ে নতুনে ঝাঁপ—

—'ঝাঁপ লোকে নতুনেই দেয় শংকর। অনেক তো নিশ্চিন্ত লাইন ছিল। তুমি কেন অভিনয়ে এলে ? দুর্গাদাস হবে ভেবেছিলে ?'

লীলা একবার বাধা দিল। 'আমি আর একটাও কথা বলতে দেব না তোমায়।'

—'আমরাই বলছি বৌদি। দাদা শুনুক। নন্দনা পাকাপাকি জয়েন করেছে যাত্রাদলে।'

—'করুক। শীতে রোদে আগান-বাগান ঘুরে বেড়াক। আমাদের 'সুজাতা' নাটকের কয়েক হাজার টাকার পাবলিসিটি পেল কাগজে কাগজে সেটা এবার ওর আখেরে কাজে দিল।'

—'কিন্তু আমাদের অভিনয়ের স্টিলের নেগিটিভ নিয়ে গেছে। সেই ছবিই কাগজে বেরিয়েছে।'

—'মামলা করবে ? কী লাভ হবে শংকর!'

—'আমরা কিন্তু ভালোবেসে ওর জন্যে অনেক করেছিলাম।'

—'আরো অনেকের জন্যে আমরা করব ভবিষ্যতে। তারাও হয়ত একদিন চলে যাবে। তাতেই বা কি ? তুমিও তো না বলে চলে যেতে পারো।'

—'তা হয় জানি দাদা। কিন্তু আমি তা পারবো না।'

এবার লীলা ওদের একরকম জোর করেই তুলে দিল। ওরা বেরোতেই এলো বিষ্ণু। তাকে অত সহজে তুলতে পারলো না লীলা।

সে নিজেই বলল, 'কথা বলব আমি। জবাব দেব আমি। তোমরা দুজনে শুনবে শুধু।'

অমিয় হেসে বলল, 'বেশ। শুরু কর। দেখি কেমন পারো।'

হল তো অর্ধেক ফাঁকা। তোমাদের কমলবাবু ডেইলি ডোবাচ্ছেন। জীবনের রোলে ওকে ডবল সিলেকট করে এতদিন মাইনে গুণে গ্যাছো কোন আক্কেলে ?

নিজেই জবাব দিল বিষ্ণু। সবাইকে পুষতে হয়। একটা নাটকের দলকে সব জায়গায় মারসিলেস হলে চলে না।

তা তো বুঝলাম। নিজে তো পড়েছো অসুখে। ধর যদি খারাপ কিছু হয়। এই মহিলার জন্যে কিছু রেখেছো ?

জবাব নিজেই দিল বিষ্ণু। না। নাটক করেছি শুধু। গ্রুপের জন্যে হাউস সাবিয়েছি। আলো কিনেছি। ফ্রিজ কিনেছি। বাইরে যাবার গাড়ি কিনেছি।

ভালো মন্দ হলে মহিলা এখন তিনটি বাচ্চা সমেত দাঁড়াবে কোথায় ? একটা বাড়ি কিনেছো ?

বিষ্ণুই গলা পালটে বলল—না। কিনিনি। আমাদের অভিনয়ের দল। কখনো ভাগ্য ভাল। কখনো খারাপ। তাই এই একশো তিরিশ টাকার ফ্ল্যাটই ভালো।

অমিয় লীলা একই সঙ্গে বিষ্ণুর এই নাটকে হোহো করে হেসে ফেললে।

—'তুমি এলে বড় ভালো লাগে বিষ্ণু।'

—'তা তো লাগবেই। এখন কবে উঠে দাঁড়াবে বল তো ?'

—'সামনে অনেক গোলমাল আছে, দাঁড়াতেই হবে।'

বিষ্ণু যেতে যেতে বিকেল এসে গেল।

অনেকদিন পরে লীলা সারা দিন-রাতের জন্যে অমিয়কে পেয়েছে। অনু বিল্টু ছোটোনেরও তাই। কিন্তু মানুষটা এমন অবস্থাতেই বাড়িতে ফিরে এল—যখন শুধু বিশ্রামই দরকার। তাই বাড়ির সবাই অমিয়কে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে দেখে যায়। অমিয়র খারাপ লাগে। খারাপ লাগে ওদেরও। কিন্তু উপায় নেই কোন।

ক'দিন টানা ঘুমিয়ে আয়নায় দেখলো, তার চোখের নিচের কালিপড়া ভাবটা আর নেই। লীলাকে ডেকে বলল—'এবার আমার কম মেক-আপেও চলে যাবে। কোন ক্লান্তি নেই মুখে।'

—'গোহালে ঢুকলে আবার দাগ পড়তে ক'দিন !'

অমিয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো লীলার দিকে। এই লীলা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ভেঙে তার নাটক দাঁড় করাতে চেয়েছে। আর এখন সেই লীলাই বলছে গোহাল ? এত রাগ ?

মুখে বলল, 'রজনীকে একদিন খেতে বল আমাদের বাড়িতে। এত এত রান্না করে পাঠালো এতদিন। তোমার বিন্টু তো রজনীর রান্না স্যুপ পেলে আর কিছুই খেতে চাইবে না।'

—'সে তো তোমার বেলাতেও খাটে।'

—'আমি রুগী মানুষ। আমি তো স্যুপ খাবোই। কিন্তু বিন্টু ?'

—'নতুন রান্না হলেই যে কোন মানুষের গোড়ায় ভাল লাগে।'

অমিয় আর এগোলো না। ঈর্ষা মানুষকে অনেক সময় সুন্দর করে। এখন লীলাকে বেশ দেখতে লাগছে। রজনী আর আসেনি। সেদ্ধ স্যুপ নিয়মিত পাঠিয়ে যাচ্ছে। অমিয় বিছানায় বসেই হাউসের খবর নিচ্ছে। বিজ্ঞাপনের দুখানা কপি লিখে পাঠিয়েছে এরই ভেতর।

খাটে বসে বসে অমিয় ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল। কদিনের দাড়ি গালে। একদম সম্রাটের মেকাপ নিয়ে খাটে বসে আছে মনে হবে। সম্রাট পিরিয়ড ড্রামা হলেও তাতে আসলে অমিয় যেকোন অন্ধকার যুগের কথা তুলে ধরেছে ? যখন রাজশক্তি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে—তখনকার কথা। সম্রাট কবি। সম্রাট মৃত্যু দেখতে ভালবাসেন। ভালবাসেন—তাঁর ইচ্ছায় মন্ত্রিবর্গ এক পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকুক। সাম্রাজ্যের অবস্থা অনিশ্চিত। চারদিকে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠেছে। তাতে সম্রাটের কোন খেয়ালই নেই। আবার ভালো করে আয়নায় তাকালো অমিয়।

আয়নায় অমিয় তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে খাটের ওপরকার অমিয়কে পরিষ্কার বলল, 'আপনি তো আজকাল গাড়ির পেছনের সিটে বসেন ?'

—'সামনে বসলে গরম লাগে।'

—'সেকথা বলছি না, পায়ে হাঁটেন কতক্ষণ ?'

—'এই খাওয়া-দাওয়ার পর হাউসের গ্রীনরুমে যতটা পারি পায়চারি করি।'

—'সেকথা বলছি না। ট্রামে-বাসে ওঠা হয় কি আজকাল ?'

—'না। একদম না। সময় কোথায় ?'

—'ফুটপাথ ধরে হাঁটা হয় ?'

—'সময় কোথায় ? কলশো। হাউসের শো মাসে অন্তত কুড়িটা।'

—'আপনার নাটক কাদের জন্যে ?'

—'আমার আপনার মত সাধারণ মানুষের জন্যে।'

—'আপনি আমি সাধারণ মানুষ নই। যারা ডেলিপ্যাসেঞ্জার, ছোট ব্যবসায়ী, টিচার, চাকুরে, ছাত্র—তাদের সঙ্গে আপনাব আজকাল যোগাযোগ কোথায় ? আপনি তো গাড়ি চড়ে হুস করে চলে যান। এদের কার সঙ্গে মেশেন আপনি ?'

—'তা অবশ্য হয় না।' খাটের অমিয় আমতা আমতা করে আয়নায় অমিয়কে বলল। 'তবে যে-কোন শিল্পী একটা সুদূর বোধ দিয়ে সবকিছু ধরে নিতে পারে।'

—'তা হয় না অমিয়। জীবনযাপনের পদ্ধতিই মানুষের শিল্পে উঠে আসে। শিল্পের জন্য জীবনে শরীরের এক ইঞ্চি পোড়ালে তার ছাইটুকু শিল্পে উঠে আসে। এখানে সুদূর বোধি—কিংবা রিমোট সেন্সের কোন দাম নেই অমিয়।'

—'তুমি কে ?'

আয়নায় অমিয় বলল, 'আমি তোমার আগেকাব আমি।'

—'তাহলে আমি কে ?'

—'তুমি হলে গিয়ে এখনকার আমি। তুমি পথভ্রান্ত পথিক।'

দুই সময়কার অমিয় এসে এখনকার অমিয়র মাথার ভেতরটা গুলিয়ে দিল। অনেকক্ষণ সিধে হয়ে বসে ছিল বিছানায়। শুয়ে শুয়েই ডাকলো, 'লীলা—আমার দাড়ি কামাবার সেটটা দিও। ডেবরা থেকে ফেরার পর অনেকদিন দাড়ি কামানো হয়নি।' অমিয়র বিশ্বাস হল দাড়ি কামালেই সে আগেকার অমিয় হয়ে যাবে।

॥ বোল ॥

কিছুকাল হল বিষ্ণুর দিদি নাগপুর থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছে। আসলে জামাইবাবু বদলি হয়ে এসেছেন। কিন্তু সংসারে দিদিরই দাপট বেশি। তাই বিষ্ণু বলে, দিদি বদলি হয়ে এসেছে। অনেক বছর পর। একটি মাত্র মেয়ে দিদির। তারও বিয়ে হয়ে গেছে। দিদির নেশা গান, পান আর মাঝে মধ্যে ছোট এক বোতল রাম কিংবা হুইস্কি। তৎসহযোগে হারমোনিয়াম বাগিয়ে এক পা ছড়িয়ে দিয়ে ঠুংরি। জামাইবাবু ভারত সরকারের সবচেয়ে বড় এক প্রতিষ্ঠানের নাম্বার টু। আসলে নাম্বার ওয়ান হল গিয়ে বিষ্ণুর দিদি। বাড়িতে তিরিশ বছরের ওপর ক্ল্যাসিকালে রেওয়াজ।

বিষ্ণু দুপুরের দিকে দুটি ছোট বোতল নিয়ে গিয়ে হাজির। ভাইবোনে ভাগ করে খেল। বিষ্ণুর সমঝদারি পেয়ে তার দিদি অগুন্তি গান গাইল। জমাট ভরাট গলা। বেলভেডিয়ারের ফাঁকা ফ্ল্যাটে ভাইবোনের মস্ত আসর।

—'দিদি, তুই রেডিওতে গাইবি?'

—'ভাগ্। ও বাজে জিনিস। দু লাইন গাইবে তার আবার নাম, দিনক্ষণ ছাপা হয়।'

—'তবে কনফারেন্সে গাও। এতদিন পরে কলকাতায় এলে।'

—'তুই আবার গানের বুঝিস কি। কোথায় গাইবো সে আমি ঠিক করবো। দে আরেক পেগ দে।'

—'তোমার পাঁইট শেষ। তবে নাও আমার থেকে। এইটুকুই আছে। সবটুকু নিও না। আমার জন্যে রেখো একটু।'

—'তুই কি করবি ছেলেমানুষ। দাঁড়া। একখানা দাদরার কাজ শোন।'

বিষ্ণুর গান শোনা কান। সে বুঝলো আজকের এই ফাঁকা ফ্ল্যাটের আসরে সে অসম্ভব ভালো গান শুনছে। তার দিদি আজ মেজাজে আছে।

এক সময় ড্রাইভার এসে সেলাম দিল। জামাইবাবু দিদিকে গঙ্গার হাওয়া খাওয়াবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেয় রোজ বিকেলে। দিদি ঘুরে ফিরে সন্ধ্যের দিকে জামাইবাবুকে নিয়ে ফেরে। জামাইবাবুর যা কিছু নেশা—ওই দিদি আর মোটর-গাড়ি। আর মাঝে মাঝে দিল্লি যায় বড় বড় চাকরির ইণ্টারভিউ বোর্ডে বসতে।

সন্ধ্যের দিকে গাইতে গাইতে দিদির চোখে জল এসে গেল। কেন জল—ভাই-বোনের কেউ জানে না। দিদি কোন কোন গান ভালো করে গাইতে গাইতে কেঁদে ফেলে এক-এক সময়।

বিষ্ণু বলল, 'চল দিদি। গঙ্গার ঘাট থেকে ঘুরে আসি।'

দুজনে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যে করে ফেলল। বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা বিখ্যাত হাওয়া তখন ময়দান চষে ফেলছে। দিদি গাড়ির পেছনের সিটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। 'বিষ্ণু, আমার পেট ব্যথা করছে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। দরজা দুটো ড্রাইভারকে খুলে রাখতে বল। গায়ে বাতাস লাগুক।'

—'কেন যে ড্রিংকসের সঙ্গে অতটা জর্দাপান খাও? আজ তোমার শরীর ভাল থাকলে রাণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম। কী সুন্দর টপ্পা গায়।'

বিষ্ণুর দিদি কোন জবাব দিল না। কথা বলার অবস্থা ছিল না তার। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। সেই সঙ্গে গাইবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। শরীর বিকল। উপরন্তু খোলা জায়গা। আজ রামটা খুব খাঁটি ছিল। বিষ্ণুর জামাই-বাবু মাস কাবারি বাজারের সঙ্গে তার দিদির জন্য তিনটে বড় বোতল রাম এনে থাকেন।

গঙ্গার গা ঘেঁষে খোলা হাওয়া খাচ্ছে অনেকে। ইভনিং ওয়াকের কিছু বৃদ্ধও আছে। আর আছে পান, ভেলপুরি, আইসক্রিম, মালাইয়ের মোবাইল ফিরি-ওয়ালা। সঙ্গে তাদের গ্যাসের কুপি সেই আলো ঘিরে অনেক কালো কালো মাথা।

ডিমসেদ্ধর আশায় বিষ্ণু বেরিয়ে পড়ল।

মালাইয়ের বড় বড় হাঁড়ির পাশে ডিমের তোলা উনুন খুঁজতে এসে বিষ্ণু মালাইয়ের বিখ্যাত খদ্দের অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেল। সঙ্গে রজনী দত্ত।

—'আবার মালাই খাচ্ছো? মালাই না তোমার বারণ অমিয়।'

—'দ্যাখো তো বিষ্ণু। আমিও বারণ করেছি।'

বিষ্ণু রজনীকে দেখল। সান্ধ্যভ্রমণের হালকা পোশাক। আইসক্রিম, মালাই, লুচি, মাংস—এসব দেখলে অমিয়র জ্ঞান থাকে না। বেশি খাওয়ার কথা তুললে বলবে—'ভাই, আমার ইঞ্জিনটা তোমাদের চেয়ে কত বড়। তার কয়লাও তো বেশি লাগবে।'

অমিয় চোখ না তুলে গম্ভীর গলায় বলল, 'ক'টা খাবে? এখানে তো ডিমসেদ্ধ পাওয়া যায় না।' বলতে বলতে অমিয় পকেট থেকে টাকা বের করল। টাকা মানে দশ টাকার নোটের পিন-করা গোছা।

—'সোজা হাউস থেকে এসেছো।'

—'হুঁ। বুঝলে কি করে?'

—'নোটের গোছা দেখলেই বোঝা যায়।'

—'আবার হাউসফুল যাচ্ছে।'

—'তুমি জয়েন করলে এ আর নতুন কথা কি!'

দোকানী দুটো মালাই শালপাতায় গুছিয়ে দিচ্ছিল। বিষ্ণু দত্ত হা হা করে উঠলো। 'দুটোয় তো হবে না।'

রজনী হাসলো। 'তুমিও মালাই দেখলে মাথা ঠিক রাখতে পারো না!'

—'সঙ্গে আমার দিদি আছেন। তার জন্যে দুটো দাও।'

—'দিদি?' রজনী অবাক হয়ে তাকালো।

—'হ্যাঁ। ক'মাস হল বদলি হয়ে এসেছেন জামাইবাবু। কিন্তু দিদি এখন উঠে বসতে পারবে কিনা জানি না।'

অমিয়, রজনী দুজনই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'তোমার যে দিদি আছেন—সেকথা তো কোন দিন বলনি।'

—'দিদি আছেন মানে! রীতিমত দাপটে আছেন। দেখলেই বুঝবে।' গাড়ির কাছে হেঁটে যেতে যেতে বিষ্ণু দিদির কথা সবিস্তারে বলল। কিন্তু গাড়িতে পৌঁছে দিদির ঘুম ভাঙাতে পারলো না। অগত্যা—চারটি মালাই একাই খেতে হল বিষ্ণুকে।

যাবার সময় রজনী বলল, 'আহারে! এত ভাল গান করেন। আলাপ হল না।'

বিষ্ণু সাবধানে পেছনের দুই দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারের পাশে বসলো। 'সাহেবের অফিসে চল।'

সাজানো গঙ্গার ঘাটে তখন রজনী আর অমিয় এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছে। বিষ্ণু মনে মনে বলল, আবার হাউসফুল। আবার ভরত হলের সামনে ভিড়। টিকিট ব্ল্যাক। সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি। অমিয় ফিরে এসেছে।

দিনে কলকাতা গরমে চিড়বিড় করে। সেই কলকাতাই রাতে আরামের চেহারা নেয়। মারকারি ল্যাম্পের দিনের মত আলো। গঙ্গায় আলো-আঁধারিতে নৌকোর সংসারে মাঝারা রান্না চাপিয়েছে। ওপাড়ে হাওড়া। অমিয় আস্তে রজনীর হাতে হাত রাখলো। এ হাত তার কাছে নতুন নয়। সপ্তাহে পাঁচটি শো। দর্শক সাক্ষী রেখে এ হাত তাকে ধরতে হয়। এ শরীর তাকে জড়াতে হয়।

একবার রজনীকে ঠাট্টা করে অমিয় সিগারেট অফার করেছিল। রজনী হেসে বলেছিল, 'আজ তো নয়।'

—'কেন?'

—'বেস্পতি, শনি, রবিবার শুধু সিগারেট খাই।'

হোহো করে হেসে উঠেছিল সবাই। ওই তিন দিন পাঁচটি শোয়ে রজনীকে স্টেজের ওপর বসে সিগারেট ধরাতে হয়। সুজাতা হিসাবে সিগারেট ধরায় রজনী। তখন জীবন হিসেবে অমিয় মদের গ্লাস নিয়ে স্টেজে বসে।

—'জানো রজনী। আজকাল আমাকে গ্রুপ থিয়েটারের লোকজনেরা আউট-কাস্ট বানিয়েছে।'

—'বানাবেই। কারণ, পঙ্কমুখের যে সব নাইট হাউসফুল যায়। সফল হলেই আমাদের দেশে ফেউ লাগে।'

—'আমাদের নাটক অশ্লীল। এইটে আমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় শ্লোগান।'

—'অশ্লীল হলে অডিয়েন্স হিন্দী ছবির মত আমাদের নাটক দেখে সিটি দেয় না কেন? নাটকের শেষে গম্ভীর হয়ে যায় কেন? বউকে নিয়ে কোন দর্শক তো অশ্লীলতা দেখতে আসবে না। তা আসে কেন?'

—'সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় রজনী। হুইসপার ক্যামপেনের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না।'

—'আমাদের নাটক তো হাজার রজনীও চলতে পারে।'

—'তার চেয়ে বেশিও চলতে পারে।'

—'বাইরে কলশোয়ে সারা রাত ধরে দশ-বিশ হাজার মানুষ চুপ করে আমাদের নাটক দেখে। সে কি অশ্লীলতার জন্যে?'

—'সে কথা কাকে বলবো রজনী!'

সামনে গঙ্গার কাল জল অন্ধকারে আরও কাল হয়ে পড়ে আছে।

অমিয় বলতে লাগল, 'দেশের মানুষ আগে বিচার করতো। মন্দ হলে নিন্দা। ভালো হলে প্রশংসা। এখন সবাই চুপ করে লক্ষ্য করে। খারাপ করে দেওয়ার সুযোগ খোঁজে।

—'আমরা কিন্তু কারো ক্ষতি চাইনি অমিয়। সেইটে আমাদের দোষ।'

—'রজনী, আরো একটা দোষ করেছি আমরা। তুমি আর আমি।'

—'রজনী তাকিয়ে উঠতে অমিয় বলল, 'আমাদের কারোরই বিয়ে করা ঠিক হয়নি।'

—'তুমি একথা বলছো কেন অমিয় ? তোমার তো সুখের সংসার।'

—'সুখ এক সময় কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা অন্ত রাতের পাখি। অন্য দিনের পাখি।'

—'তুমিই তো বলে থাকো অমিয়—পূর্ণ মানুষের মত জীবনের সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে না গেলে অভিনয় পুরোপুরি জানা যায় না। জীবন সবচেয়ে বড় মাস্টারমশাই।'

—'তাইতো এতদিন জানতাম।'

খানিকক্ষণ দুজনের কেউই কথা বলতে পারলো না। যেমন এলোমেলো পায়ে ওরা গঙ্গার গায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—তেমনি পায়েই ক্যালকাটা বিউটিফিকেশনের ধাঁধানো আলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে গাড়িতে উঠলো।

স্টিয়ারিংয়ে বসেই অমিয় অল্প সময়ের ভেতর ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে ফেলল।

—'এ আমরা কোনদিকে যাচ্ছি ?'

কোন জবাব দিল না অমিয়। জ্যোৎস্নার ময়ামে রাস্তাটা পেছল হয়েই ছিল। তারপর অমিয়র হাতে পড়ে গাড়িটা ফাঁকা রাস্তা গিলতে গিলতে একদম ডায়মণ্ড-হারবার টুরিস্ট লজে গিয়ে হাজির হল।

—'এ কি করলে অমিয় ! লীলা ভাববে।'

—'তোমার জন্যে কেউ ভাববে না।'

—'আমার ছেলেমেয়েরা ছাড়া আর কে ভাবে বল।'

—'কেন ? শশাঙ্কবাবু ?'

—'সে তো কবে থেকে উধাও। মাঝে মধ্যে আসে শুনেছি। আমার সঙ্গে আর দেখা হয় না।'

স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে লজে ঘর পাওয়া গেল। একদম নদীর মুখোমুখি। ক্যান্টিনে খাবার বলতে কিছু মাছভাজা ছিল। তাই সই। বার বন্ধ। এক বোতল বিয়ার পাওয়া গেল না। লজ এক রকম ফাঁকা। প্রায় ভুতুড়ে বাড়ির চেহারা।

অমিয় বলল, 'মনে কর আমাদের অখণ্ড ছুটি। কোন মামলা নেই ঘাড়ে। রিহার্সেল নেই। আমরা নীলগিরিতে বেড়াতে এসেছি'—

—'এত মনে করার দরকার নেই। আমি তোমায় একখানা গান দিতে পারি অমিয়।'

—'বাঃ! সুন্দর কথাটা বলেছো । গান দিতে পারো। একখানা গান। আচ্ছা? বিষ্ণু খুব গান ভালোবাসে তাই না?'

—'ভীষণ।'

—'তোমার গলায় ও বার বার 'কবিয়ালে'র গান শুনতে চায়। আর শুনতে চায় টপ্পা।

—'টপ্পা আমি বেশি জানি না। অল্পদিন শিখেছিলাম।'

খোলা করিডরে বসে উল্টোদিকের নদীর প্রায় মাঝ বরাবর দেখা যাচ্ছিল। বাকিটা জ্যোৎস্না না কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে তা এখান থেকে বোঝার কোন উপায় নেই।

—'রজনী। তুমি একখানা গান দিতে চেয়েছিলে। আজ তুমি তোমাকে দাও।'

কোন কথা না বলে রজনী গুনগুন করে সুর তুলে নিল গলায়। ফাঁকা করিডর সে-সুরে ভরে গেল। তারপর রজনী তাতে সুবিধামত কথা বসাতে লাগলো। নিশ্চয় আগেকার কোন গান। কী সুন্দর বাণী। গানও লিখে গেছে বাঙালীরা। গিরীশ, ক্ষীরোদ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ –

খোলা গলার গানে সারাটা লজ গমগম করছিল। অন্ধকার ক্যান্টিন থেকে একটা পোষা বেড়াল বেরিয়ে এসে চুপ করে ওদের দেখছিল।

গান থামতেই অমিয় বলল, 'আমি আমার ছেলেমেয়েদের ভালবাসি। রবিবার সকালে ওদের নিয়ে কাটাই। তখন কেউ ফোন করলে আমার ভীষণ বিরক্ত লাগে।'

—'আমার ছেলেমেয়েরা আজকাল আমার দিকে এমন তাকায়—আমি ওদের চোখে প্রশ্ন দেখতে পাই।'

অমিয়কে চুপ করে থাকতে দেখে রজনী আবার বলল, 'ওরা যেন বলতে চায় —মা তোমার জন্যেই—মা তোমার জন্যেই—'

—'মানে?'

—'তোমার জন্যেই বাবা বাড়ি থাকে না! আশ্চর্য! মা হয়ে ওদের বলি কি করে—ওদের বাবা কীরকম লোক। শুধু—'

—'শুধু—'

—'আমার বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে আমার সুখদুঃখ নিয়ে কথা বলে। সেদিন ব্যাসন দিয়ে আমার মাথা ঘষে দিল। আমার দুঃখ ও বোঝে। বাকিগুলোর মন বিষিয়ে দিয়েছে শশাঙ্ক।'

—'তুমি তো শশাঙ্কর জন্তে চিন্তা করো।'

—'করতাম একসময়। এখন ছেড়ে দিয়েছি। ও আমার আয়ের ওপর বাঁচতে ভালবাসে। কিন্তু আমাকে উঠে দাঁড়াতে দেখলেই পেছন থেকে টেনে ধরতে ভালবাসে। আমাকে বোধহয় হিংসেও করে।'

—'সন্দেহ করে তোমাকে।'

—'জানি।'

—'আমাকে জড়িয়ে সন্দেহ করে তোমাকে রজনী। সেই সন্দেহে জলেপুড়ে গিয়ে এলোপাথাড়ি কাণ্ড করে বসে।'

—'জানি। কিন্তু করার কিছু নেই। আজকাল ওর ওপর আমার কোন রাগ নেই। ঘেন্নাও নেই অমিয়। আমি ধরেই নিয়েছি—শশাঙ্ক ওরকম।'

—'তোমার চেয়ে আমার প্রবলেম অনেক বড় রজনী। লীলা নিজে চাকরি করে। এতকাল আমার নাটকে শরীর দিয়ে, পয়সা দিয়ে আমাকে তাজা রাখতে চেয়েছে। আর এখন!'

রজনীই বলে দিল। 'এখন আমার সঙ্গে জড়িয়ে তোমাকে ভেবে নিয়ে কষ্ট পায়। ভুল করে। পাগলামি করে। হয়ত অপমানও করে তোমায়—'

—'হ্যাঁ। আমার মুশকিল—আমি লীলার কাছে কৃতজ্ঞ—'

—'ভালবাসো না লীলাকে?'

—'বাসি রজনী। তোমাকেও বাসি।'

—'আমার কথা বাদ দাও। আমার মায়ের কথা ভেবে ছাখো। আমার দিকে তাকাও। আমাদের দুজনের ভাগ্যটাই অদ্ভুত। মা বড়বাবুর জন্তে গয়না বন্ধক দিয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন বড়বাবুর পরের ভাই—বাবাকে বিয়ে করে। বাবা অনেকটা তোমার মত ছিলেন। লম্বা, কঠিন, সুন্দর, মনখোলা—'

—'এতগুলো অ্যাডজেকটিভ একসঙ্গে আমাকে দিও না।'

—'তোমার মধ্যে কিন্তু সত্যি আমার বাবার ভাব আছে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই অমিয়।'

—'তুমি আমায় ভালবাসো না রজনী।'

—'বাসি। কিন্তু এ তো প্রথম বয়সের ভালবাসা নয়। মেয়েদের ভালোবাসার সঙ্গে শরীরটা থেকে যায়। দুঃখ হয় খুব। তোমার কাছে যখন এলাম—তখন এ শরীরটা পুরনো হয়ে গেল। আমার আর দেওয়ার কিছু নেই। এমন সময়েই দেখা হল তোমার সঙ্গে!'

—'অনেক দিয়েছো তুমি আমায়।'

—'কিচ্ছু না অমিয়। আরেকটু আগে দেখা হলে কত দিতে পারতুম।'

—'স্টেজে তুমি আমায় জাগিয়ে তোলো রজনী। আমার ভেতর থেকে আরেক জন অমিয় বেরিয়ে এসে তোমার সঙ্গে লড়াই করে। বেশির ভাগ দিনই আমি স্টেজে তোমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারি না।'

এখন করিডরে ভরা পূর্ণিমা। ভরা অমাবস্যা হলেও কোন অসুবিধা ছিল না। পাশাপাশি বসে থাকা দুজনের মাঝখানে অদৃশ্য বাতাসে যা ভাসছিল—তার নাম কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, আরো অনেক কিছু। এ জিনিসগুলোও চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য। ফিল করা যায় শুধু। রজনী জানে না—এর চেয়ে ভালোবাসা ব্যাপারটা আরও বড় কিছু কি না।

আরও অনেক রাতে নদীর বুক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস পিচ রাস্তা পেরিয়ে করিডরে এসে ঢুকতে লাগলো। ওরা দুজন তখন আচ্ছন্নের মত ডবল সাইজের ঘরে ঢুকে ডানলপপিলোতে এলিয়ে পড়ল। একবারও একজনেরও মনে এল না—এখন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলে গা গরম হয়ে যাবে। ভাল লাগবে। বরঞ্চ ঘুম সারাটা ঘরে একচ্ছত্রভাবে শাসন করতে লাগল।

সকালবেলা বেড টি সেরে তৈরি হতে হতে আরও ঘণ্টাখানেক গেল। তারপর রওনা হওয়ার কথা। দুজনই রোদ জোরালো হওয়ার আগে কলকাতা পৌঁছতে চায়। কিন্তু নদীর পাড়ে জেলেদের কাছে টাটকা মাছ কিনতে গিয়ে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। দুজনই যে যার বাড়ির লোকের জন্যে খুব মন দিয়ে মাছ কিনলো। বেশ দরাদরি করে।

রওনা হওয়ার মুখে রজনী হেসে ফেলল। 'আমাদের যে দুটো আলাদা সংসার আছে—সে আমাদের মাছ কেনা দেখেই জেলেরা বুঝেছে।'

—'তা বলে ভাইবোন ভাবেনি নিশ্চয় আমাদের।'

—'বন্ধু ভাবতে পারে অমিয়।'

—'এত ভোরে বন্ধুরা ডায়মণ্ডহারবার পৌঁছতে পারে না। ওরা আসলে ভেবে ভেবেও কোন সম্পর্ক বের করতে পারেনি।'

—'আমরাই কি পেরেছি অমিয়?'

—'সত্যি! তুমি আমার কে?'

—'আমিই বা তোমার কে অমিয়?'

—'আমি তো বলতে পারবো না।'

—'আমিও পারব না অমিয়।'

—'শশাঙ্কবাবু থাকলে ফস করে বলে দিতেন—পিরীতের মানুষ।'

—'লীলাও হয়তো ওরকম কিছু একটা ভাবে।'

—'অতটা না হলেও কাছাকাছি রজনী। আজ ফিরলে একটা কাণ্ডও বাধিয়ে দিতে পারে।'

—'সত্যি কথা বলবে।'

—'এসব সময় আমি চিরটা কাল সবল সত্য কথা বলি। না বললে জানি—আরও জটিল হয়ে ওঠে সব কিছু।'

বাড়ি ফিরতেই লীলা কিন্তু সব কিছু জটিল করে দিল। অতগুলো মাছ নিয়ে বেলা দশটা বাজতে পাঁচ মিনিটে অমিয় গিয়ে হাজির হল।

খুশী হওয়া দূরে থাক—সারা মুখে অনিচ্ছুকের ভঙ্গি। আস্তে বলল, 'কাল রাতে বারোটায় হাউস থেকে চণ্ডীবাবুব ফোন এসেছিল। কাউন্টারফয়েল নিয়ে তোমার জন্যে ওরা তখনো বসে।'

—'আমি তো তখন ডায়মণ্ডহারবার পৌঁছে গেছি।'

—'আমাব তো জানার কথা নয়। জানলে আজ সকালেও জায়গাটার কথা বলতে পারতাম।'

—'সকাল? সকালেও চণ্ডীদা ফোন করেছিল?'

—'না। মিসেস দত্তেব বড়ছেলেব ফোন এসেছিল। মা কাল রাতে ফেবেনি—'

—'কি বললে?'

—'আমি কিছু জানিনে। কি বলব? শুনছি তো এখন।'

—'তবু কি বললে?'

—'মিস্টার ব্যানার্জিও ফেরেনি। ফিরলে ফোন করব।'

—'করার দরকার নেই। আমরা একসঙ্গেই ফিরেছি। রজনীও অনেক মাছ কিনেছে ওর ছেলেমেয়েদের জন্যে।'

—'তোমরা মাছ কিনতে গিয়েছিলে!'

—'না তো। কেন?'

—'ভাবলুম ভোররাতে সস্তায় কিনতে রাত থাকতে চলে গিয়েছো!'

অমু, বিল্টু, ছোটোন বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে দেখলো, বাবা একঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মা আরেক ঘরে কুঁকড়ে মুসড়ে ঘুমিয়ে আছে। করিডরে একটা বড় ভেটকি শুকিয়ে কাঠ। তার ওপর লাল পিঁপড়ের লাইন পড়েছে। তোলা কাজের সন্ধ্যা মেয়েটি তখনো এসে পৌঁছয়নি।

ছেলেমেয়েদের পায়ের দুপদাপে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। ওদের সামনে দুজনই স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল। সন্ধ্যা এসে পড়াতে মাছ কোটা, ভাজা—কিছুই আর থেমে থাকলো না।

সন্ধ্যের দিকে আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল অমিয়। শুয়ে শুয়ে দোতলার জানালা দিয়ে নিচের রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। তার গায়ে করাতকলের মোটা মোটা কাঠের গোলাই টাল দেওয়া। তারপরেই শহর কলকাতার প্রান্তিক খাল। সে জল পচে গিয়ে নীল হয়ে আছে কতকাল।

ওরা এখন হইচই করে মাছভাজা খাচ্ছে। অমিয় একসময় আলতা, কালির ব্যবসায় ফেল মেরে সারাদিনে পাঁউরুটি আর টিউবয়েলের জল দিয়ে খিদে মিটিয়েছে। এই শোবার ঘরের দেওয়াল কেটে এয়ারকুলার বসানো হবে। শংকর বলেছিল, 'দাদা। মাস গেলে আটখানা একশো টাকার নোট দিদির হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। অভিমানে রজনী ফস করে পুরী চলে যেতে পারে। সবই চলছে, সুজাতা নাটকের হাউসফুলের ওপর।

অমিয় পরিষ্কার জানে—সে এখন একটি প্রতিষ্ঠান। নতুন করে ভাবতে গেলে সব ভেঙে পড়বে। নতুন নাটকের ঝুঁকি নিতে কেউ রাজী হবে না। সবাই চায় নিরাপদে থাকি। বাড়ি ভাড়া রেশন হাউসফুল একস্ট্রা চেয়ার নিয়মিত পাবলিসিটি কলশো। কেউ চায় না, এই একই অভিনয়ের একঘেয়েমি ভেঙে ফেলে দিয়ে আরও কঠিন কিছুর জন্যে প্রাণপাত করি।

তা করতে হলে সবার আগে বাহুল্য বর্জন করা দরকার। কী কী বাদ দেওয়া যায়। ভালো বিছানা। দু'খানা মোটরগাড়ি। ছোট ছোট অনেকগুলো আরসি। বেহিসেবী অভ্যেসগুলো।

আয়ের ভেতর বাস করতে শেখা দরকার। দরকার পরিশ্রম করে পথ খুঁজে পাওয়া। আগেকার মত ধাক্কা খেতে খেতে।

এখন লীলাকে সবিস্তারে যদি বোঝাতে বসে—আমি আর রজনী খুব বন্ধু।

আমরা কাল রাতে ক্লান্ত শরীরে পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙেছে সেই ভোরে। তাহলে লীলা মুখিয়ে উঠে বলবে—কৈফিয়ত কে চেয়েছে তোমার কাছে ?

তার চেয়ে এই ভাল। মনে মনে লীলা এখন অদৃশ্য সব শক্তির সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। ওর একনম্বর শত্রুর নাম : সন্দেহ। অথচ ও কোনদিন এরকম ছিল না।

আচমকাই বেরিয়ে পড়ল অমিয়। পাঁচমাথার মোড় দিয়ে হাঁটতে ভীষণ ভাল লাগতে লাগল। সে নিজে তো আসলে রাস্তার লোক। এই অল্পদিনে নাটক লেগে গিয়ে চারদিকে অনেক রকমের বে-নিয়ম শুরু হয়ে গেছে।

বাইরের লোক এখন সোজা তার সঙ্গে এসে দেখা করতে পারে না। আগে শংকরের সঙ্গে এসে দেখা করতে হয়। শংকর উপযুক্ত মনে করলে দু'একজনকে তার কাছে পাঠায়। তারা গ্রীনরুমের শেষদিককার বড় পর্দা তুলে তবে তার কাছে আসতে পারে। তাও অনেকের মুখের দিকে না তাকিয়েই কথা বলে অমিয়। তাতে গুরুত্ব বাড়ে। এ জিনিসটা অভ্যেস করে রপ্ত করতে হয়েছে তাকে। কিছুদিন হল এক আর্টিস্ট এসে তার পোর্ট্রেট আঁকছে। সেজন্যে গম্ভীর হয়ে বসে সিটিং দিতে হয় মাঝে মাঝে। নিজের ঠোঁটেই অস্ফুটে বেরিয়ে এল—অবনকসাস !

হাঁটতে হাঁটতে 'ভরত' হলে পৌঁছে দেখলো কেউ নেই। দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিতেই খচ করে লাগল অমিয়র। আমি তাহলে ক'মাসের ভেতর 'মালিক' হয়ে গেছি। ছিঃ! ছিঃ !! দারোয়ান অবাক হয়েছিল। বলল, 'গাড়ি কোথায় বড়সাব ?'

কোন উত্তর না দিয়ে অমিয় হন হন করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। অমিয় আর রজনীর গোছালো হাতে পড়ে ভেতরকার হতশ্রী লনে এখন দোপাটি ফুটেছে। ঘন সবুজ মো করা দূর্বা ঢাকা ছোট জমিটুকু চোখ কেড়ে নেয়। সাজঘরের দরজাটা খোলা। আজ কোন শো নেই।

যা ভেবেছিল। চণ্ডীদা একা রয়েছে। কিন্তু একা একা কি করছে ? মানুষটা অনেককাল হল অমিয়র সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। সেই 'অথ মালতী বৃত্তান্ত কথা' অভিনয়ের সময় থেকে। পঞ্চমুখের একদম গোড়ার দিককার লোক। দল পাল্টায়নি একবারও। বিট রোল করে আসছে এতকাল। বিয়ে থা করার সময় পায়নি বলে ভরত হলে সাজসরঞ্জাম পাহারা দিতে চণ্ডীদাই থাকে। এখানেই খায়। শোয়। ক্যান্টিনে রান্না হয় আলাদা করে ওর জন্তে। সুজাতা নাটকে মাত্র একটা সিনে ?

অ্যাপিয়ার হতে হয়, তারপর শো চলার সময়েই উদয়াস্ত ইস্ত্রি করে চলে চণ্ডীদা। এতগুলো রোলের অতগুলো পোশাক। সবগুলো। ইস্ত্রি করে তুলে রাখে। পরের শোয়ে রেডি পাওয়া যাবে।

অমিয় সাজঘরে ঢুকে দেখলো চণ্ডীদা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ইস্ত্রি করে যাচ্ছে।

অমিয়কে দেখে অবাক। 'তুমি ? এখন ?'

—'দেখতে এলাম। কেমন কাজকর্ম করছো। ফাঁকিটাকি দিচ্ছ কিনা।'

—'একখানা সিগারেট দাও।'

—'আমি তো আজকাল আর সিগারেট খাচ্ছি না।'

—'ভালো। ছাড়তে পারলে ভালো। তোমার দুটো পাঞ্জাবি করা দরকার। থার্ড সিন আর লাস্ট সিনের জন্য। ঘামে ইস্ত্রিতে একদম ফেঁসে যাওয়ার দশা।'

—'সে তো বুঝলাম চণ্ডীদা। তুমি এ ছুটির দিনে একা একা ইস্ত্রি করে মরছো কেন ?'

—'বাঃ! কাল শো আছে না ? তখন আমায় আনরেডি পাবে না।'

—'বেড়াতে বেরোতে পারতে।'

—'প্রায় তো কলশোতে বেড়াতে বেরোই।' তারপর থেমে চণ্ডীদা বলল, 'গ্রুপ ফেলে কোথায় যাব ?'

—'ধর গ্রুপ যদি ভেঙে যায়।'

—'অভাবের দিনেই গেলাম না কোথাও। আর এখন হাউসফুলের সময় কাটবো ?'

—'হাউসফুলের সময়েই তো গ্রুপ ভেঙে যায় চণ্ডীদা।'

—'সন্ধ্যেবেলা খারাপ খারাপ কথা বোলো না। ক্ষণে অক্ষণে যদি ফলে যায়।'

—'এক্ষুণি নাটক তুলে নিলে গ্রুপ ভেঙে যাবে। পয়সা শর্ট পড়লেই দল পাল্টাপাল্টি শুরু হয়ে যাবে।'

—'নাটক তুলবে কেন অমিয়! হাজার রজনী হবেই দেখো।'

—'হবে তো জানি। কিন্তু এটাই কি আমাদের লক্ষ্য ছিল চণ্ডীদা ?'

—'আমরা এতকাল দর্শক চেয়ে আসিনি ?'

—'কিন্তু এভাবে কি চেয়েছিলাম! রোজ শোয়ের পর কাউন্টার মিলিয়ে টাকা গোনা! মালদা ইটাচুনা বনগাঁ—সর্বত্র খেপ মেরে বাড়াচ্ছি। বাস বোঝাই দিয়ে দুশো মাইল চলে যাচ্ছি। দূরের দূরের পার্টির বায়না নিচ্ছি। এখন আমাদের দুখানা

গাড়ি। দুটো ফ্রিজ। কতরকমের সাউণ্ডের জিনিস। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি চণ্ডীদা।'

—'কেন? দর্শক তো আমাদের নিয়েছে। আর জিনিসপত্তরের কথা বোলছো। ওগুলো তো দরকারী।'

—'দরকার রোজ রোজ বেড়ে যাচ্ছে না চণ্ডীদা?'

অন্যদিন এই সাজঘরে গমগম করে। আজ কোন শো নেই। বাইরে কোন কলশো নেই। ইলেকট্রিক ইস্ত্রিখানা নামিয়ে রেখে চণ্ডীবাবু টুলে বসলেন। নিভু আলোতেও পঞ্চমুখের সাজঘর ঝকঝক করছে। এক একজন আর্টিস্টের কয়েক প্রস্থ করে পোশাক।

'আমার কথা যদি বলো অমিয়—আমি তো নিজের জন্যে কিছু বাড়াইনি। যে ফতুয়া পরে বসে আছি—সে ফতুয়া গায়েই সিনে ঢুকি। থাকি এই সাজঘরে। খাই ক্যান্টিনে। আমি তো আর শিশির ভাদুড়ি কিংবা ছবি বিশ্বাস হতে আসিনি। আমি হলাম গিয়ে চণ্ডীচরণ দাস।'

—'নতুন নাটক ধরলে কেমন হয় চণ্ডীদা।'

—'এ নাটক গোটাও আগে।'

অমিয় চুপ করে গেল। এতদিন জানতো নাটক লাগানো কঠিন। এখন জানতে হচ্ছে—গোটানো তার চেয়েও কঠিন। বিশেষত নাটক যেখানে সফল। থিয়েটারের ভাষায় যাকে বলে দর্শকধন্য কিংবা মঞ্চজয়ী। আর কিছুকাল এ-নাটক চালিয়ে অমিয় স্বচ্ছন্দে পাবলিসিটিতে নিজের নামের আগে নটশেখর কিংবা নটচন্দ্র বসিয়ে নিতে পারে। আপত্তি করার কেউ নেই। কিন্তু আসলে সেটা নষ্টচন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে।

—'নাটক তুমি তুলে দাও অমিয়। একদম একঘেয়ে লাগছে।'

—'অন্য সবাই যখন বলবে—বাই দি পপুলার ডিমাণ্ড!'

—'আমি তোমার পেছনে আছি। যাতে ঝুঁকি নেই—তাতে আরাম কোথায়?'

—'তুমি তো আমার চেয়ে বড় চণ্ডীদা। বিয়ে করার ঝুঁকি নিলে না। নাটকের ঝুঁকি তোমার সইবে?'

—'এই ঝুঁকির সঙ্গে দুলতে দুলতেই তো এতটা পথ এসেছি।'

সাজঘরের বড় ফ্রিজটার মোটর থরথর করে শব্দ তুলেই চুপ করে গেল। ওর ভেতরে বার্লি-লেমন সিরাপ ব্রাণ্ডি নানা রকমের ফল মজুত আছে। ক্লান্তি এলে

লড়াই করার সব অস্ত্র ওখানে পাওয়া যাবে। গলা ভিজানোর জিনিসপত্র রেডি। এই ঢালাও ব্যবস্থা তাকে চারদিক থেকে চেপে ধরেছে—সেটা আজকাল টের পায় অমিয়।

এখন বেরিয়ে আসার একটা গলি খুঁজে পাওয়া দরকার। যে-গলি দিয়ে আবার বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানো যায়। সেখানে সাধারণের ভিড়ের ভেতরে মিশে যেতে পারলে এই বিশেষ হয়ে ওঠার জেলখানাটা ভেঙে ফেলা খুব সহজ। তখন খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অনেক নাটক মাথায় আসে অমিয়র। কতকাল যে ভাল কোন বই পড়া হচ্ছে না।

লুঙ্গি আর বুট পায়ে খলিফা এসে হাজির। 'দিদি কুথায় ?' হাতে এক বাণ্ডিল ব্লাউজ।

—'রজনী তো আসেনি।'

—'জিনিসগুলো রেখে দিন।'

বজনীর অনেক দিনকার দরজি।

—'নাও। তুলে রাখো চণ্ডীদা। এবার ইস্ত্রি কর বসে বসে। সাকসেসফুল নাটকের সাকসেসফুল হিরোইনের এক ডজন ব্লাউজ !'

॥ সতেরো ॥

গোটানো যত সহজ ভেবেছিল অমিয়—দেখলো, আসলে তত সহজ নয়। বেলা এগারোটা বাজতেই তিন জায়গা থেকে কলশোয়ের পার্টি বায়না করতে চলে এসেছে। শংকর সাজঘরের ভেতর দিকে অমিয়র আরাম কেদারার সামনে এসে দাঁড়াল। 'মার্চ মাসে ডেট দিতে পারবে দাদা?'

—'কোন ডেট নেই শংকর। সেই আঠাশে মার্চ শুধু।'

—'ওই দিনটা দাও তাহলে। বাকি দু' জায়গাকে এপ্রিলে ডেট দেওয়া যাবে।'

—'কি ভেবেছো শংকর। আমাদের কোন বিশ্রাম নেই? হলে সারা মাসে কম করেও কুড়িটা শো। তারপর দোলের দিন ডবল শো আছে। অন্য ছুটিছাটা থাকলে ডবল শো হবে। এছাড়া সারা মাস জুড়ে বাইরে শো। একটা দিন হাতে রেখেছিলাম—চুপচাপ শুয়ে শুয়ে থাকবো বলে।'

—'শোবার অনেক সময় পাবে দাদা! তুমি তো আমাদের নারায়ণ। অনন্ত শয়নেই শুয়ে আছো।'

—'যাতায়াত, খাই-খরচ—সবই ওদের।'

—'বিলকুল রাজি।'

—'মেন্যু বলে দিয়েছো?'

—'হুঁ। তোমার জন্যে ঝিঙে দিয়ে ডাল সেদ্ধ। নিমবেগুন—'

—'শুধু আমার জন্যে নয়। সারা গ্রুপের জন্যে। রাত জেগে তেতেপুড়ে বাসে গিয়ে হাজির হতে হবে। তখন ঝাল রান্না খেলেই শরীরটা যাবে।'

—'সব বলেছি দাদা।'

—'নগদ আড়াই হাজার টাকা গুনে আগাম দিয়ে যেতে হবে। ফুল পেমেণ্ট—তবে গ্রুপ যাবে।'

—'ফুল নিয়ে এসেছে।'

—'ক্যাশ তো?'

—'সব ক্যাশ। ওরা একটা কথা বলছিল দাদা। ওদের প্রাইমারি স্কুল বিল্ডিং হবে। কিছু কনসেসন চাইছে।'

—'শো হয়ে যাবার পর আমাদের নামে ডোনেশন অ্যানাউন্স করা হবে স্টেজে। তার আগে নয়।'

—'তাই হবে দাদা।'

—'পেপার পাবলিসিটি একদম বন্ধ করে দাও শংকর।'

—'তবু রেহাই পাবে না দাদা। অন্তত লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের নাটক দেখেছে। তারাই মুখে মুখে পাবলিসিটি দিয়ে বেড়াচ্ছে। কি করে তাদের রুখবে?'

—'সব ক্লজ দেখে এগ্রিমেণ্টে সই করবে।'

শংকর চলে যেতে অমিয় মনে মনে হিসেব করে দেখলো। হাউজের শো আর কলশো মিলিয়ে তা লাখ দশেক লোক দেখেছে। সত্যি তো এদিকটা ভাবেনি অমিয়। লাভপুরে শীতকালের রাতে শো করতে স্টেজে উঠে দেখে—কম্ফার্টার আর র‍্যাপারে মুড়ে হাজার হাজার মানুষ টুক টুক করে এসে ত্রিপলে বসে পড়ছে। এরা যদি গাঁয়ে-গঞ্জে 'সুজাতা'র কথা বলে বেড়ায় তাহলে পাবলিসিটি কে আটকে রাখবে। প্রত্যেকে এক-একজন মোবাইল পাবলিসিটি অফিসার। কেউই খবরের কাগজের স্রেফ বিজ্ঞাপনের টাইপ বা লেখা নয়। ওদের তো থামানো যাবে না। আর আছেন—হাওড়া শেয়ালদার নিত্যযাত্রীরা। এরা নাটক দেখে ফেরার পথে কামরায় বসে গল্প করে। বাকিরা শোনে।

যাতায়াত খাই-খরচা বাদে নগদ ছয় হাজার টাকা। আগে ছিল এই রেট। অসুখ থেকে উঠে অমিয় ভিড় কমাবার জন্যে, নাটক তুলে দেয়ার মতলবে এক লাফে পার নাইট রেট বাড়িয়ে আট হাজার করেছিল। ভেবেছিল চড়া রেট দেখে অনেকেই কেটে পড়বে। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না।

রজনী এল বারোটা নাগাদ। আজকাল অমিয়র জন্যে ডাক্তারের কথা মত ডায়েট তৈরি করে আনে বাড়ি থেকে। লীলাও একই ধরনের খাবার দিয়ে দেয় অমিয়র গাড়িতে। শো না থাকলে—বেলা এগারোটা থেকে দেড়টা-দুটো অব্দি খুচরো কাজগুলো সেরে ফেলে দুজনে মিলে। একজন চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হিসেবপত্র দেখে দেন। ইনকাম ট্যাক্সের জন্যে হিসেবপত্র তৈরি করতে হয়। তাছাড়া থাকে রিহার্সেল। পুরো মিউজিক হ্যাণ্ড সমেত স্টেজ রিহার্সেল। সাধারণত বুধবার হয়ে থাকে ব্যাপারটা। তখন দর্শকহীন অডিটোরিয়ামের সামনে খোলা মঞ্চে পুরো অভিনয়। এটা চালু করতে হয়েছে দুটো কারণে। এক: সফল নাটকে সবচেয়ে বড় দোষ যা—সেই ওভার কনফিডেন্সের নেশায় অনেকেই স্টেজে উঠে ভীষণ চড়া পর্দায় অভিনয় করতে শুরু করেছে। এমন কি ডায়ালগের বাইরে

বেরিয়ে গিয়ে ডায়ালগ দিচ্ছে। অ্যাকশনেও বাড়াবাড়ি চলছে। দুই : গলার মডু-লেশন নিয়মিত চর্চার ভেতরে না রাখলে স্টেজে উঠে যে যার ইচ্ছেমত করতে থাকে। তার ফলে কোন সিনেই পূর্ণ কমপোজিশনের চিহ্ন থাকে না। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় ঢিলেঢালা।

এছাড়া থাকে আলো, সাউণ্ড ঠিক করার কাজ। রজনী মাঝে মাঝে মিউজিক-এর সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেখে। অন্যদের নাচের দুটি সিকোয়েন্স মাঝে মাঝে রিহার্সেল দিয়ে দেখা হয়।

একটি পুরোদস্তুর প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখতে সব সময় নজর রাখতে হয় সব-দিকে। অমিয়র মনে হচ্ছিল—সে একটা জমিদারি সেরেস্তায় বড় নায়েব সেজে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। হাফ রিটায়ার্ড। কেননা, সুজাতা নাটকে তার মাথার পরিশ্রমের দিন ফুরিয়ে গেছে। এখন স্রোতের মত দিব্যি গড়িয়ে এ-নাটক চলবে। এই চলায় তার কোন কেরামতি নেই। ভালো টিমওয়ার্ক আর টাকার জোগান থাকলেই সব চালু থাকবে।

কথামত বিষ্ণু দত্ত এল তিনটে নাগাদ।

রজনী সাজঘরেই বসালো বিষ্ণুকে। লেমন-বার্লির শরবত দিয়ে বলল, 'আজ তৈরি হয়ে আসেন নি মনে হচ্ছে।'

—'ওরে বাবা! তা হয় নাকি। জিনিসপত্র খেয়ে কি নতুন নাটক শোনা যায়!'

—'আজ শোনাবে ঠিক করেছো?' অমিয়কে একথা বলায় সে চোখ নামিয়ে বোঝালো, 'হ্যাঁ।'

ফাঁকা স্টেজে সুজাতা নাটকের বেড-সিনের বিছানা পালঙ্ক মজুত। তাতে বসলো অমিয়। হাতে 'সম্রাট' নাটকের মোটা বাঁধানো খাতা নিয়ে পড়তে লাগলো। উল্টো দিকে বিষ্ণু। সাধারণ ইজিচেয়ারে। সামনে কয়েকশো ফাঁকা চেয়ার। যেগুলো অন্য দিন দর্শকে ভর্তি থাকে।

সম্রাট নাটকের সময়—প্রাচীনকাল।

পাত্রপাত্রী—সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রী, সেনাপতি, শ্রেষ্ঠী, কবি, নটী, গুপ্তচর, দূত, ঘাতক।

বিষয়বস্তু—সম্রাটের স্বেচ্ছাচার, হত্যালিপ্সা, সঙ্গীতপিপাসা।

অভিনয়ের সময় প্রায় পৌণে তিন ঘণ্টা।

শুনতে আরেকটু বেশি সময় লাগলো। একটানা পড়ে গিয়ে অমিয় হাঁফাচ্ছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গরম। বিষ্ণু গায়ের জামা খুলে ফেলল। 'এখানে অভিনয় কর কি করে ? এ যে একদম ফারনেস।'

—'হয়তো এয়ারকণ্ডিশন করে ফেলা যেত। কিন্তু শ্রীরাম ট্রাস্ট পারমিশন দেবে না। ওরা আমাদের তুলে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।'

—'ভাড়া পাচ্ছে তো।'

—'আরও বেশি ভাড়ার লোভে। আগে কেউ ভাড়া নিত না। আমরা ঝুঁকি নিয়ে জায়গাটা চালু করলাম। তারপরই ওদের চোখ খুলে গেছে। আরেকটা কথা বলি বিষ্ণু। এরকম গরমেই তো আমরা চিরকাল অভিনয় করে আসছি। বাহুল্য বলবো না। কিন্তু জিনিস বাড়ালেই বাড়ে। এই ফারনেসই আমাদের অন্তত দশ লক্ষ টাকা দিয়েছে—'

দুজনেই খানিক চুপ করে থাকলো। এমন সময় রজনী নীলদর্পণের সেই গানের কলি গলায় তুলে উইংসের পাশ দিয়ে স্টেজে ঢুকলো। হাতে বড় প্লেটে ক্যান্টিনের দুটো পেস্তা আইসক্রিম।

—'তুমি নেবে না ?'

—'গলা ভালো নেই।'

চেটেপুটে আইসক্রিম শেষ করে বিষ্ণু বলল, 'নাটক তো দুর্দান্ত হবে। কিন্তু স্টেজ, কসটিউম, সাউণ্ড, ভয়েস—'

—'ভরত হাউসের স্টেজে এ-জিনিস হবে না। আরও বড় স্পেস চাই। কলা-মন্দির দরকার।'

—'সুজাতা ছেড়ে কখন করবে ?'

—'সুজাতা একদম ছেড়ে দিলেই ভালো হয়। কিন্তু পারছি কোথায় ? আরও জড়িয়ে যাচ্ছি। ভেবেছি—বুধবার বুধবার ডেট নিয়ে কলামন্দিরে করব। কিন্তু আজকাল তো বুধবারও কলশো থাকে। না রেখেও উপায় নেই। এতজন লোকের মাইনে, মেডিকেল বিল, পেট্রল, ড্রাইভারদের ওভারটাইম, ট্যাক্স, পাবলিসিটি।'

—'শুনলে বিষ্ণু! সুজাতা নাটক তুলে দিতে চায় অমিয়।'

বিষ্ণু রজনীকে বলল, 'এবার তো তোমরা বলবে—তাহলে আমরা খাবো কি !'

জায়গাটা গম্ভীর হয়ে গেল। অতখানি নাটক একটানা পড়ে যাবার ধকলে অমিয় চুপচাপ রেস্ট নিতেই চাইছিল। মনে মনে বলল, গ্রুপ থিয়েটার আসলে

জিনিসটা কি ? অভিনয় ? না, যশোলিপ্সা ? ভরত হলের লনে টবে টবে দোপাটির পাশাপাশি কাঁচালঙ্কা লাগানো হয়েছে। কয়েকটা গাছের পাতা কেন যে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

রজনী এতক্ষণে কথা বলল। 'সম্রাট নাটক স্টেজ হলে অমিয় যে কোথায় উঠবে কে জানে। চিরকাল ওর নাম থাকবে। আমি পড়েছি। এত কাজের ভেতরেও কখন যে টুক টুক করে লিখে ফেলেছে। ভাবলে অবাক লাগে। আর ওরকম নাটক।'

—'সম্রাটের কসটিউম ভেবেছি—মাথার এলোমেলো চুল কপালে এসে পড়েছে। গায়ে সোনালী সুতোর কাজ করা শাদা কুর্তা। হাঁটুর শেষ থেকে চামড়ার পটি মোড়া জুতো। মণিবন্ধে একটা বড় পাথর। মুখে হাসি। হাতে কাঠের বিরাট সরাবদানী। চোখে আচ্ছন্নভাব। গমগমে গলা। ঘাতককে হত্যার আদেশ দিয়ে ইচ্ছে হল তো এক পাক নেচে নেবে। ক্ষমতাপ্রিয় খেয়ালী একজন মানুষ যেমন হয়।'

—'এই রোলে তাহলে তোমাকে আর জুলপি লাগাতে হচ্ছে না।'

বিষ্ণুর একথায় অমিয় হাসলো শুধু।

—'অভিনয়ের সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেও কোন বাধা নেই। কি বল ?'

—'সম্রাট চরিত্র এ-নাটকে পঞ্চমুখ গ্রুপেরও নিয়তি।'

রজনীর এ-কথায় অমিয় সোজা হয়ে বসল। 'রোজ আমরা পশুর মত একটা বাসি নাটকের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। সেই সুবাদে দুটো ভালো খেতে পাই। খানিক গাড়ি চড়তে পারি। নিজেদের শিল্পীও ভাবি। দিনের শেষে টাকাও গুনি। বিষ্ণু আজকাল আমার কষ্ট হয় ভীষণ। আমি আর পারছি না। একঘেয়ে ক্ল্যাপ। একঘেয়ে কলশো। তার আবার বায়নাপত্র ! আমাদের ভালো করে বাঁচা দরকার বিষ্ণু। অন্তত একদিনের জন্যেও—'

বলতে বলতে হাঁফাচ্ছিল অমিয়। এমন সময় স্টিল ফটোগ্রাফার হরিহর এসে হাজির। তার সঙ্গে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট অবনী সান্যাল। অবনীর নালিশ, হিন্দি কাগজের জন্যে স্টিল ছবি নিয়ে সে যে-সব বিজ্ঞাপনের ডিজাইন দিয়েছে—তার ভেতর ছবির নিচে হরিহর ছোট হরফে তার নাম দিতে চাইছে। এটা কি চলে ?

সব শুনে অমিয় বলল, 'তুমিই রায় দাও বিষ্ণু। এই বাসি নাটকের বিজ্ঞাপন মেটিরিয়ালে ছবির জন্যে নাম দেওয়ার হ্যাংলামিও মানুষের থাকে ?'

—'নাম জিনিসটা বড় দুর্বল ব্যাপার। দুর্বলতা কাটানো কঠিন অমিয়।'

রজনী বলল, 'হরিহরদা তুমি তো আজ আমাদের ছবি তুলছো না। আমিই তোমাকে এনেছি এখানে।'

—'সুজাতা নাটকের অ্যাড ডিজাইনে নাম থাকলে দিদি আমার ছুটো কাজ পেতে সুবিধে হয়।'

অবনী মুখিয়েই ছিল। 'তাহলে আমার নাম যাবে ম্যাট্রিকসের নিচে।'

অমিয় বলল, 'যার যত ইচ্ছে নাম দিয়ে নাও। এ-নাটক যদি আমি তুলে না দি তবে আমি বাপের সুপুত্তুরই না।'

কিছুই বুঝতে না পেরে হরিহর অমিয়কে তোয়াজ করতে গেল। 'এ নাটক দাদা আপনার পাঁচ বছরেও তুলতে হবে না। দিব্যি গড় গড় করে চলে যাবে। আপনি জায়গা দেখুন। হাউস বানান। সুজাতা নাটকই সব করে দেবে।'

—'সেইটেই বাকি আছে হরিহর। তুমি এখন যাও। আমাদের এখন এখানে একটু কথা আছে।'

ওরা চলে যেতে রজনী বলল, 'তুমি হইচই করে বাসি নাটক বলে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছো কেন ?'

—'বাসি লাগলে বাসি বলব না ?'

—'কিসে বাসি ?'

—'সবটাতেই। এখন এই পৃথিবীতে সুজাতা নাটকের মোদ্দা কথাটা খুব পুরনো নয়কি ? পৃথিবী কি অনেক এগিয়ে যায়নি ? লোকের ভালো লাগছে তাই। নইলে নাটক হিসাবে এমন কি নতুন কথা বলতে পেরেছি এ নাটকে। নেহাত তোমার মত অভিনেত্রী রয়েছে তাই। নইলে কবে এ-নাটক ভেসে যেত।'

—'তাহলে এ-নাটক করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলে কেন ?'

—'তখন তো রজনী আমার রয়ে-বসে ভাববার সময় ছিল না কোন। পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি। কোন্ ফরমুলায় গেলে বক্স অফিস লাগতে পারে—সে-পথই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। দাঁড়াবার জায়গা খুঁজছিলাম। সুজাতা নাটকের বছর ঘুরে গেল। এখন আমরা দম নিতে পারি। ভাবতে পারি রয়ে-বসে।'

—'তাহলে এতদিন আমরা খারাপ ধরনের কমার্শিয়াল কাজ করে আসছি ?'

—'তা বলব না রজনী। ইণ্টারপ্রিটেশনের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। খুব সাধারণ ডায়ালগ বলার গুণে ভেতর থেকে নতুন নতুন মানে টেনে বের করে। দর্শকের চোখের সামনে উঁচুদরের অ্যাক্টর সাধারণ সংলাপ থেকে অসাধারণ

কথা তুলে ধরেন। আমাদের নাটকে গত এক বছরে সেই ব্যাপারটা হয়েছে। আমাকে আগাগোড়া তোমার সঙ্গে লড়াই করতে করতে স্টেজে টিকে থাকতে হয়। তোমার ডেলিভারি রজনী কারও সঙ্গে তুলনা হয় না।'

—'আমার কথা বাদ দাও অমিয়।'

—'বাদ দেবার নয় রজনী। বাঙালী জানে, তাদের চোখের সামনে ভরত হলে বাঙালীর শেষ বড় স্টেজ অ্যাকট্রেস অভিনয় করে যাচ্ছেন। তোমার সাইজের অভিনেত্রী এখন স্টেজে আর কেউ নেই। অথচ আমাদের কিন্তু আরও ভালো নাটক দিয়ে তোমাকে কাজে লাগানো উচিত। এখনো তোমার ভেতরকার সবটুকু দর্শক পায়নি। তেমন নাটক হলে তুমি জেগে উঠবে। তোমার ভেতরকার ঘুম পুরোপুরি ভাঙবে। তখন তোমার সঙ্গে এঁটে ওঠার মত লোক স্টেজে পাওয়া যাবে না।'

—'আমি খুব ফ্ল্যাটার্ড বোধ করছি।'

—'করার কোন কারণ নেই রজনী। দেশটা ভালো নাটক এখন পায় না বেশি। তাই ভুল জায়গায় পদক, মানপত্র, নৈবেদ্য চড়াচ্ছে। তাতে অবশ্য কোনো ক্ষতি নেই তোমার। ক্ষতি ওদেরই। দেশের লোক তো তোমাকে নিয়েছে। গাঁয়েগঞ্জে দশ-বিশ হাজার মানুষ তো হ্যাজাকের আলোয় চোখের পলক না ফেলে তুমি কি কর তাই দেখে রজনী। কী বল তাই শোনে।'

—'আমার কথা থাক। আসল কথা হল—সম্রাট যদি না চলে? তখন?'

—'তখন? আবার রাস্তায় দাঁড়াব।'

—'এতখানি সিকিউরিটি থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবে?'

—'কী ছিল আমাদের রজনী! কিছু স্বপ্ন। এবং কিছু দেনা। এখন কী আছে? বন্দীর নিরাপত্তা! আর বিপুল পরিমাণে স্বপ্নহীনতা। কোন কল্পনা নেই। কোন আবিষ্কার নেই। কোন অনুসন্ধান নেই। উন্মোচনও নেই। আজকাল আমি জীবনের ঝোলে যা ইচ্ছে ভাড়ামি করি—তাই-ই পাবিলিক খায়। ডবল এনকোর দেয়। ক্ল্যাপ পড়ে। আসলে জনপ্রিয়তার অন্য নাম তো—কবন্ধ দৈত্য।'

এখানে বিষ্ণু একাই ক্ল্যাপ দিয়ে উঠলো। 'একটা টেপ রেকর্ডার থাকলে খুব ভালো হোতো অমিয়। তোমাদের দুজনের এই ডায়ালগগুলো তুলে দিয়ে আমি একখানা নাটক লিখে ফেলতে পারতাম। রাতারাতি নাট্যকার হয়ে যেতাম।'

—'এসব প্রশ্ন লেখক; নাট্যকার, অভিনেতা, গাইয়ে, ছবি আঁকিয়ে—সবাইকেই কুরে কুরে খাবে বিষ্ণু। সফল না-হওয়ার যন্ত্রটা যেমন আছে—সফল

হওয়ার যন্ত্রটাও তেমনি থাকবে। যে হাইজাম্পের রেকর্ড করে—সে নিজেই নিজের রেকর্ড ভাঙতে তৈরি হয়। সে নিশ্চিন্ত জানে, ভাঙতে না পারলে জরা এসে তাকে ধরবে।'

—'এত জেনেশুনে তুমি অভিনয় কর কি করে? অসুবিধা হয় না।'

—'তুমি এ প্রশ্ন করছো কি করে রজনী? স্টেজে উঠেও কি তুমি ভুলতে পারো—তুমি আসলে একজন অন্য লোক—যার নাম রজনী দত্ত। যার মা ছিলেন নীহার। যার বাড়ি গিরীশ পার্কের উল্টো দিকে। যার বাবা একটুর জন্যে বম্বে ছবির পৃথ্বীরাজ কাপুর কিংবা জাগীরদার হতে পারেনি। যে শৈশবে শ্রীরঙ্গমের সাজঘরে সিনটানার ছেলেদের সঙ্গে খেলে বেড়াতো। যার স্মরণে এখনো অন্তত তিরিশখানা বিখ্যাত বাংলা নাটকের সংলাপ গানসমেত ধরা আছে। আসলে রজনী অভিনয় মানে বোধহয়—নিজের স্মৃতি, নিজের সংস্কার ফুটলাইটের সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে ভুলে যাওয়া। বিপুল বিস্মৃতির নামই অভিনয়। কিংবা অন্যের চরিত্রে সাময়িক বাসা বাঁধাই সম্ভবত অভিনয়।'

—'হবে। আমি অতশত বুঝি না। উইংসের পাশ দিয়ে স্টেজে ঢুকেই আমি অন্য লোক হয়ে যাই।'

—'না জেনেই রজনী তুমি তোমার এতদিনকার স্মৃতি থেকে ভ্রষ্ট হও। তাই অত সহজে সুজাতা হয়ে যাও। অত সহজে ঠাকুরঝি হয়ে যেতে পারো।'

বিষ্ণু উঠে দাঁড়ালো। 'আজ খুব জ্ঞান হল অমিয়। আমায় তোমাদের দলে নাও না। অনেক কিছু শিখে ফেলবো তাহলে।'

—'ফর্ম ফিল-আপ করে দাও। রিহার্সেলে কিন্তু সময় মত আসতে হবে। টিফিন পাবে। গাড়িভাড়া পাবে।'

—'কোন্ রোল দেবে?'

—'সম্রাটে সম্রাট কর।'

—'মানাবে কেন অমিয়!'

—'খুব মানিয়ে যাবে।'

—'সেইটেই বাকি আছে। আজ আসি রজনী।'

—'তোমার গিন্নীর খবর কি? তাকে তো আনলে না।'

—'আনবো একদিন। সময়ই হচ্ছে না। অমিয়, তোমার ড্রাইভারকে একটু বলে দাও। আমায় ছেড়ে আসবে।'

—'আমাকে বলতে হবে না। তুমি বললেও যাবে।'

ফাঁকা স্টেজে দুজনে মুখোমুখি বসে থাকলো। সেই লক্ষ্মী পায়রা দুটো আবার অনেকদিন পরে পাখা ঝাপটে ভরত হলের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

অমিয় বলল, 'আমার গিন্নীর তো তুমি কোন খোঁজ নাও না?'

—'লীলা? বড় ভালো মেয়ে।'

—'মোটেই ভালো না। তোমায় খুব হিংসে করে।'

—'লীলার জায়গায় আমি হলে—আমিও করতুম।' তারপর একটু থেমে থেকে রজনী বলল, 'ওকে জানিয়ে দিও—আমাকে হিংসে করার কিছু নেই। তুমি তো এখন আমাকে অনেকটা জানো। তুমিই লীলাকে বলতে পারো।'

—'কি বলব?'

—'তোমার সঙ্গে আমার কিছু হবার নয়। জীবনের এত দেরিতে দুজনের দেখা। এখান থেকে আর কিছু শুরু হয় না। এখন যা হয়—তা হল, খানিকটা ইচ্ছে, খানিকটা কষ্ট।'

—'তবু বলে দাও কি বলব রজনী?'

—'এই তো বললাম। তুমি ডায়ালগ লেখো। তুমিই এসব কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে লীলাকে বুঝিয়ে বোলো।

—'আমি যে তোমায় ভালবাসি রজনী।'

—'আমিও হয়তো। আর কি কর আমাকে।'

—'অভিনেত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা না করে পারিনে রজনী।'

—'লীলাকেও তো ভালোবাসো?'

—'তাও বাসি। সেকথা কেন অস্বীকার করবো।'

—'অস্বীকার করতে বলছে কে? এজন্যই তো তোমাকে ভালো লাগে। তুমি পরিষ্কার লোক বলে তোমাকে অমিয় আমার আরও ভালো লাগে।'

—'একজন কি দুজনকে ভালোবাসতে পারে না রজনী? দুরকম করে?'

—'কেন পারবে না। তুমিই তো তার প্রমাণ। যদি আগে দেখা হত তোমার সঙ্গে।'

—'কি হত তাহলে? কিছুই হত না রজনী।'

—'জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত।'

—'আজ যদি শশাঙ্কবাবু ফিরে আসেন—'

—'আমি তাকে ফেলতে পারব না। আমার ছেলেমেয়েদের বাবা। কিন্তু তাকে আমি আর নিতেও পারবো না।'

—'এজন্যে আমি দায়ী।'

—'কেউ দায়ী নয়। দায়ী আমার ভাগ্য। দায়ী আমার মন। আমার আগে-কার সে মন তো আর নেই অমিয়। শশাঙ্ককে একসময় আমি খুব ভালোবাসতাম। ও যে ইচ্ছে করে অসহায় সেজে থেকে আমার ভালোবাসা কুড়োতো সে তো তখন আমি জানতাম না।'

—'শশাঙ্কবাবু কিন্তু তোমায় ভালোবাসেন।'

—'বাসতে দাও। আমার জীবনটা তছনছ করে দিলো লোকটা। তৃপ্তির সঙ্গে কী বলে যে হাত মেলালো তা বুঝি না। আমি ওর বিবাহিত স্ত্রী। ওর ছেলেমেয়ের মা। অথচ তৃপ্তিকেই ও মদত দিয়ে গেল।'

—'ওইটেই হয়তো শশাঙ্কর ভালোবাসার রাস্তা ছিল।'

—'হবে! কিন্তু রাস্তাটা খুব খারাপ ছিল।'

অন্ধকার সন্ধ্যা খালি চেয়ারগুলোতে সিট নিয়ে বসে গেল। মঞ্চে অভিনেতা এবং অভিনেত্রী দুজনই চুপচাপ। কোন সংলাপ নেই। লাইট নেই। মিউজিক নেই। রজনী সোজা লাস্ট রোয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। অমিয় রজনীর দিকে।

রজনী খানিক বাদে উঠে গেল। যাবার সময় বলল, 'তুমি এগারোটা কলশোয়ের হিসেবপত্র চেক করে তবে বাড়ি যাবে। নয়ত আবার হিসেব জমে যাবে।'

—'তুমি কোথায় চললে?'

—'আজ একটু বাড়ি যাব তাড়াতাড়ি। ছেলেমেয়েরা আমায় একদম পায় না। ভেবেছি ওদের জন্যে আজ ভালমন্দ কিছু রাঁধবো।'

—'তোমার গাড়িটা নিয়ে যাও। কাল একবারে হাউসে ফিরবে।'

—'না দরকার নেই। ট্যাক্সি নিয়ে নেব। ওরা গাড়ি দেখলে বিরক্ত হয়।'

রজনী বাড়ি ফিরে দেখলো বসবার ঘরে বড় আলোটা জ্বলছে। শশাঙ্ক দোরের দিকে পেছন ফিরে বসে গল্প করছে। বড় ছেলে, মেজো আর ছোট মেয়েকে নিয়ে জমিয়ে বসে গল্প হচ্ছে। গল্পের বিষয় সম্ভবত ওদের মা। লোকটাকে ফিরে আসতে দেখে রাগে রজনীর গা রি-রি করে উঠলো। এই লোকটা। এই লোকটাই তার জীবনটাকে থেঁতলে দিয়েছে। একদম রাস্তার একটা গালাগালি তার ঠোঁটে উঠে এল।

রজনী ঘরে ঢুকতেই দপ করে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা প্রায় মাথা নিচু করে ভেতরে চলে গেল। এখন রজনী শশাঙ্ক একদম মুখোমুখি। মাঝখানে কাচের টেবিলে শুধু একটা কাপ-প্লেট। চা খাওয়া হয়ে গেছে শশাঙ্কর।

—'আজ আমি চলে যেতে আসিনি।'

রজনী কোন জবাব দিল না।

—'আমি এখানে থাকবো। ওরা আমারই ছেলে। আমারই মেয়ে। তুমি আমার স্ত্রী।'

দাঁড়িয়ে ছিল রজনী। একথা শুনে চেয়ারে বসলো। 'আচ্ছা! তাই নাকি!'

—'ঠাট্টার কথা নয় রজনী। এ বাড়ি আমারও।'

—'কোন সুবাদে? ভাড়া দাও তুমি? না। রেশন আনো তুমি? না। সংসার চালাও তুমি? না। ইচ্ছামত উধাও হও। আবার ফিরে আস। এর মাঝে আরও একটা বড় কাজ কর অবশ্য!'

বুঝতে না পেরে শশাঙ্ক তাকিয়ে আছে। 'নিজের স্ত্রীর নামে সত্যমিথ্যে কলঙ্ক রটাও।'

—'আমি রটাইনি কোনদিন।'

—'যারা রটায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো। যারা আমাব ক্ষতি করেছে তাদের সঙ্গী তুমি। অস্বীকার করতে পারবে?'

— তৃপ্তির ভালোবাসা তুমি অস্বীকার করতে পারো?'

—'মরে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। থাকলে না জানি আরও কত কি করতো। আমার স্বামী হয়ে তার ভালোবাসার কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?'

—'আমার যারা ক্ষতি করেছে—তাদের সঙ্গে মিশতেও তো তোমার আটকায়নি রজনী। অমিয়র সামনে তুমি আমায় অপমান করনি?'

—'এসব মিথ্যে কথা বোলো না। তুমি তোমার ব্যবহারে আমায় অন্যত্র ঠেলে দিয়েছো। আমি ইচ্ছে করে কোথাও যাইনি। তোমার স্বভাব আমায় যেতে বাধ্য করেছে শশাঙ্ক। অমিয় ওরা কেউ কোনদিন আমার বন্ধু ছিল না। তুমি ওদের আমার বন্ধু করে দিয়েছো। নাও। এবার ওঠো। আর কোন কথা বলে দরকার নেই। রাত হয়ে যাচ্ছে—'

—'এমন কিছু রাত হয়নি। এর চেয়ে তো অনেক রাত্রে তুমি ফেরো। আমি তো ওদের খোঁজ নিতে এখানে আসি মাঝে মাঝে। তোমার তো এখন রজনী সন্ধ্যে সবে।'

—'সে হিসেবে কোন দরকার নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আমার ছেলে-মেয়েদের মন আমারই বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিয়ে যাও—তা আমি জানি। তারপর টুক করে পালিয়ে যাও। নাও। এখন ওঠো। আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে শোব। বাজে ঝামেলা আর ভাল লাগছে না।'

—'ওরা আমারও ছেলেমেয়ে রজনী।'

—'সে তো কুকুর বেড়ালেরও থাকে! যাও ওঠো এখন। বিচ্ছিরি লাগছে।'

ঠিক এই সময় রজনীর বড় ছেলে ঘরে ঢুকলো। বোঝাই যাচ্ছিল—ওরা পাশের ঘরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। সে দিব্যি তেরিয়া হয়ে বলল, 'না। বাবা আজ থেকে এখানেই থাকবে।'

রজনী ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'না। তুমি ছোটো। তুমি এখন ভেতরে যাও।'

—'না। আমি যাব না। আমার বাবা—'

—'আমি তোমার মা। তুমি ভেতরে যাও।'

শশাঙ্ক এগিয়ে এল। রজনী পরিষ্কার বুঝলো ছেলেমেয়েদের চোখে তার ওপরে টেক্কা দিতেই শশাঙ্ক বলছে, 'ছিঃ! তোমাদের মা হন। তুমি ভেতরে যাও বাবা। আমিও চলে যাচ্ছি—'

কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই শশাঙ্ক বেরিয়ে গেল।

রজনীর মুখে এসে গিয়েছিল - সুবোধ জানি! কিন্তু সেকথা উচ্চারণও করল না। করতে পারল না। কারণ ঠিক এই সময়েই তার বড় ছেলে সনৎ দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল একছুটে। একবার বোধহয় জোরে ডাকলো। বাবা। বাবা—

সারাটা শরীর রাগে ঘেন্নায় অবশ হয়ে আসছিল রজনীর। বসার ঘরে সোফা-কাম-বেডে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই মেজো মেয়েকে ডেকে বলল, 'আলোটা নিবিয়ে দে। আমি খাচ্ছিনে রাতে। তোমরা খেয়ে নাও।'

দুই মেয়ে যে তারই ভয়ে এতক্ষণ আসতে পারেনি—একথা রজনী জানে। জানে বলেই মনে আরও কষ্ট পেল। ওরাও শাড়ি পরছে কয়েক বছর। রজনী যা নিজে কিনে দেয় ওদের। নয়ত ওরা পছন্দ করে কেনার সুযোগ বা সময় পায় না। বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে ছোট বোন দুটিকে নিয়ে বাজারে বেরোলে তবে ওদের ঠিক কেনাকাটা হয়। নয়তো নয়।

মেজো মেয়ের নাম মনো। মনোরমা নাম দিয়েছিল মা। ছোটজনের নাম

সরমা। তাকে রজনী সরী বলে ডাকে। বড় মেয়ের অনেক নাম। রজনী তাকে শুধু 'বড়' বলেই ডাকে। ছেলের ডাক নাম—সন্তু।

আলো নিবিয়ে দিয়ে মনো চলে যাচ্ছিল। রজনী ডাকলো। 'বিকেলে খেতে দিয়েছিলি সন্তুকে ?'

—'খায়নি মা। খাতাপত্রের কী বিজিনেস করবে। তাই বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কদিন।'

—'পড়াশুনোটা করলো না একদম। তোরা খেয়েছিস !'

—'হুঁ। বাবার জন্যে মুড়ি মেখেছিলাম। আরো আছে। তোমায় দেব মা।'

মুখটা আবার বালিতে ভরে গেল রজনীর। 'তোদের বাবা এলে বুঝি মুড়ি মাখিস ?'

মনোর সঙ্গে সঙ্গে সরী এসেছিল। সে বলল, 'কোনদিন সিঙ্গাড়াও আনা হয়।'

—'এ পয়সা পাস কোত্থেকে ?'

—'কেন ? বাবা দেয়—'

—'কোথায় ? বিয়ে হয়ে তক আমার হাতে তো কোনদিন একটা পয়সা দেয়নি।'

—'কেন মা ? বাবার মানিব্যাগে তো পয়সা থাকে। আজ তো অনেক নোট দেখলাম।'

—'তাই বুঝি। আমি তো কোনদিন দেখিনি। তাহলে ওদের ফড়েপুকুরের বসতবাড়ি বিক্রি হয়েছে। ভাগের টাকা তোদের বাবার হাতে এসেছে বোধহয়।'

সরী বলল, 'একটা কথা বলব মা। তোমার সঙ্গে বাবার কিসের ঝগড়া ?'

—'কিসের নয় মা ! যতদিন এখানে পাকা-পাকি ছিল—তোমাদের জন্মের অনেক আগে—বিয়ের পর থেকেই আমি সংসারটা টেনে আসছি। কোনদিন তো তোমাদের বাবাকে মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করতে দেখিনি।'

—'বাবার এখন বয়স হয়েছে মা।'

—'আমার বয়স বসে আছে ?' বলতে বলতে রজনী কেঁদে ফেলল। স্টেজে কোনদিন রজনী এত তাড়াতাড়ি কাঁদতে পারেনি।

মনো চুপ করে গেল। সরী চুপ করে গেল।

এতক্ষণ অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না রজনী। যা দেখছিল—তা

অন্ধকার। এখন সেটুকু ঝাপসা হয়ে গিয়ে অনেক বড় অন্ধকার তার চোখের সামনে মাথা ঠেলে দাঁড়ালো।

কোন কথা না বলে রজনী মনো আর সরীর গায়ে হাত বোলাতে লাগল। এক জায়গায় হাত থামতে রজনী বুঝলো, এটা মনোর বাঁহাতের কনুই। খুব রোগা লাগছে। সারাদিন সে নিজে ভরত হাউসেই কাটায়। মেয়েটা রান্না করে। রেশন আনায়। ছোটবেলা থেকেই ওরা ভাইবোনেরা মায়ের আদরযত্ন পায়নি। পাবে কোত্থেকে। বিয়ের পর থেকেই তো রজনী থিয়েটারের খেপ ধরে সংসার টেনে আসছে।

—'হ্যাঁরে। তোরা আজ রাতে কি দিয়ে খাবি?'

—'কেন? সকালের মাছ রয়েছে তো মা। তুমি তো খাওনি। খাবে আমাদের সঙ্গে?'

—'দে?'

দুই বোন নাচতে নাচতে ভেতরে ছুটলো।

—'সন্তু এলে একসঙ্গে খেতে বসবো।'

সরী বলল, 'দাদার ফেরার ঠিক থাকে না মা। তার চেয়ে এসো আমরা বসে পড়ি।'

॥ আঠারো ॥

সন্তু কিছুতেই শশাঙ্ককে ধরতে পারছিল না। ফুটপাথে ভিড়। তার বাবা এক-একবার ভিড়ে হারিয়ে যায়। আবার দেখা যায় তাকে। সন্তুর বুকের ভেতরটা লাফাচ্ছিল। এভাবে সে কিছুতেই তার বাবাকে চলে যেতে দেবে না। মা যা বলে বলুক। পায়ের স্যাণ্ডেলটা কাঁচা চামড়ার। জোরে হাঁটছে আর পায়ের ছাল উঠে ফোস্কা পড়ছে। খুব ছোটবেলায় বাবা তাদের একবার হেদোর ওখানে চৈতসংক্রান্তির মেলায় নিয়ে গিয়ে তরমুজ কিনে দিয়েছিল। তখন বড়দির বিয়ে হয়নি। দুবার 'বাবা' বলে চেঁচিয়ে ডাকলো সন্তু।

কলকাতার রাস্তার কত লোকই তো বাবা বলে ডাকে। শশাঙ্ক ফিরেও তাকালো না। সম্ভবত শুনতে পায়নি। সন্তু নিজের বাবাকে শশাঙ্কবাবু বলে চেঁচিয়ে ডাকতে পারল না। এ-রাস্তা সে-রাস্তা করে শশাঙ্কর পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে সন্তু যখন তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে—তখন দুজনই কলেজ স্ট্রীটের এক এঁদো গলি ধরে দেওয়াল ফেঁপে ওঠা একটা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ড্যাম্প। অন্ধকার। দুধারে প্রেসবাড়ি। একটাতে ট্রেডলে অনবরত লেবেল ছাপা হচ্ছে। ঘটাং ঘটাং। তার ভেতরেই শশাঙ্ক তালা-আঁটা দরজাটা খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকলো। অন্ধকারে ছুট করে আলো জ্বালালো। তারপর পাঞ্জাবি খুলে দড়িতে মেলে দিতে দিতে মেঝেতে দেখলো—তার ছায়ার পাশেই আরেকটা ছায়া।

সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক রীতিমত চমকে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কে ?'

—'আমি বাবা।'

—'ওঃ। ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছিল বুকে। কী করে চিনে এলি ? ঠিকানা কে দিল ?'

—'তোমার পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে আসছিলাম। কত ডাকি তোমায়—তুমি শুনতে পাও না। তাই না তোমার ডেরা চিনলাম।'

—'বোস। আমি এখানে থাকি।'

—'এত খারাপ ঘরে ? কেন বাবা ? তুমি বাড়ি চল।'

—'ও বাড়ি তোদের মায়ের।'

এখন কী কথা বলতে হয় সন্তু জানে না। অনেক কথা একসঙ্গে মনে আসছিল। চুপ করে গেল।

—'খেয়ে আসিসনি তো। বোস। এখুনি হোটেলের ছেলেটা ভাত নিয়ে আসবে। আরেকটা মিল বলে দেব।'

সন্তু বুঝলো, সে বসলেই তার বাবার খাট দুলে উঠবে। নোনা ধরা দেওয়াল। মেঝে মাটির নিচে এক বিঘৎ সেঁধিয়ে গেছে। আগেকার কড়িবর্গা লাগানো বাড়ি। দোতলা, তেতলার চাপে যেকোন মুহূর্তে এ-ঘর মাটির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। লেবেল ছাপানোর পাশের প্রেস থেকে ময়দার আঠার গন্ধ উঠে এসে গা গুলিয়ে দিল সন্তুর। 'তুমি বাড়ি চল বাবা। আমরা আগের মত থাকবো।'

—'তা হয় না সন্তু। তুমি এখন সব বুঝবে না।'

বাবা তাকে 'তুমি' বলছে দেখে সন্তু আরও ঘাবড়ে গেল। তখন তার সতেরো-আঠারো হবে। তার স্কুলের বন্ধুরা কেউ কেউ স্কটিশে পড়ে। একদল যায় বঙ্গবাসী। পাস করলে সেও আজ কলেজে যেত।

ছেলের মুখ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে শশাঙ্ক বলল, 'আয়। বোস না এখানে। ঘরটা কিন্তু গরমের দিনে দুপুরে ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।'

—'শীতে তো দার্জিলিং। তুমি এখানে থাকো কি করে বাবা?'

—'কেনরে সন্তু। বেশ তো জায়গা। কোন ঝামেলা নেই।'

সন্তুর মনে এসেছিল, একবার জানতে চায়, বাবা তোমার চলে কি করে? কিন্তু একথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। হাজার হোক বাবা। বাবার বয়স কত সন্তু জানে না। হয়তো পঞ্চাশ হয়ে গেছে। ব্যাকব্রাশ কালো চুল। তাতে দু-একটা শাদা। চেহারা বেশ ছিপছিপে। মায়ের মত এখনো ভারি হয়ে যায়নি। গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। ময়লা ধুতির নিচে পায়ের কালো কাবলি চিকচিক করছে। ফ্রেমের ভেতর থেকে বাবার তাকানো সন্তুর আশ্চর্য সুন্দর লাগলো। তাকেই বাবা মন দিয়ে দেখছে। কী একটা লজ্জায় সন্তু চোখ নামিয়ে নিল।

—'হ্যাঁরে! তুই খুব বড় হয়ে গেছিস না?'

—'সবাই আমায় লম্বু বলে।'

—'ও কি কথার ধারা? দাড়ি কামাস?'

—'মাঝে মাঝে। না কামালে চুলকোয়।'

—'শশাঙ্ক দেখলো, ছেলের বাঁদিকের গালে আলো না পড়ায় আরো সুন্দর

দেখাচ্ছে তাকে। দু-একটা কথা আরও বলতো শশাঙ্ক। কিন্তু হোটেলের ছেলেটা ভাত নিয়ে এসেছে। তাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে বলে আরেকটা মিলের অর্ডার দিল শশাঙ্ক। 'রুই মাছ থাকলে দিও।'

দুজনে খেতে খেতে বাত প্রায় এগারোটা হয়ে গেল। তুই আজ আর যাসনে সন্তু। এখানেই শুয়ে থাক।

—'বেশি রাত তো হয়নি। দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব বাবা।'

—'কেন? মা চিন্তা করবেন?'

—'মা তো অনেক রাতে ফেবে। আমার সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না বাবা।'

—'কতো রাত?'

—'তা এক একদিন বেশ রাত হয়। আমরা ঘুমিয়ে থাকি।'

—'দরজা কে খোলে?'

—'মনো। নয়তো আমি কিংবা সরী।'

দুজনে একই সঙ্গে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর শশাঙ্কই বলল, 'এতরাতে ফেরার দরকার নেই। রাস্তাঘাট ভালো নয়। কাল ভোরে গিয়ে বলবে—বাবার কাছে ছিলাম।'

—'তোমার এতটুকু খাটে দুজনে শোব কি করে। কারোর যে ঘুম হবে না বাবা।'

—'একটা রাত তো। ওই বেশ হয়ে যাবে। সন্তু তুই এক খিলি পান নিয়ে আয় তো আমার জন্যে। খয়ের দিতে বারণ করবি। জরদা আলাদা—'

সন্তু বেরিয়ে যেতে শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি উবু হয়ে মেঝেতে বসলো। আগেকার মোটা চাদরের স্টিলট্রাঙ্ক। তাতে জোড়া তোলা। ট্রাঙ্ক খুলে শশাঙ্ক একবার ভেতরে তাকালো। ভেতর থেকে ন্যাপথলিনের কড়া গন্ধ নাকে উঠে আসতেই ভীষণ নিশ্চিন্ত লাগলো শশাঙ্কর। তাক থেকে গ্যামাকসিনের কৌটটা এনে সাবধানে অল্প একটু ছিটিয়ে দিল। তারপর ট্রাঙ্ক বন্ধ করে একখানা দশ টাকার নোট বিছানার ওপর চাবির গোছা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলো। পান নিয়ে ফিরে সন্তুর নিশ্চয় এ দৃশ্যটা ভালো লাগবে।

পান চিবিয়ে শুতে শুতে প্রায় বারোটা। শশাঙ্ক লুঙ্গি পরে শুয়ে পড়ল কাৎ হয়ে। 'কী হল? শুয়ে পড় বাবা।'

সন্তু বলল, 'শুচ্ছি। তোমার একখানা দশ টাকার নোট পড়ে রয়েছে বাবা।'

—'ওখানা তোমার সন্তু। তোমার জন্যে রেখেছি।'

—'আমার !'

—'হ্যাঁ সন্তু। এই দশ টাকা কাল তুমি তোমার ইচ্ছেমত খরচ করবে।'

নোটখানা এক লাফে তুলে নিয়ে সন্তু গায়ের জামা খুলে ফেলল। 'আলো নিবিয়ে দি বাবা ?'

—'দে।'

শুয়ে শুয়ে দু'জনে তখনই ঘুমোতে পারল না। দুজনকেই কাৎ হয়ে শুতে হয়েছে। এতক্ষণ লেবেল ছাপানোর ট্রেডল মেশিনের আওয়াজও সন্তুর ভাল লাগছিল শুনতে। অল্পবয়সে সে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' পড়েছিল। তাতে বাবার সঙ্গে অনু কী একটা পাখি দেখতে বেরিয়েছিল। কুঠীর মাঠে।

এখন সন্তুর পরিষ্কার মনে হচ্ছে, সে আর তার বাবা কালো নদীর ভেতর দিয়ে গভীরভাবে নৌকোয় এক জায়গায় যাচ্ছে। গলুইয়ের ভেতর এক বিছানায় তারা শুয়ে। নৌকোটা দুলছে। এভাবেই লোকে রাতে পারাপার করে।

এর আগে শশাঙ্ক কোনদিন সন্তুর কাছাকাছি গা ঘেঁষে এতক্ষণ একসঙ্গে থাকেনি। হ্যাঁ থেকেছে। সন্তুর সেই ছোটবেলায়। এখন ছেলে তার যুবক হয়ে যাচ্ছে। গায়ে আলাদা রকমের গন্ধ। এক সময় শশাঙ্কর মাঝখান থেকে ছেলে-মেয়েগুলো বড় হয়ে গেল। শশাঙ্কর ভীষণ কষ্ট। এটাকেও আর কোলে নেওয়া যায় না। লাফিয়ে লাফিয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে সব। আর কেউ কোনদিন রাতে তার আর রজনীর মাঝখানে অয়েলক্লথে শোবে না। এই বড় হয়ে যাওয়াটা সেই সময় শশাঙ্কর ভীষণ বিচ্ছিরি লাগতো।

—'তুই আর পরীক্ষা দিলি না কেন সন্তু ?'

অন্ধকারে সন্তু বলল, 'আমার যে ক্যালি নেই বাবা।'

—'ক্যালি ?'

—'ক্যালিবার। যোগ্যতা।'

—'কী করে বুঝলি ?'

—'আমি যে ঘ্যাম্ বাবা !'

—'ঘ্যাম্ ?'

—'ঘ্যাম্ মানেও জানো না বাবা ! ঘ্যাম্ মানে—যে ঢুকতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাই আমি পুরু হয়ে গেলাম।'

—'পুরু ? পরিষ্কার করে বল।'

—'পুরু হল—যার আর কিছু হবে না।'

অন্ধকারেও শশাঙ্কর মুখখানা কালো হয়ে গেল। তার একমাত্র ছেলে সন্তু। ও যখন হামাগুড়ি দিত—একদিন রজনী তখন বলেছিল—'ওকে ডাক্তারি পড়াবো।'

শশাঙ্ক বলেছিল, 'মাসে দু'তিনশো টাকা লাগে। পাবে কোত্থেকে?'

—'অনেক আগে থেকে জমাতে শুরু করব।'

এখন সেই সন্তু! সেই রজনী! সেই নিজেই বা কোথায়!

—'আমায়, শ'তিনেক টাকা দিতে পারো বাবা?'

—'কি করবি?'

—'খাতা, কলম, পেন্সিলের ব্যবসা করব। স্কুলের গেটের একটা জায়গা দেখেছি।'

—'তার চেয়ে তুই নিজে আবার পড় না সন্তু।'

—'আমি যে বং হয়ে আছি বাবা।'

—'বং? বং কি জিনিস সন্তু?'

—'আমাকে বাবা তিন বছর পরীক্ষায় বসতে দেবে না।'

—'সে-তিন বছর এখনো কাটেনি সন্তু?'

—'কেটেছে বাবা। কিন্তু আমায় তো কোন স্কুল নেবে না আর।'

—'প্রাইভেটে দিয়ে দে সন্তু। আমি তোর জন্যে টিচার রাখবো।'

—'আমার যে কিছু মনে নেই বাবা। আমি এখন ক্লাস থ্রির জিনিসও বুঝি না। আমার ড্রেন ফেটে গেছে বাবা!'

—'ড্রেন?'

—'ড্রেন হল গিয়ে ভাগ্য! আমার ভাগ্যের পাইপটাই ফুটো। তুমি আর কি করবে বাবা।'

—'এসব ভাষা শিখলি কোত্থেকে? আমরা তো জানি না সন্তু।'

—'বাবা তোমরা যে কত জিনিস জানো না তাই ভাবি! যাগগিয়ে। আমায় তিন-চারশো টাকা দেবে বাবা? খাতা কাগজের ব্যবসাটা করতাম তাহলে।'

—'অত টাকা কোথায় পাবো সন্তু। দেখছিস তো কোথায় থাকি আমি।'

—'দুশো টাকা দাও তাহলে।'

—'আমার যা ছিল তাই তোকে দিলাম সন্তু। তোর মায়ের কাছে চাইলে পারিস। চেয়েছিস কখনো!'

—'দেবে না বাবা। খুব কাই আছে। ওঃ! তুমি তো আবার কাই বোঝো না। কঞ্জুষ জানো?'

—'নে ঘুমিয়ে পড়। রাত হল।'

অভ্যেস মত শশাঙ্ক ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘটাং করে আওয়াজ হতে লাফিয়ে উঠল শশাঙ্ক। 'কে? কে?'

অন্ধকারে হা হা করে হেসে উঠলো সন্তু। 'বাবাটা তো খুব ভীতু আছে। চেঁচাচ্ছো কেন? আমি। আমি সন্তু। বাথরুমটা কোনদিকে।'

—'ওঃ! আমি ভেবেছি—খুব গুঁতো খেয়েছিস।'

—'এখন আর বকিয়ো না। ভাল লাগছে না মাইরি! পেচ্ছাব করবো। বাথরুম কোন্দিকে?'

—'বাথরুম নেই তো। দাঁড়া দেশলাই জ্বালি।'

—'তুচ্ছাই। তাড়াতাড়ি করো না।'

দেশলাই জেলে ছেলেকে শশাঙ্ক নোংরা গলিপথটা দেখিয়ে দিল। 'তুই কর। আমি আরেকটা কাঠি জ্বালি।'

সন্তুর মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল। অন্ধকার। নোংরা। দুর্গন্ধ। মশা। এই হল গিয়ে তার বাবার আস্তানা। এই ঘণ্টা দু'য়েকে বাবাকে নিয়ে তার ভাল ভাল ভাবনাগুলো একদম ব্যাংচ্যাপটা হয়ে গেল।

শশাঙ্ক প্রথম ধাক্কা খেয়েছে—সন্তুর মুখের ওই সাংকেতিক ভাষায়। তারপর একটু আগে সন্তু বলেছে—বাবাটা। আরো তিনটে কাঠি জ্বালাতে হল শশাঙ্ককে। এই মাঝরাতে এমন দমবন্ধ গলিতে কোত্থেকে যে ভুতুড়ে বাতাস এসে ঢোকে। একদম বেআক্কেলে বাতাস।

বেলা আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো শশাঙ্কর। সন্তু নেই। কখন উঠে গেছে। চা খেতে গিয়ে বুঝলো যাবার সময় সন্তু তার পাঞ্জাবির বুক পকেট হাতড়ে সাতটা টাকা আর খুচরো যা ছিল নিয়ে গেছে। একদম মুছে নিয়ে গেছে। ভিখারি চাইলে দেবে এমন একটা ডবল পয়সাও রেখে যায়নি।

এই প্রথম একটা সকালবেলায় রজনীর জন্যে শশাঙ্কর ভীষণ কষ্ট হল। কী করে যাচ্ছে মেয়েটা। তার ছেলে এই। রজনী নিজে হাউসে যায়। হিসেব করে। স্টেজে দাঁড়ায়। পোস্টারে তার বড় ছবি। পাবলিশিটিতে বড় বড় টাইপে তার নাম। অথচ ছেলে? তার একমাত্র ছেলে? তাদের দু'জনের ছেলে! এই বাহান্ন বছর বয়সে অনেকদিন পরে শশাঙ্কর চোখে জল এসে গেল। ঘরের ভেতরটা

অন্ধকার। বাইরে কলকাতা একটু পরেই প্রচণ্ড রোদে তেতে উঠবে। আশ্চর্য! কলকাতা পৃথিবীর কতখানি জায়গা জুড়ে শুয়ে আছে। বিরাট লাস পড়ে আছে।

শশাঙ্ক দোর আটকে অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালালো। তারপর উবু হয়ে বসে খাটের নিচের স্টিলের ট্রাঙ্কটা টেনে বের করল। ডবল তালা খুলে ফেলে ডালা তুলতেই ন্যাপথলিনের গন্ধ ভক করে তার নাকে এসে গুঁতো দিল। সঙ্গে গ্যামাকসিনের গা গুলোনো গন্ধ। তবু চোখ ফেরাতে পারলো না শশাঙ্ক। হাতি আঁকা একগাদা বাণ্ডিল পরপর সাজানো। একদিকটা শাদা। সেখানে তিন সিংহির জলছাপ। আলোয় ধরলে স্পষ্ট দেখা যায়। এখন ট্রাঙ্কের গলায় গলায় বাণ্ডিলের থাক। শশাঙ্ক ডালা আটকে তালা দিল। তারপর ট্রাঙ্কটাকে খাটের নিচের অন্ধকারে পাঠিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ভরত হলে এত সকালে থাকবার মধ্যে দারোয়ান, ক্যান্টিন বয় আর চণ্ডীবাবু। চণ্ডীবাবু ঘুম থেকে ওঠে সবার শেষে। তাই শশাঙ্ক যখন হাউসের ভেতর ক্যান্টিনের উঠোনে গিয়ে হাজির হল—তখন চণ্ডীবাবু অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বাইরে কলশোয়েব সেট বাসে করে নিয়ে যেতে হয়। সেটগুলো খুলে বাসের ছাদে বসিয়ে দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে তবে যাত্রা। হাইওয়ে দিয়ে চললো 'পঞ্চমুখ'। সারারাত ধরে। ভোর ভোর থামে গিয়ে দুর্গাপুর, বনগাঁ, শিলিগুড়ি। দু'এক সময় দুপুর হয়ে যায়। যেমন অণ্ডালে হয়েছিল।

সেটের জোড় আলগা হয়ে যাওয়ায় দু'জন কাঠের মিস্ত্রি ভোর থেকে কাজে লেগেছে। হাতুড়ির খটাখট। র‍্যাঁদার শব্দ। গ্যারেজে দু'খানা গাড়ি ঘুমুচ্ছে। সবুজ লনে ভোরবেলাতেই দুটো পাখি। দারোয়ান জিভ ঘষতে ঘষতে এসে শশাঙ্কর সামনে দাঁড়াল। শশাঙ্ক তখন উবু হয়ে বসে মিস্ত্রিদের সঙ্গে ভাব করছিল।

দারোয়ানের কথায় শশাঙ্ক বলল, 'এই একটু কথা বলছি।'

—'বেশি সময় নিবেন না। হিরো হিরোইন আসবার আগে চলে যাবেন বাবু। দেখলে হামার চাকরিটা খতম।'

—'তোমার বাড়ি কোথায় বাবা?'

—'দ্বারভাঙ্গা।'

—'নাম কি?'

—'লালন ঝা।'

—'মাইনে কত পাও ?'

—'সে ভালো দেয়। খারাপ বলতে পারবো না। কেন ? আপনার দারোয়ানির লোক লাগবে ?'

—'এখন না। পরে লাগতে পারে তো। হিরোইন কখন আসে বাবা ?'

—'ঠিক নাই। এমনিতে এগারোটা বাজতেই গাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে। আবার কখনো সকাল সকাল চলে আসেন।'

—হিরো ?'

—'অমিয়বাবু ? তিনি তো ঠিক এগারোটায় আসবেন। কেন ? হাপনার চিনা আছে ?'

—'নারে বাবা। আমি চিনবো কোত্থেকে। এখন তো দেশসুদ্ধ লোক চেনে ওদের। আমায় এক কাপ চা খাওয়াও তো বাবা।'

—'ক্যান্টিন তো খোলেনি এখনো। পয়সা দিন। নিয়ে আসছি।'

শশাঙ্ক বেশি করেই পয়সা দিল। যাতে মিস্ত্রি দু'জন আর লালনের জন্যেও চা আসে। এবার মিস্ত্রিরা বেশ মন খুলে কথা বলতে লাগলো।

কবিয়াল চলবার সময় সেট কসটিউম দেখতো রজনী নিজে। ও বড় হয়েছে সেটের ভেতরে। লাইট রজনীর নখদর্পণে। সাউণ্ড রজনীকে ফাঁকি দিতে পারবে না। কোথায় মাইক বসালে আওয়াজ বাড়ি খেয়ে ফিরে আসবে না—তার প্রায় নির্ভুল আন্দাজ রজনীর আছে। এসব শশাঙ্কর নিজের চোখে দেখা। বিশেষ করে কবিয়াল স্টেজ হওয়ার সময় থেকেই।

কথা বলে যা আন্দাজ পেল তাহল এরকম মোটামুটি একটা সেট বানাতে অন্তত দু'মাস ধরে চারজন মিস্ত্রিকে একটানা কাজ করতে হবে। হাতের কাছে সব জোগাড় থাকা চাই। নইলে আরো দেরি হবে। মনে মনে একটা এস্টিমেট নিচ্ছিল শশাঙ্ক।

—'আপনি থিয়েটারের দল খুলছেন বাবু ?'

—'নারে পাগল ! এমনি জানতে ইচ্ছে হল তাই—'

—'লাগান না একটা থিয়েটার। একটি মেয়েছেলে চাই—'

বেঁটে মত অন্য মিস্ত্রি বলল, 'একটিতে হবে না বাবু। দু'তিনটি মেয়েছেলে চাই। একজন গাইবে। একজন নাচবে। তবে না জমবে—'

—'তোমরা এ থিয়েটার দেখেছো ?'

—'কতবার! এখানে একটি গায়। একটি নাচে। আরেকটা কাঁদে বাবু। খুব সুন্দর কাঁদে বাবু।'

—'কারটা ভালো লাগে তোমাদের।'

—'সে বলতে গেলে রজনী দিদিমণিরটাই সবচেয়ে ভালো। উনি তো জমিয়ে রাখেন। শুনিছি ভদ্দরঘরের বউ। পয়লা সিনে একটু যা জামাকাপড় খুলতে হয় —নইলে নাটক তো মন খারাপ করে রাখে।'

—'তোমরা দেখেছো?'

—'হাসালেন বাবু। আমরা কতবার দেখলাম। আমাদের তো টিকিট লাগে না। শেয়ালদার সব রিক্শাওয়ালার দেখা হয়ে গেল বাবু। ওরা দেখতে দেখতে সিটে পা তুলে, রজনী দিদির জন্যে ঠিক কাঁদবে। আপনি দেখেননি এখনো?'

শশাঙ্ক থতমত খেয়ে গেল।

তার সামনে তখন একদম দেবদূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চণ্ডীবাবু। সারারাত বেশ ভালো ঘুম হয়েছে।

—'আপনি কী মনে করে শশাঙ্কবাবু। আসুন আসুন। ভেতরে এসে বসবেন। আমি চণ্ডী।'

শশাঙ্ক মনে মনে বলল, এই হল গিয়ে সেই চণ্ডী। অমিয়র বিখ্যাত বাহন। শুনেছে, এরই কাছে ক্যাশের চাবি থাকে। চণ্ডীই ভাউচার সই করিয়ে টাকা দেয়। গ্রুপ থিয়েটারে কাগজে কলমে তো মাইনে নেওয়া যায় না। অ্যালাউন্স বলে নিতে হয়। তারপর ভেতরে ভেতরে যার যা পাওনা তা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। সেজন্যে আলাদা দু'নম্বর খাতা থাকে। সেই দু'নম্বর খাতার হিসেব তাহলে এই চণ্ডী দেখে। শশাঙ্ক মুখে বলল, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম—তাই ঘুরে গেলাম।'

—'আপনি আছেন জানলে ভেতরেই যেতাম।'

—'আমি তো এখানেই থাকি। আসুন। আপনি এসে ফিরে গেছেন জানলে আমার ওপর খুব একচোট নেবে।'

—'আমি তো আসি নি।'

—'আসি নি মানে! এইতো এসেছেন। এক কাপ চা খেয়ে যান।'

—'এই তো খেলাম চা।'

—'আর এক কাপ খাবেন। চা বই তো বেশি কিছু নয়।'

শশাঙ্ককে একদম সাজঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো চণ্ডী। এলাহি কাণ্ড। সব দেখে শশাঙ্কর তো চক্ষুস্থির।

—'অ্যাতো সব কবে হল ?'

—'আপনি থেয়েটারের লোক। আপনি কদর দেবেন শশাঙ্কবাবু। দোতলা তেতলার ঘর গেঁথে তোলা হয়েছে পঞ্চমুখের। গ্রীনরুমে এখন সবার জন্যে আলাদা আয়না, আলাদা পাখা। ঠাণ্ডা কিছু খাবেন ?'

—'দিন।' বলেও শশাঙ্কর নিজেকে বড় দীনহীন লাগতে লাগলো। তখন চণ্ডী ঢাউস ফ্রিজের ডালা খুলে তার জন্যে ঠাণ্ডা লেমন-বার্লি বের করছে।

—'এ বাথরুমটা কার ?'

—'যাবেন ?'

—'না। একদম নতুন।'

—'অমিয়বাবুর জন্যে তৈরি হয়েছে। ওপাশেও একটা তৈরি হয়েছে। রজনী দিদিমণি আর অন্য মেয়েদের জন্যে।'

ঠাণ্ডা লেমন-বার্লি খেতে খেতে শশাঙ্কর চোখ চারদিক দেখছিল। আগাগোড়া একটা গোছানো হাতের চিহ্ন। জায়গামত সিন বাই সিন কসটিউমের হ্যাঙার ঝুলছে। ইলেকট্রিক ইস্ত্রির জায়গা। বিরাট দুটো পাখা দাঁড়িয়ে। সামান্য বাতাসে অমিয়র মেকআপ নেওয়ার হাইচেয়ারের পাশেই ভারি পর্দাটা দুলে উঠলো। শশাঙ্ক দেখলো ভেতর দিকে একজোড়া রাজকীয় ইজিচেয়ার। একখানা ডবল বেডের পালঙ্ক। তাতে গাঢ় লাল রংয়ের সুজনি পেছনের জানলা থেকে আলো পেয়ে ঝকঝক করছে।

গ্লাসধরা শশাঙ্কর হাতখানা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 'আমি উঠি চণ্ডীবাবু।'

—'বসুন না। আপনি আর আমি তো থিয়েটারের পুরনো লোক।'

—'আমি আর কোথায় থিয়েটারের চণ্ডীবাবু। আপনারাই—'

—'আমি আর যাবার জায়গা পাইনি কোথাও। থিয়েটারে থেকে গেলাম এ জীবনটা—'

—'কদিন হল আপনার ?'

—'বত্রিশ বছর। এখন যে দলেই থাকবো—আমার জন্যে, একটা বিট রোল তৈরি হবে। আমি আজকাল সুজাতায় সেকেণ্ডের ভেতর হাউহাউ করে কেঁদে উঠি। জিনিসটা অডিয়ান্স খুব নেয়। এই ফতুয়া গায়েই স্টেজে ঢুকে পড়ি। এ ফতুয়া পরেই রাতে শুয়ে থাকি। সাজঘরই আমার বাসরঘর বলতে পারেন।'

—'দিব্যি কাটিয়ে দিলেন বলুন।'

—'আর কাটবে বলে মনে হচ্ছে না। অমিয়র মাথায় ভূত চেপেছে। এ নাটক তুলে দেবে।'

—'রজনী কি বলছে?'

—'আপনার স্ত্রীর জন্যেই তো এ নাটক টিকে আছে। আমরা বাকি সবাই টিম ওয়ার্কের সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি শুধু। তা রজনীও একদিন বেঁকে বসতে পারে। যতই বক্সঅফিস হোক—একঘেয়ে তো।'

চণ্ডীর মুখে 'আপনার স্ত্রী' কথাটা শুনে অনেকদিন পরে বড় ভালো লাগলো শশাঙ্কর। তার শ্বশুর, শাশুড়ি, স্ত্রী—সবাই তো থিয়েটারের। সে নিজেও এতকাল থিয়েটারের অন্নে পালিত। তার ছেলেমেয়েরাও ওই একই অন্নে বড় হয়ে উঠেছে। থিয়েটার তার শ্বশুরবাড়ি। থিয়েটারের সে ঘরজামাই।

মন্দ লাগছিল না সকালবেলাটা। শশাঙ্ক ভাল করেই জানে—রজনীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ির খবর এই চণ্ডী লোকটার অজানা নয়।

—'আমাদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না শশাঙ্কবাবু।'

শশাঙ্ক তো এসবই শুনতে চায়। কিন্তু কোন আগ্রহ না দেখিয়ে কান খাড়া করে বসে থাকলো। মুখে দার্শনিকের টাচ দিয়ে বলল, 'সময় তো সবসময় একরকম যায় না।'

—'সুজাতার স্টোরি বইটার বিনয়বাবু ছোট আদালতে মামলা দিয়েছে। ভরত হলের শ্রীরাম ট্রাস্ট উচ্ছেদের মামলা চালাচ্ছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই লাইন কাটবো কাটবো করছে। ইনকাম ট্যাক্সের লোকের ঘোরাঘুরি তো আছেই—'

—'অমিয়বাবু কদিক সামলাবেন একা।'

চণ্ডী বলল, 'এই শরীরে রোজ সকালবেলা কাগজপত্তর হাতে গিরিশ ঘোষের মত উকিলবাড়ি করছে।'

—'অমিয়বাবুর শরীর খারাপ? কোথায়? জানি না তো।'

—'খোঁজ নিলে তো জানবেন। রজনী দিদিরও তো শরীর ভালো না, গলা বসে যাচ্ছে। ডাক্তার ছ মাস রেস্ট নিতে বলেছে।'

এখানে শশাঙ্ক আর কিছু বলতে পরল না। তার নিজের স্ত্রীর খবরই সে কিছু রাখে না। মনো বা সরী কেউ তো কিছু বলে নি তাকে। হ্যাঁ, না—কোনটাই এখন সে বলতে পারছে না। ও:দের দুঃসংবাদগুলো শশাঙ্কর কানে মধু হয়ে ঝরে পড়েছিল। মনে মনে বলছিল, এই তো চাই। গ্রুপ থিয়েটার যখন বড় ব্যবসা হয়ে যায়—তখনই তো এ সবের শুরু হয়।

চণ্ডী বলল, 'এর মাঝে নন্দনা দিদি আবার যাত্রায় কেটে পড়ল। ফলে আপনার স্ত্রীর আর রেস্ট জুটলো না কপালে।'

শশাঙ্ক উসখুস করছিল। এখন তার ওঠা দরকার। কারণ আজ যদি সুজাতা নাটকে হিরোইন সকাল সকাল হাউসে এসে দেখে তারই খেদানো স্বামী গ্রীনরুমে বসে তারই ফ্রিজের লেমন-বার্লি খাচ্ছে তাহলে ব্যাপারটা কোথায় গড়াতে পারে?

শশাঙ্ক চেয়ার থেকে একদম লাফিয়ে বেরিয়ে এল। 'আরেক দিন আসবো চণ্ডী-বাবু।'

এদিকে এলে আমাদের খোঁজ নিয়ে যাবেন অবশ্য। আমি আপনি—আমরা যে থিয়েটারের লোক। আমরা আত্মীয় সবাই। কি বলুন।'

বেরিয়ে এসে চণ্ডীর কথাগুলো আদৌ খেজুরে আলাপ বলে মনে হল না শশাঙ্কর। আজ যদি তৃপ্তি বেঁচে থাকতো। লোকটা কিন্তু অন্যের সুখে সুখী হোত। দুঃখে দুঃখ পেত। পঙ্কমুখের উঠে দাঁড়ানোর খবর শুনে কিন্তু সুখীই হোত তৃপ্তি।

কিন্তু রজনীর জন্যে কী যে হয়ে গেল লোকটার। কোন লুকোছাপা ছিল না। শশাঙ্ককে পরিষ্কার বলল, 'তোর বউকে আমি ঠিক বিয়ে করতাম।'

—'তোমার তো সংসার রয়েছে তৃপ্তিদা।'

—'গুলি মারো সংসার। সংসার তো রজনীরও আছে—'

—'ঠিকই তো। কী করে বিয়েয় বসবে তোমার সঙ্গে?'

—'গুলি মেরে চলে আসুক।'

—'তাহলে তো আমাকেই গুলি খেতে হয় প্রথম। আমি রজনীর হাজব্যাণ্ড।'

—'কি বললি শশাঙ্ক? আরেকবার উচ্চারণ করতো।'

—'হাজব্যাণ্ড। কেন?'

—'তুই হাজব্যাণ্ড রজনীর? বাই অ্যাক্সিডেন্ট। যা সত্যি তাই বলবো।'

—'কেন? আমায় মানায় না তৃপ্তিদা?'

—'আবার দাদা-ফাদা কি? শুধু তৃপ্তি। তুই আমার বউকে বিয়ে কর। সেখানেও ছেলেপেলেসুদ্ধ সংসার পাবি। রজনীকে ছেড়ে দে।'

—'তুমি খুব পরিষ্কার লোক, এজন্যে বেশ ভালো লাগে তোমায়। কিন্তু রজনীকে আমি ছাড়ব কেন? সে তো আমায় নাও ছাড়তে পারে।'

—'তোমার জন্যে ডালা সাজিয়ে বসে আছে! বউয়ের রোজগারে খাস—তোর লজ্জা করে না?'

—'আমি তো কোন কাজ জানি না। তোমার মত ইজি সলিউশন ক'জন পারে এ-বাজারে!' শশাঙ্ক তার নিজের মুখের এই পুরনো কথাটাই বিড়বিড় করে বলতে বলতে ট্রাম লাইন পার হল।

॥ উনিশ ॥

থার্ড সিনে অমিয় সাত মিনিটের একটা রেস্ট পায়। তখন বড় পাখাটার নিচে বসে এক কাপ গরম কফি আর ট্যাবলেট খেল দুটো। ডাক্তারের কথামত চলতে হচ্ছে এখন তাকে। ঠিক সেই সময় যতীনবাবু এসে হাজির।

ড্রয়ার থেকে কাগজ মোড়া প্যাকেটটা তার হাতে তুলে দিল অমিয়।

—'কত আছে?'

—'পাঁচশো। এখন এই নিয়ে যান। আর পারছিনে। পরে দেখা যাবে।'

—'বড় আশা করে এসেছিলাম তোমার কাছে অমিয়। তুমি আমার পুরনো-কালের থিয়েটারের লোক। মেয়ের বিয়ে বলেই হাজার টাকা চেয়েছিলাম। কোন উপায় থাকলে চাইতাম না। আজকাল তো কাজ পাই না কোথাও।'

চণ্ডী এসে অমিয়কে উদ্ধার করল। প্রায় দাঁত খিঁচিয়েই বলল, 'পেয়েছেন কি আপনারা? সিনের ভেতরে এসে সাহায্য চাইবেন? নাটক বক্স অফিস বলে পাখির মেলা বসেছে গাছে! এখনকার মত ওই নিয়ে যান। যান এখন।'

অমিয় চোখ নামিয়ে বসে থাকল। না থেকে উপায় ছিল না। কপালের ঘাম তুলো দিয়ে শুষে নিচ্ছিল চণ্ডী। পাছে মেক-আপ লেপটে যায় ঘষাঘষিতে।

—'আমাদের অবস্থা বড় ভালো চণ্ডীদা! সবাইকে দিয়ে থুয়ে আমার কপালে জোটে বদনাম আর পণ্ডশ্রম। তবু কাউকে খুশি করতে পারি না।'

—'যাও কেন খুশি করতে। কী দরকার?'

—'আমি থিয়েটার গুটিয়ে যাত্রায় চলে যাব। মাস গেলে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে। বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়ালটি। কারও সাত পাঁচে থাকতে হবে না। খাবো-দাবো ঘুমোবো আর স্টেজে উঠে চেঁচাবো।'

—'তাই ভালো। কারও জন্যে কিছু করে খুশি করতে পারবে না।'

—'সেটা সত্যি।' বলেই অমিয় থ্রি বাই ফাইভ মেক-আপ লাগাতে লাগলো মনে পড়ল—বন্যাত্রাণ ভাণ্ডার, দুস্থ শিল্পীদের জন্যে তহবিল, খরায় রিলিফের জন্যে সে থোকে থোকে পঞ্চজনের হয়ে নানারকমের ফাণ্ডে কত টাকা দিয়েছে। দিয়ে কাউকে খুশি করা যায়নি। বরং উল্টো ফল ফলেছে। অ্যাকাডেমিতে কাউণ্টার খুলে অভিনয় করতে গিয়ে দেখা গেল তিন ঘণ্টায় সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে।

পরিণাম : অন্য দলগুলো আর তার সঙ্গে কথা বলে না। বড় কাগজগুলো বিজ্ঞাপন নেয়। কিন্তু রিভিউ করে না। নির্বাক। নীরব। বাঙালীর চরিত্রই আশ্চর্য। চোখের ওপর এমন সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে—তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বিদেশে কোন নাটক মঞ্চ সফল হলে—তা একটা খবর। আলোচনার বিষয়। এখানে চিতায় মঠ তোলাই রেওয়াজ। এখানে আণ্ডারডগকে নিয়ে মাতামাতি করাই প্রথা। আণ্ডারডগের ভেতর প্রকৃতই জিনিস আছে কিনা তা কেউ খতিয়ে দেখবে না।

অমিয়র কান খাড়া ছিল মিউজিকের দিকে। জায়গায় মত ডানদিকের এক নম্বর উইংস দিয়ে এন্ট্রান্স নিল। হাউসফুল। আজও একস্ট্রা চেয়ার দিতে হয়েছে। স্টেজে ঢুকেই আশ্চর্য হল। একদম ফ্রন্ট রোয়ে ডানদিকে দু নম্বর সিটে শশাঙ্ক দত্ত বসে আছে।

নির্বিকার চোখে সব দেখে নিয়েই অভিনয় করতে হয়। অমিয় তাই করলো। রজনী সম্ভবত দেখতে পায়নি। পেলে উনিশ-বিশ কিছু হত না। এতদিনের অভিনেত্রী। তবু মনের ওপর চাপ পড়তো নিশ্চয়।

শোয়ের পর অমিয় বলল, 'শশাঙ্ক আজ দেখতে এসেছিল।'

—'জানি।'

—'তুমি দেখতে পেয়েছিলে ?'

—'হুঁ। আরও দেখতে আসবে। ঘন ঘন আসবে।' এবাবে খুলে বলল রজনী। 'ও আবার দল করতে চায়। আমাকেও চায়। কোত্থেকে ফাইনানসিয়ার জুটিয়েছে বলছে।'

—'তুমি চলে যাবে নাকি ?'

—'পাগল হয়েছো! দল গড়ে তোলার লোক ও নয়। বরং ভাঙতে পারে! আমার কথা বলে কোন মাড়োয়ারি হয়ত বাগিয়েছে। ওর তো গুণের কোন ঘাট নেই। আমাকে বলতে এসেছিল।'

—'তা শশাঙ্কবাবু তো আমাদের পঞ্চমুখে জয়েন করতে পারেন।'

—'সেইটেই বাকি আছে। ও যে দলে ঢুকবে—সে দলই ভেঙে যাবে।'

—'মানুষটা পাল্টাতেও তো পারে।'

—'পাল্টালে সবার আগে টের পেতাম আমি। আমি যে ওকে চিনি এতদিন। হয়তো ইচ্ছে হয়েছে দল করার। হয়তো ফাইনানসিয়ার পেয়েছে। দল হল। তারপর যেই দেখবে দলের ভেতর আমি বড় হয়ে উঠছি—নিজের ছায়াটা ওর

ছোট লাগছে—অমনি ও নিজেই দলের ভেতরে আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে সুড়ঙ্গ কাটতে শুরু করে দেবে। এ যে আমি জানি অমিয়। এখন তৃপ্তি নেই। তাই আমাকে অপমানের জায়গাও আর ও পাচ্ছে না—বড্ড অসুবিধেয় পড়েছে। নইলে শশাঙ্ক বসে বসে নাটক দেখার মানুষ ?'

—'ফাইনানসিয়াররা জানে শশাঙ্ক তোমার স্বামী ?'

—'তা জানবে না কেন ? কোর্ট কাছারিতে এখন ফাইনানসিয়ার ঘোরে। কে ধার নিবিরে আয়। সরকার যেভাবে কালো টাকার টুঁটি চেপে ধরেছে তাতে ওদের এছাড়া উপায় কি ? টাকা তো কোথাও লাগাতে হবেই—সিনেমা থিয়েটার মেয়েমানুষ জায়গা জমি—'

—'চুপ কর রজনী। পৃথিবীটাকে আমার ডালিম লাগে। ভেঙে খুলেই শুধু রক্ত।'

অমিয় অন্যদিনের তুলনায় সকাল সকাল বাড়ি ফিরে দেখলো লীলা খুব মন দিয়ে জানলার পর্দা সেলাই করছে। বড়ছেলে একমন দিয়ে অ্যালজেব্রা কষছে। কথাবার্তা বললে শুধু জবাব দেয় লীলা। নিজের উৎসাহে কিছু করে না। বলে না।

অমিয় খানিক জানলায় বসে থাকলো। অন্য নাটক শুরু করার আগে নেপথ্য-বাসিনী এই মহিলার উৎসাহই দেখা যেত সবচেয়ে বেশি। এখন ?

—'ছেঁড়া পর্দা সেলাইয়ের দরকার কি লীলা ? নতুন করে নিলেই তো ভালো হোত।'

সেলাই মেশিনের হ্যাণ্ডেল ঘোরাচ্ছিল লীলা। চোখ সুঁচের ওখানটায়। নতমুখী। ইলেকট্রিকের ভোল্টেজ পালটাচ্ছে বলে আলো কিছু কম। আমার মনে একটি প্রাচীন প্রশ্ন জেগে উঠলো। নারী ও পুরুষ কবে থেকে একসঙ্গে আছে। সভ্যতার গোড়ার দিকে মনের ভাবগুলো মানুষ স্পষ্ট করে প্রকাশ করতো। এখন তা হয় শুধু নাটকে। সলিলকিতে। নয়তো সবাই আমরা মনের ভাব চেপে রাখতে সদা সতর্ক।

—'পয়সা তো আসছে লীলা। আপনা-আপনি হেঁটে হেঁটে চলে আসে।'

—'ও পয়সা তোমার নাটকের। এ সংসার তো আগে কোনদিন থিয়েটারের আয়ে চলেনি।'

অমিয় ভেবে দেখলো কথাটা তো মিথ্যে নয়। বরং সংসারের পয়সা থিয়েটারে চলে গেছে। আগে নাটক নামার মুখে বাড়িতেও সাজো সাজো রব পড়ে যেতো।

স্কুল থেকে ফিরে লীলা খোঁজখবর নিত। নাটক উপলক্ষে এমন কি দু-একটা নতুন রান্নাও বসিয়েছে।

লীলার কপালে মাথায় কালো চুলের ঢাল মানানসই বসানো। এতদিনের টানা-টানির সংসার চালিয়েও মুখখানা লীলা বুড়োটে হতে দেয়নি। বরং এখন সে-মুখে তেজের চিহ্ন। তার সঙ্গে বিষণ্ণ ভাবটা মিশে গিয়ে একটা নতুন রহস্য পেয়েছে সে মুখ।

অমিয় এখুনি বলতে পারে—জানো লীলা, রজনীকে জড়িয়ে তুমি শুধু শুধুই আমার সম্পর্কে নানারকম ভেবে যাচ্ছো। আসলে কিছুই হয়নি। হয়েছে যা—তা হল—আমার আর রজনীর কষ্ট বেড়েছে। রজনী এমনিতে দুঃখী মানুষ। সে তার জীবন থেকে শশাঙ্ককে ঝেড়ে ফেলেছে। কিন্তু আমাকেও তার জীবনে সে নিতে পারবে না। কারণ, আমাকে ভালবাসে। সেই সুবাদে তোমাদেরও।

আমি তোমার লীলা। তুমি আমায় নিতে ভুলে যাচ্ছো। তোমার নিজের ভুলে। নয়তো আমি তো বদলাইনি। যা ছিলাম তাই আছি। সন্দেহ তোমার বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তো তোমাকে চাই।

এসব কোন কথাই অমিয় বলতে পারলো না। রাত দশটায় ঘুমের প্রচণ্ড আক্রমণে সে কাবু হয়ে গেল। লীলা যখন তাকে তুললো ছেলেমেয়েদের ঘর অন্ধকার।

—'ওরা খেয়েছে?'

—'অনেকক্ষণ। খাবে এসো।'

এরকম ডাক পেয়ে অমিয়র ভালোই লাগলো। চোখে মুখে জল দিয়ে এসে বসলো।

—'তুমি খাবে না লীলা?'

—'খিদে নেই। তুমি খেয়ে নাও।'

—'একা একা আমি খেতে পারিনে।'

—'আমি বসছি।'

কলের পুতুলের কায়দায় লীলা কাছাকাছি বসলো। মুখে কোন হাসি নেই।

অমিয় খানিকটা ভাত মেখে দু-তিন গ্রাস খেয়েই উঠে পড়লো। লীলার মুখে কোন ছায়া পড়ল না। তার দিক থেকে ভালো করে খেয়ে ওঠার কোন অনুরোধও পেল না অমিয়। লীলা দিব্যি থালা তুলে নিয়ে জায়গা মুছে ফেললো। পান সেজে অমিয়কে দিয়েই মশারি টাঙাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

আরও বেশি রাতে অমিয় লীলাকে কাছে আনতে গিয়ে দেখলো—দিব্যি

করাতকলের কাঠের গোলাইয়ের মতই লীলা তার দিকে গড়িয়ে এল। এভাবেই কাঠ, লরি থেকে নামে। আবার লরিতে ওঠে।

—'তোমার কি আজকাল আমাকে ভালো লাগে না?'

—'ভালোমন্দ বুঝি না। ছেলেমেয়ে রান্না-বান্না স্কুল নিয়ে আছি।'

—'আমি তোমার হিসেবের বাইরে পড়ে গেছি।'

অনেক রাতে অমিয় লীলাকে সবচেয়ে সহজ রাস্তা দিয়ে পাওয়ার চেষ্টা করলো। যে-পথে মানুষ মাত্রেই ধরা দিয়ে থাকে। ঘুমের ভেতর লীলা অসাড় হয়ে পড়েছিল। অমিয় খুব ঘন করে চুমু খেয়ে দেখলো, না সেই বউই তো আছে। তখনো হারানো জিনিস দখল বজায় বাখার তাগিদে মানুষ যা করে— অমিয় তাই করলো। সঙ্গে সঙ্গে লীলা অমিয়কে নামিয়ে দিল, 'ভালো লাগছে না। সারাদিন খাটাখাটুনির পর শরীর বয় না—'

অমিয় চুপ করে থাকলো। আমার এ অধিকারটাও হারিয়ে বসে আছি। মনে মনে নিজেকে এই প্রশ্নটা করে অমিয় অন্ধকারে মশারির ছাদের দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে থাকলো।

একসময় দেখলো, লীলা উঠে যাচ্ছে। খানিক শুয়ে থেকে বুঝলো তার বিবাহিত স্ত্রী এখন বিছানায় ফিরবে না। অমিয় উঠে এসে ঝুল বারন্দায় লীলাকে পেল। রাস্তার আলো পড়ে একদম পাথরের মূর্তি। চোখে জল।

- 'শুধু শুধু কাঁদছো লীলা।'

—'আজকাল কাঁদতে আমার ভাল লাগে।'

—'আর কি ভালো লাগে লীলা?'

—'কাগজে অ্যাক্সিডেন্টের খবর। দার্জিলিংয়ে ধস নেমেছে বলে খবর বেরোলে আমি অনেকক্ষণ ধরে পড়ি। পড়তে ভালো লাগে আজকাল।'

—'আর কি ভালো লাগে?'

—'ট্রেন দুর্ঘটনা। কাছাড়ের বন্যা। চাসনালার খনিতে প্লাবন। তুরস্কে ভূমিকম্প—'

—'কী হচ্ছে লীলা?'

—'চেঁচিও না। আগে জানতাম, সংসার চালু রাখতে আমার চাকরি। নাটক করতে তোমার উদয়াস্ত পরিশ্রম। এখন তো সব মিথ্যে হয়ে গেছে। আর মানে হয় না!'

—'কেন?'

—'তুমি যে টাকা দাও সংসারে—তাতে আমার চাকরি—তোমার নাটকের আইডিয়াল—সবই কি মিথ্যে হয়ে যায়নি ? ভেবে দেখো। টাকাই সব সমান করে দেয়। রেকগনিশনের আরেক নাম বোধহয় টাকা। যেটা তুমি পেয়েছো। যা আমাদের সচ্ছল করেছে। যা সব নষ্ট করে দিল।' বলতে বলতে গলা বুজে গেল লীলার। 'জানো—আজকাল প্রত্যেকটা এক টাকার নোটে আমি বাসি কুচো চিংড়ির গন্ধ পাই।'

—'পাবেই তো! প্রত্যেক গুপ্তধনের নিচে খুঁড়লেই অন্তত একটা কঙ্কাল পাওয়া যায়।'

—'তুমি তো জ্ঞানপাপী।'

—'না হয়ে উপায় কি বল লীলা? আমরা যে দর্শক স্নেহধন্য! মঞ্চসফল সুজাতা নাটকের পাটাতনের নিচে আজ এক বছরের ওপর আমি কঙ্কাল হয়ে শুয়ে আছি।'

—'শুয়ে শুয়ে তো তুমি নোট গুনতে থাকো। হাউসফুলের নাটক! একস্ট্রা চেয়ার-পিছু সাড়ে দশ টাকা! সাকসেসের আঁষটে গন্ধ তোমার নাকে লাগে না?'

—'লাগে লীলা। কিন্তু কোন পথ তো নেই। অ্যাতোগুলো লোকের অন্ন।'

—'কেন? তোমার আরাম? অয়েল পেন্টিংয়ের জন্যে তোমার সিটিং! আর এক বছর সুজাতা চললে বাংলা থিয়েটারে তোমায় সবাই চাইকি নটশেখর বলে ডাকবে।'

—'আমায় ঠাট্টা করছো তুমি। কাঁদলে তোমায় সুন্দর লাগে বেশি। আজ রাতে নিশ্চয় তোমায় পাবো।'

—'কেন? আমি কি কোন খাদ্য। না তোমার কোন সঞ্চয়?'

—'ভীষণ কঠিন কথা বলছো। কাছে এসো।'

—'না। তুমি শুয়ে পড়োগে।'

ঝুল বারান্দাটা ছোটো। তার ভেতরেই অমিয় এগিয়ে গিয়ে লীলাকে ধরলো। কোথায় একটা ঘণ্টা পড়লো। রাত একটা বোধহয়। অমিয় বহুদিন পরে লীলাকে চুমু খেলো। ভরতের স্টেজে সুজাতাকে চুমু খাওয়ার অভিনয় এ নয়। অমিয়কে তাই ফোকাস বা মিউজিকের টাইমিং ঠিক করে চুমু খেতে হচ্ছিল না।

চমকে পিছিয়ে আসতে হল অমিয়কে। 'এ তুমি কি করলে লীলা?'

—'বলেছিলাম তো শুয়ে পড়োগে—'

—'তাই বলে কামড়ে দেবে লীলা ?'

—'আমার কিছু ভালো লাগে না—আগেই তো বলেছি।'

অমিয় নিজের ঠোঁটে হাত দিয়ে বুঝলো রক্ত বেরোনি। কিন্তু বেরোতে পারতো। সেইভাবেই কামড়ে ধরেছিল লীলা। এই কি চুমু ফিরিয়ে দেবার রীতি ? এখন লীলাকে কুকুর ভাবতে পারলে সবচেয়ে ভালো ছিল। কিন্তু তার বদলে লীলার জন্য অমিয়র ভেতরটা হু হু করে উঠলো।

—'তাহলে কি ভালো লাগে তোমার লীলা।'

অন্ধকারে একটা বিষাক্ত গুল্মের মতই লীলার শরীরটা ঝুলে আছে। ও পরিষ্কার বলল, 'দুর্ঘটনা ভূমিকম্প ধস—যাতে কি না আরাম হয়। তুমি এসব দিতে পারবে ?'

—'এ কোন লীলা ? একদম চেনা যায় না।'

—'তোমার শংকর এসেছিল। বলে গেছে দাদাকে বোলো, আমি নাটক পাল্টাবার ঝুঁকি নেব না। সুজাতা এখনো হাজার নাইট চলবে।'

শ্রীরাম ট্রাস্টের সম্পাদক হরিসাধন বসু পরিবারওয়ারি তিন পুরুষ ট্রাস্টের সঙ্গে আছেন। ভরত হল ছাড়াও কলকাতার তিনখানা বাজারে ডাব আর সবজির বাজারের ধরতাই পায় ট্রাস্ট। এ বাদেও ট্রাস্ট শহর কলকাতার ভেতর তিনটে বড় পেট্রল পাম্পকে জমি লিজ দিয়েছে। ভদ্রলোক নিজে একসময় সি-আই টি-র ভ্যালুয়ার ছিলেন। তিনি নিজে মামলা বোঝেন। জানেন কি করে উচ্ছেদ করতে হয়। রাজাবাজার থেকে সিমলেপাড়া—সব মহল্লার গুণ্ডাদের এক-সময় চিনতেন। কাউকে কাউকে পুষতেনও। এখন সে-সব গুণ্ডাও ঘরসংসার করে বুড়ো হয়ে গেছে।

সময় সন্ধ্যা। নিবেদিতা স্কুলের কাছাকাছি নিজের পৈতৃক বাড়িতে বসে সম্পাদক মশায় ভরত হলের বকেয়া টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিক বিল, ট্যাক্সের রসিদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। কোন পথ দিয়ে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যাণ্ড কোং-কে ভরত থেকে উচ্ছেদ করা যায়—তারই পথ খুঁজে দেখছিলেন।

সম্পাদক কাগজপত্রে নিজের নাম সই করেন শ্রীহরিসাধন বসু। পাকানো গোঁফে একটা সোনালী তার। গায়ে সুতোলি আটকানো ফতুয়া। পেছনের দেওয়ালে সুন্দর কাঠের ছাতা ঝুলছে। অরিজিন্যাল সাইডের মামলা তদ্বিরে এই চেহারার লোককে হাইকোর্ট পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।

একখানা চেকের হিসেব দেখে আঙুল কামড়ালেন বসুমশায়। তিনদিনের জন্য তিনি গিরিডি গিয়েছিলেন। সেই সময় হলভাড়া ট্যাক্স টেলিফোন বিল ইলেকট্রিক বিল—একসঙ্গে তিন মাসের খরচ পঞ্চমুখ এক চেকে শোধ করে। হলধর কেরানী না বুঝে চেক রিসিভ্ করে জমা দিয়েছিল। এখন মামলায় শ্রীরাম ট্রাস্টের সবচেয়ে বড় কাঁটা এই চেকখানা। হলভাড়া নেওয়ার কথা এখন অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কে ভেবেছিল—ভরত হল একদিন থিয়েটারের এতবড় সেণ্টার হয়ে উঠবে। আগে তো ফাঁকা হলে রামায়ণ গানের সময় পায়রা উড়তো সিলিং থেকে।

এখন বড় বড় ভাড়ার অফার আসছে। আর হরিসাধনের ছটফটানি বাড়ছে। ট্রাস্টিদের ভেতর গোয়াবাগানের জ্যোতিষ গুপ্ত ছাড়া বাকি কারও হিসেব মিলিয়ে দেখার সময় নেই। সুতরাং জ্যোতিষকে ঠাণ্ডা রাখতে পারলে শ্রীহরিসাধন বসু ট্রাস্ট মারফৎ সুখেই থাকতে পারেন।

ছোকরা চাকরটি এসে বলল, 'কাল সকালের সেই বাবুটি এয়েছেন।'

মুখে একটা বিরক্তি ফুটিয়েও হরিসাধনবাবু বললেন, 'আবার? বসতে বলেছিস? পাখা খুলে দিয়েছিস তো?'

চাকরের জবাবের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন না। বড় চিরুনিতে পরিপাটি করে নিজের মাথাটি সিঁথি থেকে দুধারে সিজিল-মিছিল করে নিলেন। তারপর নিচে নেমে এলেন।

—'বলুন শশাঙ্কবাবু! সে জেদ কি আর এখনকার ছেলেমেয়েদের ভেতর আছে! কি খাবেন বলুন?'

—'আপনি সাহস দিলে কিসে আটকায়!'

—'আমি তো আছিই। কিন্তু ভেতর থেকেও লোক ভাগিয়ে না আনলে ওরা সিধে হবে না। শুনেছি—একজন বয়স্থা মাগী আছে দলে। তাকেই ভাংচি দিয়ে নিয়ে আসুন না। কি নাম থাকে যেন বিজ্ঞাপনে—'

—'রজনী বলে তো দেখলাম তাকে। ওপথে হবে না বসুমশায়। বাইরে থেকে ধাক্কা। ভেতরে বসে শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়তে হবে। কিন্তু তার আগে তো আপনাকে কণ্ট্রাক্ট সই করতে হবে।'

—'সে তো নিশ্চয়। ব্যাকডেটের চুক্তি হবে। আপনি নতুন দল করবেন—নতুন কণ্ট্রাক্টে ভাড়া দেবে বেশি। আমার তো রাজি না হওয়ার কিছু নেই। যা-কিছু করার সে তো আপনিই করবেন। শুনলাম অমিয়বাবু গ্রীনরুমটি ভেঙে

বড় করে বানিয়েছেন। সেটি এখন মডার্ন পতিতালয়। ইনচার্জ সেই মাগী। চাবির গোছা তার আঁচলে। প্রাইভেট মাইফেল বসে। বুঝুন আমার মনের অবস্থা।'

—'তাতো বটেই।' টাকা নাহয় জোগালাম। কিন্তু লোকজন তো হরিসাধনবাবু আপনাকেই দিতে হবে।'

—'সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। কোথাও আটকাবে না।'

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ দেখা গেল—নিবেদিতা স্কুলের সামনে দিয়ে শশাঙ্ক চলেছে। গভীর বিশ্বাসে ভরা দুখানা চোখ চশমার নিচে চুপচাপ। আজকাল শশাঙ্ক দত্ত সবসময় ফিটফাট থাকে। পায়ের পাম্পশুতে রাস্তার আলো পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে। ট্যাক্সি নিয়ে সিধে কলেজ স্ট্রীটে এল। নিজের ঘরে ঢুকতে তালা খুলতে হল। দরজা ভেতর থেকে আটকে শশাঙ্ক ট্রাঙ্কটা খুললো। ভীষণ শক্তিশালী কিছু যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। শশাঙ্ক রোজকার মত হাত বোলালো। বুঝলো ঝাড়পোঁছের দরকার নেই কোন। গ্যামাকসিনের গুঁড়ো সর্বত্র ছড়ানো।

মাথার চুলটি আঁচড়ে নিয়ে শশাঙ্ক ট্রাঙ্কের তালা টানাটানি করে দেখলো। ঠিক আছে। রিং লক দাঁতে দাঁতে আটকে বসেছে। আলো নিভিয়ে দরজায় তালা দিল শশাঙ্ক। হাতঘড়িতে পৌনে আটটা। নিজেই বলে উঠলো শশাঙ্ক মনে মনে, পনের মিনিটে মেট্রোয় পৌঁছতে পারবো তো। ফোন পেয়ে ছোকরা নিশ্চয় অবাক হয়েছে! আজ তো শো নেই—নিশ্চয় আসবে।

অন্য নাটকের রিহার্সেলে অমিয় হাঁ করলে শংকর বুঝে নেয়। তখন শংকর এক একটা রোল করে দেখায়। অন্যরা তুলে নেয়। অমিয়কে খানিক মোটা দাগের পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিত শংকর। সেটা আজ হচ্ছিল না।

সম্রাট জানেন মৃত্যু, সুন্দর ক্ষয়ের পদধ্বনি জীবন শুনতে পায়। তাই কোন কিছুই সম্পূর্ণ নয় পৃথিবীর। এটাই তাঁর মন খারাপের কারণ। সম্রাট একজন বিষণ্ণ দার্শনিক। এবং ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। তাঁর কাছ থেকে বিষপানে মৃত্যুবরণের আদেশ শুধু তারাই পায়—যারা তাঁর খুবই প্রিয়।

অমিয় বুঝিয়ে বলল মঞ্চের অবস্থা। পেছনের ব্যাকড্রপ স্রেফ রুপোলী রংয়ের। উইংসের বদলে থাম। গাঢ় লাল রংয়ের। সম্রাটের প্রাসাদের অলিন্দ মনে হবে।

অমিয়র নিজের পোশাক : হাঁটু অব্দি স্ট্র্যাপ জড়ানো জুতো। কোমরবন্ধনীর ওপরটা বুক আটকানো ফতুয়া। নিচে গাউনের ধারা কাপড় হাঁটুতে এসে থামবে। মাথার চুল নেমে এসে ভ্রূ ঢেকে ফেলেছে প্রায়। দুখানা চোখ অবুঝ আর আকুল ভাবনায় ঢলো ঢলো। নিষ্ঠুর লোকের যেমন হয় আর কি।

সুজাতায় অমিয়র সেকেণ্ড হিসেবে মাসকাবারে নিয়মিত বেতন পেয়ে আসছেন কমলবাবু। তাকে সম্রাটে দেওয়া হয়েছে কবির রোল। সারা নাটকে এই ক্যারেক-টারটি সম্রাটের সবচেয়ে কাছাকাছি। সম্রাট তারই পিতাকে বিষপানে মৃত্যুবরণের আদেশ দিয়েছেন।

কবিকে তোয়াজ করছে শ্রেষ্ঠী। মহামন্ত্রী। তাদের মতলব, এমন সম্রাটকে রেখে কি হবে। তাই তারা কবিকে বলছে, আপনি তো সম্রাটের প্রিয় পাত্র। কাছাকাছি থাকেন সব সময়। সেই সুযোগে পিতৃহন্তাকে নিকাশ করুন।

কবির দ্বিধা। সম্রাজ্ঞীর অশান্তি। সম্রাটের আদেশে মহামন্ত্রীর একপায়ে নৃত্য। ষড়যন্ত্রী শ্রেষ্ঠী ধরা পড়ে গিয়ে সতর্ক।

রিহার্সেলের সময়েই ফাঁকা হল টেন্স হয়ে উঠলো। তার ভেতর রজনী বলল, 'এ নাটক তোমায় বাঙালীর মনে পাকাপাকি জায়গা দেবে অমিয়।'

অমিয় অন্য কথায় গেল। 'তোমার গলা উঠছে না রজনী। একজন সম্রাজ্ঞী তাঁর কথায় সব জায়গায় জোর দেবেন।'

—'জানি। কিন্তু আমার গলা বিট্রে করছে। আজ ক'দিনই ভীষণ ব্যথা।'

—'ডঃ সেনকে ফোন করেছিলে।'

—'সে সময় পেলাম কোথায়! লোক পাঠিয়েও তো শংকরের খবর পাওয়া গেল না। বাড়ি নেই।'

—'গ্রস ইনডিসিপ্লিন।'

—'শংকর যদি বলে—তুমিই দায়ী সেজন্যে। সবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে যদি ডিক্টেটরি করো—'

চণ্ডী রজনীকে থামালো। 'তা কেন? অমিয় তো আমায় বলেছে। আমরা তো নতুন নাটকের কথা বলে আসছিলাম। নাম দেবো গ্রুপ থিয়েটার—আর কোন ঝুঁকি নেব না—তা কি করে হয়?'

—'ঝুঁকি যদি কেউ নিতে না চায়?'

—'তাহলে দল তুলে দাও দিদি।'

—'দল তো ভেঙেও যেতে পারে। এটাই হয়তো তার শুরু।'

—'সন্ধ্যেবেলা অলুক্ষণে কথা বোলো না। অভাবের দিনে ভাঙলো না। আর এখন।'

অমিয় এবার মুখ খুললো। মিউজিক হ্যাণ্ডের সবাই চুপচাপ বসে। বাইরের রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। সুজাতা নাটকে বিনয় তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে স্টেজের একদম উঁচুতে উঠে অন্ধকারের ভেতর রজনীর বাঁ গালে ফোকাস দেয়। তার ফলে লাস্ট বো থেকেও এক্সপ্রেসন দেখা যায় পরিষ্কার। সেই বিনয় উঠে গিয়ে স্টেজের ফুটলাইটগুলো জ্বেলে দিল। তাতে মঞ্চের থমথমে ভাবটা পরিষ্কার হল খানিক।

আরো হালকা করে দিতে অমিয় বলল, 'অর্থই অনর্থ চণ্ডীদা!'

—'ওসব ভুলে যাই এসো ভাই। তার চেয়ে বরং আমাদের নতুন পুরনো সব কটা নাটক দিয়ে একটা উৎসব লাগিয়ে দাও।'

—'মন্দ বলোনি চণ্ডীদা। ফেবিওয়ালার মৃত্যু, সন্দেশ; অথ মালতী বৃত্ত কথা, সুজাতা, সম্রাট। পঞ্চমুখের নাট্যোৎসব। প্রতিষ্ঠা সপ্তাহের সাতদিনের এক-টানা অভিনয়।'

—'সাতদিনের সিজিন টিকিট করা যাবে।'

রজনী বললো, 'তাহলে আমাদের সাকসেসের বিরুদ্ধে হুইসপার ক্যামপেনও ক'দিনের জন্যে থামে।'

অমিয় দেখলো, চণ্ডীদা গ্রীনরুম থেকে পায়রা তাড়াতে ছুটছে। সেই ফাঁকে রজনীকে বলল, 'একজন মহিলা তো আমাদের সাকসেসে আঁষটে গন্ধ পান।'

—'বুঝেছি।'

—'কে বলতো?'

—'আর কে! লীলা তো। জানি অমিয়—তার চোখে আমি খুব আমিষ।'

মেট্রোর সামনে শংকরকে পেয়ে গেল শশাঙ্ক। 'কি মনে করে শশাঙ্কবাবু? এদিকে?'

—'আমিও তো তাই বলছি। আপনি এখন এখানে? শো নেই শংকরবাবু?'

—'নাঃ! একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এখানে। আটটা বেজে গেল। ভদ্রলোক তো এলেন না দেখছি। মাঝখান থেকে রিহার্সেলে যাওয়া হল না। ভীষণ অন্যায় হয়ে গেল।'

—'অন্যায় কিসের? সবাই খাটবে আর একজন ছড়ি ঘোরাবে। এর নাম গ্রুপ থিয়েটার? আপনি কিসে কম যান শংকরবাবু বলুন তো?'

—'থাক। হয়েছে শশাঙ্কবাবু। রজনীদিদির ওপর রেগে গিয়ে দাদার নামে যা তা বলবেন না। এক অপেরা পার্টির নামকরা অধিকারী ফোন করে আসতে বলে আর এলেন না। কীরকম লোক বলুন তো।'

—'আপনাকে বাজিয়ে দেখছেন হয়তো। আর আসবেন না আজ। দাঁড়িয়ে কি কথা হয়। চলুন পার্কে বসি। অমিয়বাবুর কোন নিন্দে আমি করিনি! কিন্তু একটা কথা বলুন তো। ওরা দুজন একসঙ্গে অসুস্থ হলে—আপনি আর কল্যাণী তো জীবন আর সুজাতার রোল করেছেন। তাতে হাউসফুলে ভাটা পড়েছে?'

—'না। কিন্তু তাইতো থিয়েটারের নিয়ম। সবাই সব রোল মুখস্থ রাখে। একজন বসে পড়লে আরেকজন করে।'

—'তাই যদি হয়—তাহলে সবার সমান অ্যালাউন্স হয় না কেন? সেকথাটা বলুন আমাকে।'

সন্ধ্যার বাতাস ভালোই লাগছিল। পর পর দুটো 'এল' পাঁচ নম্বর প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে ফুলস্পীডে ময়দান ডিঙোচ্ছে। মাঠে বসে শংকর বলল, 'দাদা তো সবার চেয়ে বেশি খাটে। বেশি নেবে না?'

—'কিন্তু রজনী?'

—'তারও তো বড় রোল শশাঙ্কবাবু। দিদির জন্যে তো সুজাতা নাটক দাঁড়িয়ে আছে। সে বেশি নেবে না?'

—'কত বেশি শংকরবাবু? দুশো? পাঁচশো? হাজার?'

—'অত বেশি কি কেউ পায়! আমাদের প্রেস পাবলিসিটির খরচ আপনি জানেন না।'

—'তা জানি না। কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস জানি আমার ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে। ওদের মা মাস গেলে কড়কড় পঞ্চাশখানা একশো টাকার নোট বাড়ি নিয়ে যায়। ব্যাঙ্কে ফিক্স্‌ড ডিপোজিটে ফেলে দেয় অনেকটাই। তারপর গাড়ির খরচ? তেল? ড্রাইভার? পোশাক? বেড়ানো? খানাপিনা? এসব কোত্থেকে আসছে?'

শংকর কি বলতে গিয়ে গুম হয়ে গেল।

শশাঙ্ক বলল, 'দেখুন শংকরবাবু। আমি নিজে দল করেছি ওর সঙ্গে। ভীষণ খরচে মেয়েছেলে। হাত আলগা। ওই হিরোইন একাই পঞ্চমুখকে শুষে ছিবড়ে

করে দেবে। দেখবেন। আমার সঙ্গে কোনদিনই কোন শত্রুতা নেই রজনীর। ওর ভালো চাই আমি। আজও আমরা স্বামাস্ত্রী। ওর ছেলেমেয়েরা তো আমারও ছেলেমেয়ে। ওর আয় বন্ধ হলে আমরা দাঁড়াবো কোথায়? সুজাতা চলুক। পাঁচ হাজার নাইট চলুক। যাতে চলে সে কথাই বলছিলাম। থিয়েটারের স্বার্থে। গ্রুপের স্বার্থে। আমিও তো থিয়েটারের লোক ছিলাম একদিন। থিয়েটারের পাশ টেনে কথা বলবোই আমি। সে আমার ধর্মপত্নীই হোক আর যে-ই হোক।'

শংকর কারো দিকে তাকালো না। বিজ্ঞাপনের নিওন আলো দুজনের মুখেই আন্দাজে ফোকাস ফেলছিল—আবার অন্ধকার করে দিচ্ছিল। শংকর নিজে থেকেই বলল, 'পাঁচ হাজার নাইট নয়—শীগগিরই সুজাতা বন্ধ হবে।'

—'কেন? কি ব্যাপার শংকরবাবু? দিব্যি পাবলিক রেসপন্স পাচ্ছেন আপনারা।'

—'ঠিক বন্ধ নয়। নতুন নাটক নামবে। নামানো হবে।'

—'ছিঃ। ছিঃ। এই দর্শক ছেড়ে দিয়ে— নিশ্চয় রজনীর বুদ্ধি। পঞ্চমুখকে ওই শেষ করবে বলে দিলাম।'

—'না। দাদার জেদ। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্থায়ী সভাপতি, পঞ্চমুখ।'

—'অমিয়বাবুকে থামান। এখুনি থামান। এক সেনচুরিতে একবারই এরকম নাটক লেগে যায়। দুবার নয় কিন্তু। স্রেফ পাগলামি মশায়। এখুনি থামান।'

—'থামাবো কি! রিহার্সেল শুরু হযে গেছে। কসটিউমের অর্ডার চলে গেছে। কাঠের মিস্ত্রিরা সেট বানাতে শুরু করবে ক'দিনের ভেতর।'

অন্যমনস্ক শংকরের হাত জাপটে ধরলো শশাঙ্ক। 'একটা কাজ করে দিন আমার। চিরকৃতজ্ঞ থাকবো শংকরবাবু। সুজাতার স্ক্রিপ্টখানা অমিয়বাবুকে বলে আমায় এনে দিন। ওঁর তো আর কাজে আসবে না।'

—'স্ক্রিপ্টের কি দরকার? পুরো নাটকখানাই আমার মুখস্থ। কিন্তু লোক পাবেন কোথায়? ফাইনান্স?'

—'সে ভাবনা আমার শংকর। আপনি এলে আমি সব পারবো। এমন চালু নাটক কেউ ছাড়ে?'

এক তাঁতি ঘুরে ঘুরে শাড়ি দিয়ে যায় গ্রীনরুমে। মনো আর সরির জন্যে দুখানা টাঙ্গাইল ডুরে কিনেছিল রজনী। সন্তুর জন্যে শার্টের কাপড়। বেশি রাতে

ফিরে আর দেখানো হয় নি। সকালে ম্যাসেজের লোক এসে বসে বসে চলে গেল। তারপর ঘুম ভাঙলো রজনীর। মেয়ে দুটোকে ডেকে শাড়ি দেখাচ্ছিল রজনী। এমন সময় সন্তু ঘরে ঢুকলো। 'মা। আমায় কিছু টাকা দাও।'

—'খাবার টেবিলে একটা দশ টাকার নোট চাপা দেওয়া আছে। নিগে যা।'

সনৎ নোটখানা নিয়ে এসে বলল, 'এ টাকায় হবে না মা। আমায় হাজার দুয়েক টাকা দাও।'

শাড়ি দেখানো থামিয়ে রজনী সন্তুর দিকে চাইলো। আগে ওকে রজনী আর শশাঙ্ক দু'জনেই খোকন বলে ডাকতো। ভালো নাম সনৎ থেকে এখন সন্তু হয়েছে। আগাম কামিয়ে গালে বেশ দাড়ি করে ফেলেছে। চোখ দুটো লাল। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে। 'কি করবি এত টাকা দিয়ে?'

—'ব্যবসা করবো। খাতা কলমের এজেন্সি।'

—'ব্যবসার তুই কি জানিস সন্তু। টাকাগুলো তো নষ্ট করবি।'

—'তুমি দিয়েই ত্থাখো না। ব্যবসা করে মাসের ভেতর ফেরৎ দেব তোমায়।'

মনে মনে একটা হিসেব করে ফেলল রজনী। দু'হাজার টাকা জলে দিতে সন্তুর দু'দিনও লাগবে না। অনভিজ্ঞ। কার কথায় মেতেছে কে জানে।

—'বঙ্গলিপি খাতা আর তুলিকা কলমের এজেন্সি নেব মা।'

রজনী ভাবছিল, আমার তো যেমন-তেমন বিয়ে হয়ে আজ এই অবস্থা। মনো আর সরিকে তো সেভাবে বিয়ে দেওয়া যায় না। মাস মাস ব্যাঙ্কে টাকা ফেলে দিয়ে আসছে রজনী। ফিক্স্‌ড করেছে কিছু। সংসার খরচ আছে। সফল নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে তাকেও সব সময় ফিটফাট থাকতে হচ্ছে। তার পক্ষে এখন আর যেমন-তেমন করে বাইরে বেরোনো সম্ভব নয়। হাতে সব সময় কিছু টাকা রাখতে হয়।

—'অত টাকা কোথায় পাবো বল। তুই বরং তোর বাবার কাছে গিয়ে চা। ব্যবসা করবি? ভালো কথা তো। নিজের বাপকে গিয়ে বল না। তাঁর সঙ্গে তো তোর যোগাযোগও আছে।'

কথাটা আন্দাজে বলে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলো ছেলের মুখের দিকে। রজনী জানে শশাঙ্ক তার অনুপস্থিতিতে এখানে ছেলে-মেয়েদের জন্যে ইদানীং মিষ্টিফিষ্টি নিয়ে আসে। মোটা মানিব্যাগ বের করে বুক পকেট থেকে। একটু আগে মনো বলছিল।

—'বাবার কাছে চাইলে পাবো না মা।'

—'চেয়েছিস কোনদিন?'

—'চাইলে অনেক রকম কথা বলে। দেয় মোটে একখানা দশ টাকার নোট।'

—'তেমন করে চাসনি বল! হাজার হোক তোর নিজের বাবা। তুই তার বড় ছেলে! একমাত্র ছেলে! তোকে না দিয়ে থাকতে পারবে ভেবেছিস। তার ডেরা তো চিনিস। ঘুরে আয় না একবার।' আন্দাজেই ঢিল ছুঁড়লো রজনী। তার কেমন সন্দেহ হয় আজকাল—শশাঙ্ক সন্তুর সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। শশাঙ্কর কথা বলতে গিয়ে রজনীর গলায় শ্লেষ চলে আসে। কিছুতেই ঠেকাতে পারে না রজনী।

—'যাবো বলছো?'

—'যা না।'

—'যদি না দেয় বাবা।'

—'যদির কথা নদীতে।'

এইভাবে বলে তখনকার মত রজনী সন্তুকে থামালো। পরশু স্টেজে ঢোকার মুখে ডান পায়ে হোঁচট খেয়েছিল রজনী। গোড়ালিতে দারুণ ব্যথা। কণ্ট্রাস্ট বাথ নিলে ব্যথাটা কমে। মনোরমাকে বলল, 'একটু গরম জল করে দিবি মা। পায়ে শেক দিতাম। ঠাণ্ডা গরম দু'রকম জল দুটো গামলায় করে এনে দিবি?'

মনো আর সরি ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। তারা এভাবে পায় না মাকে অনেক দিন।

সন্তু যেমন এসেছিল—তেমনি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শ্রীরাম ট্রাস্টের সম্পাদক হরিসাধন বসু ফতুয়ার বন্ধনী ভাল করে বেঁধে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। এটা তাঁর একতলার বৈঠকখানা। বেলা দশটা হবে। উল্টোদিকের চেয়ারে শশাঙ্ক দত্ত বসে। সবে তার চা শেষ হল। হরিসাধন বুঝলো, এবারে শশাঙ্ক কথাটা পাড়বে। সেজন্যে তিনি তৈরি হয়েই আছেন।

—'আপনার কথা মত ওদের দলের বড় একখানা পিলারকে সরাতে পেরেছি।'

—'এই তো চাই। আপনি তো করিতকর্মা লোক। বলুন কত দূরে এগোলো?'

—'ওদের শংকরবাবুকে টানতে পেরেছি। যদ্দিন না ভরত হল আমাদের হাতে আসছে ততদিন শংকরবাবুকে আমার এক জায়গায় ভিড়িয়ে দিচ্ছি।'

—'আপনার আরও জায়গা আছে বুঝি ?'

—'এই সামান্য একটুখানি। বৈশাখ মাসে এক অপেরা পার্টিকে কিছু টাকা করে দিয়েছিলাম। সুদে আসলে সেদিকে এখন আমার পাল্লাটা কিছু ভারি।'

—'বেশ। বেশ। শুনে আনন্দ হচ্ছে। আপনি তো বিষয়কর্ম ভালো বোঝেন দেখছি। তাহলে তো আমাদের চিন্তা কি! আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলে তো আমি পঞ্চমুখের এগেন্সটে মামলাতেই যেতুম না। আমরা দুজন এক সঙ্গে এগোতাম।'

—'দুঃখ রাখবেন না বসুমশায়। অতীতের দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই আমাদের। আপনি আর আমি তো এখন এক সঙ্গেই এগোচ্ছি। এক সঙ্গেই আমরা উঠবো বসবো। শংকর অ্যাকটিং ভালোই করে। দু নম্বর সুজাতায় ওকে এখনকার মত লাগিয়ে দেব। মেইন রোলে চান্স পেয়ে খানিকটা গ্রেটফুলও হয়ে থাকবে আমার কাছে। ছোকরার নামে বড় করে প্রেস পাবলিসিটি হবে। ফলে আমাদের ওপরেই অনেকটা নির্ভর করতে হবে ওকে। আর ওদিকে ভরত হলের এক নম্বর সুজাতা নাটক এই ধাক্কায় খানিকটা নরমও হবে।'

—'শশাঙ্কবাবু। আরেক কাপ চা দিক আপনাকে।'

—'না। থাক এই তো খেলাম।'

—'না। দিক। সব শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনার বুদ্ধি আছে বলতে হবে। যত দূর ভাবছেন আপনি সমস্যাটা নিয়ে। আশ্চর্য লাগছে আমার।'

—'সবটা বলা হয় নি এখনো আমার। পাবলিসিটির জোরে নীলকমল যাত্রা পার্টির মেইন রোলে চান্স পেয়ে—মোটা মাস মাইনে পেয়ে শংকরও মন-প্রাণ দিয়ে অভিনয় করবে। ভালো গানের গলা ছোকরার। তখন এক নম্বর সুজাতার অবস্থা হবে -দু নম্বর নয় -ধাক্কা খেতে খেতে তিন কি চার নম্বর। আর আপনারও ধাক্কা মারবার সুযোগ ওরা নিজেরাই করে দিচ্ছে।'

—'কি রকম ?'

—'আমার খবর হল, পঞ্চমুখের অমিয়বাবুরা নতুন নাটক নামাচ্ছে। মহলা চলছে।'

—'তাতে আমি কি করতে পারি ?'

—'অনেক কিছু পারেন। এখন চুপ করে থাকবেন। নতুন নাটকের পয়লা শোয়ের দিন হাইকোর্ট থেকে শো-কজ করে ইঞ্জাংশন আনবেন। খরচ-খরচার পর মাথায় হাত দিয়ে বসবে। না পারবে বন্ধ করতে। না পারবে চালু রাখতে

বেরোবার রাস্তা পাবে না অমিয়বাবুরা। আপনার সঙ্গে তো শুধু সুজাতা নাটকের চুক্তি ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে নতুন নাটকের পেপার পাবলিসিটি করার পর শোয়ের দিন যদি ইঞ্জাংশন আনতে পারেন—তবে তো কেল্লা ফতে! এক ঢিলে দুই পাখি মরবে! টাকার সোর্স সুজাতা বন্ধ রাখায় আমাদের নীলকমল যাত্রা সমাজের সুজাতা তখন এক নম্বর। সে একাই অডিয়ান্স টেনে নেবে সব। আর চুক্তিভঙ্গের দায়ে আপনিও পঞ্চমুখকে ভরত হল থেকে উঠিয়ে দিতে পারবেন।'

— 'দাঁড়ান। দাঁড়ান শশাঙ্কবাবুর। এই নীলকমল কে ? আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

—'নীলকমল যাত্রা সমাজ। পুরনো পুরনো ভালো লোকজন নিয়ে নতুন দল। সামান্য কিছু টাকা ঢেলেছিলাম। সেটাই সুদে আসলে এখন আমাকে ও দলে কিছু অধিকার দিয়েছে। সেই জোরেই তো শংকরবাবুকে আজ বিকেলে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি।'

—'তার মানে আপনি এখন নীলকমলের আসল অধিকারী !'

—'তা বলতে পারেন। গতবারে ভরতে সুজাতার সাকসেস দেখলাম। নীল-কমলেও ওরা তখন ঘুরছিল টাকার জন্যে। আমিই বুদ্ধিটা দিলাম ওদের। বললাম এপাশ-ওপাশ করে করে দু নম্বর সুজাতা লাগিয়ে দাও। বেশ লেগে গেছে। দিব্যি চলছে।'

—'আপনাকে তারিফ না করে পারছি না শশাঙ্কবাবু। কিন্তু একটা কথা। ভরত হল নিয়ে কিন্তু আপনাকে ভাড়া বাড়াতে হবে।'

- 'আলবৎ বাড়াবো। আমার এখন আর নীলকমল যাত্রা সমাজের সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘুরে হিসেবপত্র রাখতে ভালো লাগে না। সিনেমার মত পাকা হলে এক জায়গায় বসে থিয়েটার হবে। দিনে একবার গিয়ে হিসেব বুঝে নেব। ব্যাস। এই চাই আমি বসুমশায়। এর কমও না। এর বেশিও না।'

—'তা ও দল থেকে মাগীটাকে ভাগিয়ে আনুন না। পঞ্চমুখের এক নম্বর মাগী।'

শশাঙ্ক মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, মাগীর গুমোর ভাঙতেই তো এত কাঠখড় পোড়াচ্ছি। অ্যাকটিংয়ের গুমোর! পয়সার গুমোর! শালীকে আমার পায়ের তলে না আনি তো—

—'আচ্ছা ? একটা কথা আমায় বলতে পারেন শশাঙ্কবাবু। কী থাকলে এখনকার নাটক চলে ? গল্প ? অ্যাকটিং ? সেক্স ? খুনখারাপি ? আমার তো সব গুলিয়ে যায় মশাই। মনে হচ্ছে, আপনি এ লাইনের পাকা লোক। তাই আপনার কাছেই জানতে চাইছি।'

—'সবই চাই হরিসাধনবাবু। সবার আগে চাই একটি মেয়েছেলে।'

—'ছিঃ! ছিঃ! ওভাবে কথা বলবেন না। নাটক সরস্বতীর জিনিস।'

—'আপনি খোলাখুলি বলছিলেন—তাই বললাম। আমরা বন্ধুজন। আমাদের মধ্যে রেখেঢেকে কথা বলে লাভ নেই। ওই সঙ্গে চাই খানিক নাচ। তিন চামচ রসিকতা। চাই তামাশা নয়তো ভাড়ামি বলতে পারেন। সেক্স তো রাখতেই হবে। আপনি আমাদের পার্টনার হয়ে যান না। ভরত হল আপনার ইনভেসমেণ্ট। প্রফিট ফট্টি, সিক্সটি।'

– 'সিক্সটি কার ?'

—'নীলকমলের।'

—'আপনি তো তার অধিকারী!'

—'খোলাখুলি নয়।'

—'ওই একই। বকলমে তো ? না শশাঙ্কবাবু। এই বয়সে আর ওসব না। ঝক্কি আমার একদম সয় না। নিয়মিত হল ভাড়া পেলেই আমরা খুশি। ছ মাসের আগাম দেবেন। অর্ধেক শাদা। পাতায় উঠবে। বাকিটা বাড়িতে আমার হাতে দিতে যাবেন।

শশাঙ্ক দত্ত এখন শ্রীবাম ট্রাস্টের হরিসাধন বসুর গোঁফের সোনালী তারগুলো শুধু দেখতে পেল। গোঁফের কালো ভাগটুকু ঘবের মেঘলা আলোব সঙ্গে মিশে গেছে।

একতলায় জুতো লুঙ্গি আর মাছ ধরার ছিপের দোকান। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দোতলা বাড়িটার সামনে শংকরকে নিয়ে শশাঙ্ক নামলো। 'আজই ভাই চুক্তিতে সই করো। মাস মানেই দেড় হাজার টাকা। বছর ঘুরলে বোনাস পনের হাজার টাকা। মনে কর এ দল তোমার। তুমি গড়ে-পিটে নাও। পঞ্চমুখের মত এখানে কেউ তোমায় এক্সপ্লয়েট করবে না।'

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছিল দু-জনে। মেট্রোর ওখান থেকে ট্যাক্সিতে

উঠে অবধি এই চিৎপুর পর্যন্ত কথা একা শশাঙ্কই বলে আসছে। শংকর এতক্ষণ হঁ্যা, না কিছুই বলে নি। শুনে যাচ্ছে।

—'পঞ্চমুখের 'সুজাতা'র জীবন রোলটার এখানে আমরা পাল্টে নাম রেখেছি —সাধন। একখানা গান দিয়েছি তার মুখে। পাবলিক গান খায় খুব। তুমি আরো দুখানা বসিয়ে নাও না ভাই। তুমিই তো সাধনের রোল করবে। গানও সুন্দর গাও তুমি।'

শংকরের ভালো লাগছিল না। সেই থেকে কানের কাছে ভ্যাজ ভ্যাজ করছে। শরীরটা ভারি হয়ে গেছে শংকরের। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে হাঁফাচ্ছিল। মনে মনে ভাবতেও হচ্ছিল মাস গেলে পঞ্চমুখে পাই আটখানা একশো টাকার নোট। নীলকমলে মাস গেলে পাবো পনরখানি। তাছাড়া বোনাস পনর হাজার বছরে। এতো বিশ্বাসই হয় না তার। শেষে অতি লোভ করতে গিয়ে নীলকমল যদি ফেল পড়ে। তখন? আবার তো পথে দাঁড়াতে হবে তাহলে। দাদার কাছে কোন্ মুখে ফিরে যাবে?

—'কি ভাই?'

ওপরে উঠে শংকর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'দাঁড়ান। একটু বসি আগে। জিরিয়ে নিয়ে কথা বলছি।'

—'ডাব খাবে?'

—'আবার আনাতে হবে। থাক এখন।'

—'না। মজুত থাকে। আমার জন্যে আনানো থাকে। অম্বলটা তো শরীর থেকে যায় নি।'

ডাবের জল খেতে খেতে শংকরের মনে পড়লো, সে আর দাদা একদিন এই লোকটাকেই মদের দোকান থেকে তুলে এনেছিল। রজনী দিদির জন্যে। শশাঙ্কবাবু তখন তৃপ্তির সঙ্গে বসে ছিল। কী পাল্টেই না গেছে লোকটা এখন। চেনাই যায় না। দিদি কি এত সব জানে?

শংকরকে ভাগিয়ে আনার আনন্দে শশাঙ্ক এতক্ষণ যে তাকে নাম ধরে ডাকছে —সে খেয়ালই নেই। শংকর কোন আপত্তি করল না।

পার্টিশন দেওয়া বড় ঘর। ওপাশে মহলা চলছে। পাকা হল নেই বলে নীলকমল সাজপোশাক রেখেছে তিন তিনটে আলমারিতে। ফ্ল্যাড লাইটগুলো ঘরের কোণে সাজানো। থাক থাক পোস্টারের দিস্তে। পঞ্চমুখের পাবলিসিটিও খানিকটা ভাঙিয়ে নিয়ে এরা গাঁয়ে গাঁয়ে দু নম্বর সুজাতা করে বেড়ায়।

আসলে নীলকমল যাত্রা সমাজের এই গদি শংকরের কাছে শক্রপুরী। খানিকটা লাগছিলও তাই।

আবার মনে পড়ছিল, অমিয় 'আর রজনীর শরীর খারাপ থাকায় সে আর নন্দনা সুজাতা করেছে। সে জীবন। নন্দনা সুজাতা। তখনো তো হাউস ফুল গেছে। সাড়ে দশ টাকার পঞ্চাশখানা করে এক্স্ট্রা চেয়ার দিতে হয়েছে। তবে তার নাম কেন পাবলিসিটিতে একদম ছোট টাইপে? সে কেন বাসের ঝাঁকুনি খেতে খেতে সারা রাত ধরে দলের সঙ্গে লাভপুরে যাবে? সে কি আলাদা প্রাইভেট কারে আরামে যেতে পারত না? তার জন্যে কি আলাদা ছানা, মুরগির মাংসের স্টু হতে পারত না? এসব কথা কে বলে! তারও তো বিশ্রাম দরকার ছিল।

—'কাল ভোরেই তোমার জন্যে গাড়ি যাবে বাড়িতে। আগে দর্জির ওখানে গিয়ে জামা কাপড়ের মাপ দেবে। গাড়িটা তোমার কাছেই রেখো ভাই। তেল ভরা থাকবে। ড্রাইভার থাকবে। তোমার দরকার মত ঘোরাঘুরি কোরো।'

—'না। গাড়ি লাগবে না। দরজি পাঠিয়ে দেবেন বাড়িতে। কিন্তু আগেকার সাধনের জামাই তো রয়েছে। তিন সিনে তিনটে পাঞ্জাবি। দু সিনে পাজামা দুটো। আর বেডরুম সিনের জন্যে একটা স্লিপিং স্যুট? এই তো!'

—'ঠিক বলেছো। কিন্তু আমাদের সাধন বড় প্যাংলা তোমার তুলনায়। তার জামা তোমার গায়ে হবে না।'

'সে সাধন গেল কোথায়?'

—'রোজ ডোবাচ্ছিল। ভরাডুবি হবার জোগাড়। তাড়িয়ে দিতে হল।'

শংকর চুপ করে গেল। মনে মনে ভাবলো, তোমরা তাহলে তাড়িয়ে দাও। আবার নিজেই নিজেকে বোঝালো, ডোবালে না তাড়িয়ে উপায় কি? একটু পরে খুব আশ্চর্য হল, সে নিজেই নিজের মনে শশাঙ্ক দত্তর যুক্তিগুলো খাড়া করে শংকরকে বোঝাচ্ছে।

'নাও। হাজার এক টাকা নিয়ে ফর্মে সই করো। তারপর কালকের পেপার পাবলিসিটিটা একটু খুঁটিয়ে দ্যাখো। কপি, ইমপ্রুভ করার থাকলে তুমিই করে দাও। তোমার নাম যাচ্ছে বাট পয়েন্ট টাইপে।'

—'না। না। এখুনি পাবলিসিটি দেবেন না শশাঙ্কদা।'

—'লজ্জা কিসের ভাই? কাগজ দেখেই ওরা জানুক। পঞ্চমুখ বুঝুক, এক্সপ্লয়েট করলে মোস্ট লয়াল হ্যাণ্ডও একদিন রুখে দাঁড়ায়। অবিচারের বিচার চায়। ওদের শিক্ষা দিতে হলে এ-পথই তোমার পথ শংকর।'

শংকরের রক্ত গরম হয়ে উঠছিল। আবার মনে হচ্ছিল, দাদা ওরা সবাই কাল সকালের কাগজ দেখে তাকে কী মনে করবে। সে কি আর কোনদিন ওদের সবার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে? রজনী দিদির সামনে? চণ্ডীদার সামনে? সবাই তাকে কত বিশ্বাস করে। যদি নীলকমলের এ-নাটক তাকে নিয়ে না জমে?

—'নন্দনার কথাই ধরো না—'

—'ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন শশাঙ্কদা।'

অবাকও হল শংকর। নিজেই শশাঙ্কদা বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। এ জন্যে এমন কিছু সময় লাগলো না।

শশাঙ্ক তখন কথার তোড়ে ভাসছে। 'দূরে দূরে থাকলেও পঞ্চমুখের তোমাদের ভেতরকার সব খবরই আমি রাখি। অনেকদিন ধরেই রাখি। নন্দনা কেন চলে গেল? তার ওপর ইনজাস্টিস হয় নি? দিনের পর দিন মেইন রোলে প্লে করেও সে মেয়েটা পেপার পাবলিসিটিতে একটা লাইনও পায় নি। অথচ তখন ভরত হলে একস্ট্রা চেয়ার দিতে হচ্ছে। আমি কি জানি না শংকর? কি ভেবেছো আমায়?'

—'কিছু ভাবি নি শশাঙ্কদা। আপনি এইমাত্র একটা উপকার করলেন। নন্দনার কথা মনেই ছিল না। ওকে ডাকুন না।'

—'তুমি গিয়ে বললে চলে আসবে।'

— অন্য দলে জয়েন করেছে। তারা কি ছাড়বে?

—'চুক্তির টাকা দিয়ে আমরা ছাড়িয়ে আনবো শংকর। আমরা বড় করে শো বিজনেসে নামতে চলেছি। এখানে বড় টাকা ঢালতেই হবে। টাকার পরোয়া করলে চলবে না। শিল্পীর সম্মান দিতে হবে। আর্টিস্টের প্রয়োজন মেটাতে হবে সবার আগে। তারপর বাকি সব আপনা আপনিই হবে। মনে রাখবে—এক্সপ্লয়েটেশন কোন দিন চাপা থাকে না। পারা হয়ে ফুটে ওঠে।'

ওদের গলার আওয়াজে পার্টিশনের ওপাশের লোকজন এ-ঘরে চলে এল। শশাঙ্ক চেঁচিয়ে বলল, 'আজ আমাদের একটা শুভদিন। পঞ্চমুখের শংকরবাবু নীল-কমলে জয়েন করলেন।' ফেরার পথে একখানা টাইপ করা কাগজে সই করিয়ে শশাঙ্ক শংকরের হাতে একগোছা নোট দিয়ে দিল। 'বাড়ি গিয়ে গুণে নিও। হাজার এক টাকা আছে। এর ভেতর থেকে একখানা একশো টাকার নোট মায়ের হাতে দেবে।'

শংকর তাকিয়ে পড়লো।

শশাঙ্ক বলল, 'নতুন দলে যোগ দিলে। এসব সময় মাকে প্রণাম করে কিছু দিতে হয়।'

—'টাকা পয়সা আমি দিদির হাতে দিয়ে থাকি।' আর কিছু বলল না শংকর। দিদিকে ওরা বড়দি ডাকে। বিয়ে থা করেন নি। জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে। মাস গেলে তার হাতেই টাকা তুলে দেয় শংকর।

বাড়ি ফিরে দিদির হাতে সব টাকা তুলে দিল শংকর।

—'এই তো সেদিন টাকা দিলি। আবার? বোনাস পেলি নাকি?'

—'নীলকমলে জয়েন করলাম। মাস গেলে এখন প্রায় ডবল পাবো। তাছাড়া বছরে পনর হাজার টাকা বোনাস। এবার একটা জায়গা দেখতে হয় দিদি। আমরা বড় করে বাড়ি করব। তোমার জন্যে বড় একখানা ঘর থাকবে। বেশ মোজাইক ফ্লোর—'

বড়দি তাকে থামালো। 'কি বললি কোথায় জয়েন করেছিস?'

—'নীলকমল যাত্রা সমাজে—'

—'কেন? পঞ্চমুখ তোকে তাড়িয়ে দিয়েছে? না ঝগড়া করেছিস?'

—'তাড়াবে কেন! ঝগড়াও তো হয় নি।'

—'তবে?' বড়দি একদম সোজাসুজি তার চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

—'ডবল মাইনে দেবে। মেইন রোলে স্টেজে নামবো।'

—'নাটকের নাম?'

শংকর কুঁকড়ে গেল। 'সুজাতা।'

—'সেই দু' নম্বর সুজাতার দল! এদের না তোরা নিন্দে করতিস। শেষে সেই দলে গেলি? অমিয়বাবু জানেন? তোদের চণ্ডীদা জানেন?'

—'বলা হয় নি বড়দি।'

—'না বলে কয়ে নীলকমলে জয়েন করলি? ওরা না পঞ্চমুখের শত্রু? তুই এটা কি করলি শংকর? তোদের এতদিনের গ্রুপ। যার জন্যে এত খেটেছিস।

—'যা তুমি বোঝো না বড়দি—তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। এক কাপ চা দাও তো। চিনি কম। দুধ কম। বড্ড মাথা ধরেছে।'

সম্রাট আদেশ দিয়েছেন—সম্রাজ্ঞীকে বিষ পানে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই হল গিয়ে সম্রাটের ভালোবাসার নিদর্শন।

সম্রাটের ভূমিকায় অমিয়। সম্রাজ্ঞী রজন। সম্রাট এক সময় দেশের জন্যে অনেক কিছু করেছেন। তিনি এতকাল সুশাসক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি যোদ্ধা। বীর। জ্ঞানী। এবং কবি। উপরন্তু গুণগ্রাহী। সাম্রাজ্যের গুণীজনকে তিনি রাজসম্মান দিতে কোন কুণ্ঠা দেখান নি।

সেই সম্রাট হঠাৎ স্বেচ্ছাচারী একনায়ক হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখের কথাই আদেশ।

সম্রাজ্ঞীর রোলে রজনী। সে তার জীবনে অন্তত দশখানা হিস্টোরিকালে অভিনয় করেছে। মায়ের বন্ধু ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে করেছে। করেছে অহীন চৌধুরীর সঙ্গে। বড়বাবু দুর্গাদাস, নরেশ মিত্তির তো আছেনই। ন'দশ বছর বয়স থেকে স্টেজেই তার খেলাধুলোর জায়গা। তবু অমিয়র এই সম্রাট আগেকার সব হিস্টোরিকালকে ম্লান করে দেবে—একথা রজনী বুঝতে পেরেছে।

এখন যা দরকার—তা হল নিয়মিত মহলা। ভালো স্টেজ আর কসটিউম। আর দরকার বড় করে পেপার পাবলিসিটি। হোর্ডিং। প্রেস-প্রিভিউ।

এবার নতুন নাটকে টাকার চিন্তা নেই। চিন্তা অন্য জায়গার। অমিয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—আগেকার সেই বাঁধুনি যেন পঞ্চমুখে আর নেই। সুজাতার রিহার্সেলে একটু একটু করে এক একটা জিনিস জোগাড় হয়েছে।

আলো, পোশাক, জানলা, পালঙ্ক—সবই। এ ও জোগাড় করে এগিয়ে দিয়েছে। ফার্স্ট নাইটে উইংসের রং কাঁচা ছিল। রজনীর শাড়ীতে সে রং লেগে গিয়েছিল। পাবলিসিটির পয়সা ছিল নাক। ভরত হল তখন থিয়েটারের জায়গা হিসেবে একদম অপরিচিত ছিল। সবাই বারণ করেছিল। বলেছিল, অমিয়—ওখানে নাটক জমবে না। উঠে যাবে। ওটা থিয়েটার-পাড়া নয়।

এবার হাতের কাছে সব রেডি। সব থেকেও যেন কি নেই।

মহলার পর গাড়ি গিয়ে সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দেয় এখন। খিদে পেলে খাবার আছে। চান করবার বাথরুম। শোবার ঘর—সবই আছে। নেই সেই আগেকার দল বেঁধে কিছু করার-উৎসাহ। সবাই কেমন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কথা বলছে। কারও পার্ট এখনো মুখস্থ হয় নি। সবাই জানে—মহলার পর নাটক স্টেজ হোক ছাই না হোক—মাস গেলে মাইনেটা তো পাবো।

অমিয় জানে গ্রুপ থিয়েটারেরও চর্মরোগ হয়। সেই চর্মরোগের নাম সিকিউরিটি। এ-রোগ যদ্দিন না সারছে—দলের সবার কাজ করবার ক্ষমতার ওপর

আরামের মেঘখানা ছায়া মেলে থাকবে। সবার আগে এই আরামের বেলুনটা ফুটো করে দেওয়া দরকার।

কিন্তু কে দেবে?

অন্যবার লীলা এগিয়ে আসে সবার আগে। 'কি দরকার তোমাদের? টাকা? আমি দেব। আমার যা আছে টিচার্স কো-অপারেটিভ থেকে তুলে দিচ্ছি। নাও। কি করে শোধ হবে? সে চিন্তা আমার। মাসে মাসে মাইনে থেকে কেটে শোধ হয়ে যাবে। কদ্দিন বা লাগবে? দেখতে দেখতে দু' বছরে শোধ করে ফেলবো।'

নিজের শরীরটাও ধাতে নেই অমিয়র। একবার মনে হল আমি অসুস্থ বলেই হয়তো এসব ভাবছি। এমনিতে আমার কোন অসুখ নেই। ডাক্তার বলেছেন, 'মিস্টার ব্যানার্জি রিল্যাক্স করুন। রিল্যাক্স—'

—'কোথায় আর পারছি। নাটকের দলের পাণ্ডার কপালে রিল্যাক্স করার সুযোগ নেই কোন। বরং দিনকে দিন সে হাইপারটেনশনের পেসেণ্ট হয়ে উঠতে বাধ্য। বড়বাবুর কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। কতবার দল করেছেন। ভেঙেছেন। তাঁর পাশে ছিলেন—তাঁর দুই সহোদর—তারাকুমার আর বিশ্বনাথ। অত রিকগ-নিশান পেয়েও তিনি শেষ দিকটা নিজেব অভিমান আর মর্যাদায় বন্দী হয়ে ছিলেন।'

—'তোমার গলা ঠিক হয় নি রজনী।'

—'গলার ব্যথাটা যাচ্ছে না।'

—'গারগের্ল কর। ডকটর সেন কি বলছেন?'

—'একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করেছি। ভালো করে দেখাতে হবে। নিজেই বুঝতে পারছি—আওয়াজ ঠিক বেরোচ্ছে না।'

—'শংকর আজও এলো না রজনী। পরশু সুজাতার ডবল শো।'

—'তাইতো দেখছি।'

বলতে বলতে বিষ্ণু দত্ত এসে হাজির। 'রিহার্সেল কদ্দূব ভাই? আমার একটা রোল হবে?'

অমিয় দেখলো, বিষ্ণু দত্ত বেশ তৈরি এখন। বলল, 'মহামন্ত্রীর রোল করতে হবে তোমায়। সম্রাটের আদেশে তাকে এক সিন নাচতে হবে।'

—'বেশ তো। নাচবো। আমি তো ভালোই নাচি অমিয়। ডায়ালগ দাও।'

—'সম্রাট। আপনার আদেশের অন্যথা হয়—মন্ত্রিসভার কেউ তো ভাবতেও

পারেন না। আপনিই আমাদের বেদ। আপনি যা বলেন তাই আমাদের কাছে বাণী।'

অমিয় বলা মাত্র বিষ্ণু গড় গড় করে রিপিট করে গেল।

—'চমৎকার হয়েছে বিষ্ণু। এবার আমি সম্রাটের ডায়ালগ বলছি। ভালো করে শোন। মহামন্ত্রী। আপনি বিচক্ষণ প্রশাসক। আমাদের রাষ্ট্র শাসনের কাঠ-খোট্টা পদ্ধতিতে ভঙ্গিমা আনা দরকার। সে ভঙ্গিমা একমাত্র নৃত্যই দিতে পারে। আমার আদেশ—আপনিই প্রথমবার নেচে সেই মহাভঙ্গিমার সূত্রপাত করুন।'

আর ডায়ালগ বলতে হল না। মহামন্ত্রীর রোলে বিষ্ণু প্রায় একরকম অরিয়েণ্টাল স্নেক ডান্স শুরু করে দিল। হাত কাঁপিয়ে। পা কাঁপিয়ে। একটুও না থেমে।

হোটেলের ছেলেটা এঁটো থালা গ্লাস নিয়ে জায়গাটা মুছে এইমাত্র চলে গেছে। এখুনি আবার আসবে। পান আনতে দিয়েছে শশাঙ্ক। ছেলেটা দেরি করছে কেন? শশাঙ্ক ভাবলো একটু গড়িয়ে নেবে। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক শুয়ে নেয় শশাঙ্ক। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ট্রাম ধরে। চিৎপুরে নীলকমলের অফিসে গিয়ে পৌঁছতে তিনটে হয়ে যায়।

যাত্রা সমাজে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে তার ছিল না। ধার দিয়ে জড়িয়ে গেল। এই তো ক'মাসের কথা। ওদের দলের দিকে শশাঙ্ক গোড়ায় ঝুঁকেছিল একটি কারণে। ওরা দু নম্বর সুজাতা নামাচ্ছে দেখে শশাঙ্ক ধার দিতে দ্বিরুক্তি করে নি। নিজেকে ওদের একজন ভাবতেও এখন আর আটকায় না শশাঙ্কর।

সে চায়, দু নম্বরের চাপে এক নম্বর পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হোক। তারপর সে দেখবে- রজনী কোথায় দাঁড়ায়? কোথায় যায় তার দাপট? সে রজনীর স্বামীর আসনটি কোন মতেই ছাড়তে রাজি নয়। বরং পুরোপুরি সে আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য। এপথে যেসব কাঁটা পড়বে—তার সবগুলো সে তুলে ফেলবে।

শুয়ে শুয়ে মনে পড়ছিল শশাঙ্কর। প্রথমে ধার দিলাম নীলকমলকে। তারপর মেম্বার হলাম। এখন সহ-সভাপতি। মাসখানেক হল নীলকমলের প্রায় সব দায়িত্বই শশাঙ্কর। শংকর এসে গেছে। নন্দনা আসবে। পঞ্চমুখ থেকে আর আসবে কল্যাণী। আসবে অমিয়র ডাবল।

সে এখন ভেতর থেকে, বাইরে থেকে, সব দিক থেকে ধাক্কা দেবে। পঞ্চমুখের ভেতরে তাব সুড়ঙ্গ কাটা শুরু হয়ে গেছে। নীলকমলেব পেপার পাবলিসিটিতে বড় নাম এখন শংকর। সে-কপি কাগজে কাগজে চলে গেছে।

ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল শশাঙ্কর। 'পান এনেছিস?' উঠে বসল শশাঙ্ক।

—'কে?'

—'আমি বাবা। সন্তু। তুমি ঘুমোচ্ছো দেখে পানটা খেয়ে নিলাম।'

—'খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কত দিন আসিস নি সন্তু। বাড়ির সবাই ভালো। বোস।'

ঘরের আলোতে বিকেলের ভাব। সন্তু কোনরকম ভূমিকা না ক'রেই বলল, 'আমাকে তোমাব দু' হাজার টাকা দিতে হবে বাবা।'

—'কি করবি?'

— 'সেই যে বলেছিলাম

—'মনে নেই।'

—'খাতার ব্যবসা করবো। তুলিকা কলমেব এজেন্সি নেব।'

- 'কিন্তু টাকা কোত্থেকে দেবো রে! আমার তো কিছু নেই। দেখছিস তো এই এঁদো গলির ঘরে থাকি। আলো আসে না একদম।'

--'না। তোমার টাকা আছে। তোমার মানিব্যাগে টাকার নোট ফুলে থাকে!'

—'পাগল। এসব কথা কে বলেছে তোকে?'

—'কে আবার? মা বলল। মা তো তোমার কাছেই টাকার জন্যে পাঠালো।'

—'আর কি বলেছে? আমি টাকার ওপর তোষক বিছিয়ে শুয়ে থাকি! তাই না?'

—'বাবা। আমার রসিকতা কবার সময় নেই। টাকা আমাব চাই।'

—'তবে তোর মায়ের কাছেই যা। সাকসেসফুল থিয়েটারের সাকসেসফুল হিরোইন! সোফার ড্রিভিন কার তার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। মাসে মাসে দর্জি এসে নতুন ডিজাইনের ব্লাউজ বানিযে দিয়ে যায়। সকালে ম্যাসেজ করতে লোক আসে। ছুটিতে তোর মা পুরী নয়তো দীঘা যায়। টাকা তো তার কাছে! আমার কাছে টাকা দেখলি কোথায় সন্তু?'

—'বাঃ! তুমি তো মায়ের খবর অনেক রাখো দেখছি।'

—'আরও অনেক খবর রাখি। শুনবি?'

—'বল।'

—'তোর মায়ের জন্যে পঞ্চমুখকে মাসে পাঁচ হাজার টাকা খরচা করতে হয়। আমি ভালো জায়গা থেকে শুনেছি। এবার বুঝে নে কার কাছে টাকা পাবি।'

—'কিন্তু তুমি তো আমার বাবা। আমার জন্যে তোমার কোন দায়িত্ব নেই ?'

—'এসব কথা তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করোগে।'

—'আমি কারও কাছে কিছু জানতে চাই না। আমি জানি তুমি আমার বাবা। আমার যা কিছু জানার—তোমার কাছ থেকেই জানবো। আমি অন্য কারও কাছে যাবো না।'

—'সেটা তোমার ইচ্ছে।' বলেও শশাঙ্ক ছেলের মুখের দিকে তাকাতে পারলো না।

॥ কুড়ি ॥

সকালবেলার কাগজ কলকাতায় অন্তত চারজনের সকাল মাটি করে দিল। নীলকমল যাত্রা সমাজের দু' নম্বর সুজাতার ঢাউস পেপার পাবলিসিটি। ভাবখানা —সেটাই যেন আসল সুজাতা। সেটাই এক নম্বর। পঞ্চমুখ যেন দু' নম্বর। খানিকটা থিয়েটার—খানিকটা যাত্রাপালা দু' রকম পাবলিসিটির মিশেল দিয়ে কাগজের এক কলম জুড়ে ঘোষণা।

> **সুজাতায় ঐতিহাসিক যোগদান**
>
> **শংকর**
>
> **এলেন**
>
> **দেখলেন**
>
> **জয় করলেন**
>
> **নীলকমল যাত্রাসমাজের**
>
> **জন-চিত্তজয়ী সুজাতা**
>
> **বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে**
>
> **নতুন নাম**
>
> **শংকর**

চা খেতে খেতেই রাস্তা থেকে সব ক'টা কাগজ আনালো অমিয়। সব কাগজেই এক পাবলিসিটি। বড়ছেলের ইন্সট্রুমেন্ট বক্স থেকে স্কেল বের করে মেপে দেখলো অমিয়। কত কলম? কত সেন্টিমিটার? মেপে দেখে তো অবাক। সব ক'টা কাগজ মিলিয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকার পাবলিসিটি। দীর্ঘ এক কলম। বাকি-টায় চোখ বুলিয়ে অমিয় বুঝলো পাবলিককে ভড়কে দিয়ে নীলকমল পঞ্চমুখের দর্শক টানতে চাইছে। কলকাতায় নয়। কলকাতায় ওদের হাউজ নেই। কলকাতার বাইরে। কল শোয়ে। খয়রাশোল রায়গঞ্জ ময়নাগুড়ির দর্শকরা তো আর খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিয়ে সুজাতা দেখতে যাবে না। তারা দেখবে সুজাতা। কোনটা

একনম্বর কোনটা দু' নম্বর তা খতিয়ে দেখার সময় নেই কারও। পঞ্চমুখের পাবলিসিটি থেকে চোখা চোখা কয়েকটা শব্দ তুলে নিয়ে নীলকমল ম্যাটার তৈরি করেছে।

কিন্তু শংকর? শংকর এটা কি করে পারলো? অমিয়র চা ঠাণ্ডা হতে লাগলো!

গত ফাল্গুনে মেদিনীপুর কোর্ট ময়দানের কল শো সেরে বাস বোঝাই হয়ে পঞ্চমুখ কলকাতায় ফিরছিল। রাত দু'টো হবে। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। পরদিন বেলা দশটায় রবীন্দ্রসদনে সুজাতা। কাদের সাহায্যে যেন টাকা তুলতে শো দিল। খড়্গপুর কলেজ ছাড়িয়ে বম্বে রোডে পড়ার মুখে ট্রাফিক আইল্যাণ্ডে একদল লোক বাসের ওপর চড়াও হল। অমিয়র গাড়িও রেহাই পেল না। কী না পাঁচাশো টাকা চাই।

সেই গোলমালে শংকর সবকিছু অরগানাইজ করে ফেললো। মাইকের স্ট্যাণ্ড বাঁশের লাঠি এলোপাতাড়ি চালিয়ে শংকর ফুল স্পীডে গাড়ি চালাতে বলল। শংকরের পায়ে লেগেছিল। পিঠে লেগেছিল। এই হল গিয়ে টিম স্পিরিট।

এতগুলো বছরের আরও অনেক কথা এক সঙ্গে মনে আসছিল। শংকর সেই গোড়া থেকেই তাদের সঙ্গে আছে। অমিয় শংকরের সব জানে। বালক বয়সে মাতৃহীন। ওর বাবা ফিরে বিয়ে করেন। এই মা শংকরের আপন মায়ের চেয়ে বেশি। পনর-ষোল বছর বয়সে বরানগরে নিজেদের পাড়ায় শংকর মুদির দোকান দিয়েছিল। গানের গলাটি ভালো। দোকানে বসেই বাউল গান গাইতে গাইতে সেই তালে হারিকেনের চিমনি মুছে দাম বলতো - ছ'আনা। এর পর কোন খদ্দেরের সাধ্য আছে না কিনে!

তখন পাড়ায় থাকতেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলবেলা নিজের ছাদে বসিয়ে এই কিশোরের গান শুনেছেন অনেক দিন। অল্প বয়স থেকেই সংসারের জন্যে আয় করে। তবু বাংলা ভাষায় ভালো বই সব তার পড়া।

এই শংকরের তো তাকে ছেড়ে যাবার কথা নয়। তবে কেন গেল? কেন? আমি ডিকটেটর হয়ে পড়েছি। অন্যের সুবিধে অসুবিধে বুঝি নে? শংকর কি আরেকটু মনোযোগ চেয়েছিল? আরেকটু পাবলিসিটি? সে তো গ্রুপ থিয়েটারের আদত মানুষ। তার তো একই নাটকে আঁকড়ে পড়ে থাকার কথা নয়। তবে কি আরাম সিকিউরিটির হাতছানি শংকরের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল?

এখন তো শংকরকে আমার সবচেয়ে বেশি দরকার। আমার শরীর খারাপ শংকর। আমি আগের মত খাটতে পারি না। ভাবতে পারি না। এবার তোমারই

পঞ্চমুখের হাল ধরার কথা ছিল। সম্রাট নাটকে তোমাকে আমি কবি সাজাবো ভেবেছিলাম। দারুণ মানাতো। বিষণ্ণ কবি। গলায় গান।

অন্য সময় হলে শংকরের এই দলবদল লীলার কাছে বড় খবর হোতো। এখন নাটক পঞ্চমুখ গ্রুপ থিয়েটার সুজাতা ভরত হাউজ—কোনোটাই কোন রকম খবর দিয়ে লীলাকে চমকাতে পারবে না। সে এ-সব ব্যাপারে কোন আগ্রহ পায় না। আগেকার দিন হলে অমিয় লীলাকে ডেকে বলতো। এখন লীলা থিয়েটার নিয়ে বড় একটা তার সঙ্গে কথা বলে না।

সকালবেলাতেই অমিয়র অন্ধকার লাগতে লাগলো।

ম্যাসাজ নিয়ে রজনী চান করে উঠেছিল। কাগজ দেখে অমিয়কে ফোন করলো। তিনবার চেষ্টা করেও লাইন না পেয়ে চুপ করে কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকলো। থিয়েটারে দল-বদল থাকবেই। বড়বাবুর আমল থেকে দেখে আসছে রজনী। কিন্তু? কিন্তু শংকর? আমাদের শংকর? সে কি করে পারলো? তাও এমন নাটকে গেল—যা কিনা তার নিজেরই এতদিনের কষ্টে দাঁড় করানো সুজাতা নাটকের দু' নম্বর -যার টিকে থাকা নির্ভর করেছে এতদিন এক নম্বরের জাল নাটক হিসেবে—পাবলিককে ভাঁওতা দিয়ে—গাঁ-গঞ্জের মানুষকে বুজরুকি দিয়ে। এখন শংকর এক নম্বর থেকে দু' নম্বরে গিয়ে তাকে এক নম্বরের চেহারা দিতে উঠে পড়ে লাগবে! আশ্চর্য।

চণ্ডীর ঘুম ভাঙে বেলায়। অভ্যেস মত কাগজের পাতা উল্টে নীলকমলের পাবলিসিটিতে চোখ আটকে গেল চণ্ডীর। তার কাছাকাছি আরেকটা কলমের তফাতেই পঞ্চমুখের পাবলিসিটি কেমন মিনমিন করছে। কিন্তু শংকর? কোন্ শংকর? ফোন তুলে অমিয়কে পেল। 'কোন্ শঙ্কর?'

ওপাশে থেকে অমিয়র গলা ভেসে এল। 'আমাদের শঙ্কর! আর কাদের হবে চণ্ডীদা!'

চণ্ডী দেখলো লাইন কেটে গেছে।

বিষ্ণু দত্ত পাবলিসিটি থেকে নীলকমলের ফোন নম্বর দেখে ফোন করল। তখন বেলা এগারোটা হবে। নীলকমলে কেউ আসে নি। একজন চায়ের ছেলে নিয়ে শশাঙ্ক কাজ করছিল। কাজ মানে—ঝালদায় আর রানীগঞ্জে কল শোয়ের হিসেবপত্তর।

চায়ের ছেলেটি ফোন ধরে বলল, 'কেউ আসে নি এখনো। শশাঙ্কবাবুকে ডেকে দেব?'

শশাঙ্ক নিজে এসে ফোন ধরলো। 'হ্যালো।'

শশাঙ্কবাবু কথাটা শুনেই বিষ্ণু সতর্ক হয়ে গেল। কোন্ শশাঙ্ক? রজনীর বিয়ে করা স্বামী নয়তো? কিন্তু আবার এসে জুটলো কোত্থেকে? তাও আবার নীলকমলে। যেখানে শংকর যোগ দিয়েছে। আচ্ছা এ শংকর পঞ্চমুখের নয়তো?

অনেক কথাই মনে আসছিল এক সঙ্গে। খুব সাবধানে গলা মোটা করে বিষ্ণু বলল, 'আমরা বালি থেকে বলছি স্যার।'

—'বলুন।'

—'এ আপনাদের কোন্ সুজাতা? আমরা আরেক সুজাতার পাবলিসিটি দেখছি কাগজে—'

—'ও জাল মশাই। জাল। আমরাই এক নম্বর।'

—'ও তাই বলুন। তা আমরা বায়না নিয়ে কথা বলব ভাবছিলাম।'

—'গদিতে চলে আসুন।'

—'কার নাম নিয়ে বলবো দাদা?'

—কারও নাম দরকার নেই। সিধে চলে আসবেন।'

—'এতদূর থেকে যাবো স্যার। আপনার নামটা যদি বলতেন।'

— 'দোতলায় উঠে এসে বলবেন শশাঙ্ক দত্তর সঙ্গে দেখা করবো।'

সকাল বেলাতেই যদি তৈরি থাকতো বিষ্ণু—তাহলে অনেক কথাই মুখে এসে যেতো তার। এবার সে খুব সাবধানে জানতে চাইলো, 'এ শংকর কোন্ শংকর দাদা? কোত্থেকে যোগ দিলেন?'

—'গদিতে আসুন না। বসে বসে কথা হবে।'

—'পঞ্চমুখে ছিলেন। নাম দেখেছি যেন কাগজে—'

—'ঠিকই দেখেছেন। জাল নাটকে টিকতে পারেন নি বলেই চলে এলেন। অত বড় অভিনেতা—তার নাম শুনবেন না—এ কি হতে পারে।'

বিষ্ণু লাইন কেটে দিয়ে গুম হয়ে বসে থাকলো খানিকক্ষণ। শংকর এ করেছে কি? ব্যাপারটা কি? সব গোলমেলে লাগছে বিষ্ণুর। নিজেই বিড়বিড় করে বলে উঠলো, তাহলে তো ভরত হাউজে যেতে হচ্ছে আমায়। রজনীর খেদানো স্বামী তাহলে এখন নীলকমলের অধিকারী! গলার স্বর ঠিকই শুনছে সে।

বেস্পতিবার বেলা আড়াইটেতেও শংকর এলো না। চণ্ডী একবার শংকরদের বাড়ি যেতে চেয়েছিল। অমিয় শান্ত গলায় বলল, 'থাক। দরকার নেই চণ্ডীদা। যার আসবার সে নিজে আসবে।'

—'কিন্তু হিসেবপত্তরগুলো তো বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। সব যে গুলিয়ে রয়েছে। ওর ওপরেই তো সব দেখাশুনোর ভার ছিল। এখন তো সব জট পাকিয়ে গেছে।'

—'জট আপনা আপনিই খুলে যাবে। নাও চণ্ডীদা—তুমি এবার পাজামা পাঞ্জাবি পরে নাও।'

—'আমি?'

—'হ্যাঁ, তুমি আজ শংকরের জায়গায় শো করবে।'

—'আমি তো সুজাতায় কোনদিন এ-বোল করিনি অমিয়।'

—'শুনতে শুনতে সব ডায়ালগই তোমার মুখস্থ চণ্ডীদা।'

—'তা আছে। কিন্তু গান?'

—'এককালে তো টপ্পা গাইতে। তাই একখানা গেয়ে দেবে।'

—'সে তো কতকাল আগে। পাবলিক কি নেবে?'

—'ঠিক নেবে। তোমার জায়গায় আজ স্টেট ব্যাঙ্কের সেই ছেলেটা নামবে।'

এভাবে এক হপ্তা দিব্যি চলে গেল। পরের বেস্পতিবার আভার বোলে কল্যাণী নেই। নেই অমিয়র ডাবল। ভাগ্যি রজনী আজ তিরিশ বছর স্টেজে। অন্তত চল্লিশখানা নাটকে মহলা দিয়েছে। প্রায় তিনশো ক্যারেকটার আর্টিস্টকে চেনে।

শো শুরু হবার ঘণ্টাখানেক আগে সেবক বৈদ্য স্ট্রীটে একটা ছোট মত বাড়ির সরু সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে গেল। 'রাধা আছিস? রাধা?'

একটি ছোট ছেলে বেরিয়ে এসে বলল, 'আস্তে। মা ঘুমুচ্ছে।

—'ডেকে দে। বল গে রজনী মাসি এসেছে!'

রাধা ঘুম চোখে উঠে এসে বলল, 'কী ব্যাপার রজনীদি। তুমি?'

—'চল। চল। শাড়ি পরে নে। শো আছে তিনটেয়। মেক-আপ নিতে হবে তোর।'

—'এতদিন পরে মনে পড়লো আমায়। তোমার এখন কত নাম—'

—'পাকা পাকা কথা বলিস নি। চল—'

—'আমি যাবো কি। ছেলের জন্যে ময়দা মেখে রেখেছি। ওর বাবা সকাল সকাল ফিরবেন। তখন গরম গরম লুচি ভেজে দেব।'

—'তোর ছেলেকে হাউজে লুচি খাওয়াবো। স্বামীর জন্যে চিঠি লিখে রেখে যা—'

গাড়িতে রজনী বলল, 'বাঁদিকের উইংসে থাকবি। পম্পটার বলে যাবে। আস্তে আস্তে। পারবি না?'

—'তা পারবো।'

এ বেম্পতিবারও নাটক আটকালো না হাউজ ফুল গিয়ে একস্ট্রা চেয়ার আগের মতই দিতে হল। আভার রোলে সব ডায়ালগ রাধা রবিবারের ভেতর কণ্ঠস্থ করে ফেললো।

সোমবারের কাগজে নীলকমলের পাবলিসিটি বেরোলো। আসল সুজাতা! আসল সুজাতা !!

অমিয় পড়ে দেখে আস্তে নিজেকেই বলল, একেবারে আগমার্কা!

সোম মঙ্গল বুধ—তিনদিন বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যে অবধি ফাঁকা হাউজে সম্রাটের রিহার্সেল চলে। মঙ্গলবার বিকেলে পিনাকি চা খেতে খেতে রিহার্সেলের ফাঁকে কাকে যেন বলছিল, 'শংকরদার মনে যদি এই থাকবে তাহলে আমরা আগে থেকেই সাবধান হতাম।'

আরও যেন কী সব কথা কানে এল অমিয়র। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে চুপচাপ ডায়ালগের শব্দ পাল্টাচ্ছিল। রিহার্সেলের সঙ্গে সঙ্গে অদল-বদল করা অমিয়র অভ্যেস।

স্ক্রিপ্ট থেকে চোখ তুলে অমিয় খুব আস্তে পিনাকিকে বলল, 'শোন। আমার সামনে শংকরের নিন্দে কোরো না। এতদিন আমরা এক সঙ্গে ছিলাম।'

রিহার্সেলের শেষে ফাঁকা হলে বিষ্ণু এসে যা খবর দিল—সবার আগে রজনী তা হেসে উড়িয়ে দিল। 'আমাদের শশাঙ্ক দত্ত? পাগল! সে হবে অধিকারী? তা হলেই হয়েছে। তবে আর আমার দুঃখু কিসের? কপাল খুলে গেল বিষ্ণু।'

—'না। আমি গলা ঠিক চিনেছি ফোনে।

—'সকালে না বিকেলে ফোন করেছিলে?'

—'সকালে। না। কিছু খাইনি তখন।'

—'এখন কতটা খেয়েছো?'

—'খেয়েছি পাঁচটা। কিন্তু তাতে কি? আমি যা বলছি—সিওর না হয়ে বলছি না।'

রজনী হেসে উড়িয়ে দিল বিষ্ণুকে।

অমিয় হাসতে হাসতেই বলল, 'উত্তেজিত হবার কিছু নেই বিষ্ণু। শশাঙ্কবাবু নিজেও বহুকাল থিয়েটারের লোক। বড় দল করেছেন। কবিয়াল নাটক তাঁর হাত

দিয়ে এই কলকাতায় খারাপ বিজনেস করে নি। তিনি নিজেই একটা দল খুলতে পারেন। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?'

—'আশ্চর্য হই নি আমি। অন্য কথা ভাবছি।'

—'কি কথা বিষ্ণু?'

—'অধিকারী শশাঙ্ক দত্ত। পালার নাম সুজাতা। অভিনেতা পঞ্চমুখের শংকর। কল্যাণীও ভিড়েছেন গিয়ে। তাই বলছিলাম। আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না অমিয়।'

—'বলার দরকার নেই। অ্যাতো ভাববারও কিছু নেই বিষ্ণু। তবে ফোনে কারও গলা ঠিক চেনা যায় না।'

—'আমার ভুল হলে আমি খুশি হতাম অমিয়।'

ইলেকট্রিকের ভোল্টেজ কমে এল। কয়েক মিনিটের জন্যে ফাঁকা হলে অমিয় বিষ্ণু রজনী চণ্ডী রাধা—সবাই কেমন আবছা হয়ে গেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠলে অমিয় প্রথম কথা বলল। সম্রাটে কবি ক্যারেকটারটা লিখবার সময় আমি শংকরকে ভেবে নিয়েছিলাম। জানো বিষ্ণু।

সম্রাটের রিহার্সেলের দিনগুলোতে অমিয় রাত আটটা সাড়ে আটটার ভেতরে বাড়ি ফিরে যায়। সকাল সকাল ফিরে মন্দ লাগে না। তখন পাড়া জেগে থাকে। বাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে না। ছেলেমেয়েরা দাপাদাপি করে খেতে বসে। জ্যান্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে দেখা হয় অমিয়র।

রিহার্সেলের পর আজ কিন্তু বাড়ি ফিরে অমিয় কঠিন অবস্থায় পড়লো। ছোট মেয়ে পরিষ্কার জানতে চাইলো, 'শংকর কাকু আসে না কেন বাবা?'

—'সময় পায় না। পেলেই আসবে।'

—'কবে? অনেক দিন গান শুনিনি কাকুর।'

—'শীগগিরি আসবে।'

—'তোমাদের নতুন নাটকে শংকর কাকু নেই?'

—'নতুন নাটকের কথা তুই জানলি কি করে?'

—'দাদা বলছিল।'

—'আর কি বলছিল রে?'

—'শংকর কাকু নাকি আসছে না।'

—'আসবে। সময় হলেই আসবে।'

খাওয়া দাওয়ার পর লীলা দু'ধারে ঘরের মাঝখানটায় সরু ফালিতে স্কুলের

সেকেণ্ড টার্মিনালের খাতা নিয়ে বসেছে। এই সময় লীলা কালো ফ্রেমের বাই-ফোকাল চশমাটা চোখে দিয়ে নেয়। ক'দিন ধরেই দেখছে অমিয়। ওই একই জায়গায় বসে খাতা দেখে লীলা।

কোথায় অমিয়র সাজঘর। এক জোড়া গাড়ি। দু'জন ড্রাইভার। ইণ্টারকম টেলিফোন। সাজঘর আর ক্যাণ্টিন মিলিয়ে দু'-দুটো ফ্রিজ। স্টিরিও টেপ রেকর্ডার। এছাড়া একটা ভ্যাকাম ক্লিনারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কার্পেট স্টেজ—সব জায়গা থেকে ধুলো শুষে নেবে মেশিনটা। সামনের মাসেই ডেলিভারি দেবে।

আর এখানে! অমিয় তার খাটে বসে বসে দেখছিল। তারই বিয়ে করা বউ মাসান্তে গুটি-কয় টাকার জন্যে চোখে চশমা লাগিয়ে ছাত্রীদের খাতা থেকে অক্ষর খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

এক রকমের রাগ হল লীলার ওপর।: আবার মায়া এসে সে-রাগ মুছে দিল। বেশ ছিলাম ওষুধের কোম্পানির চাকরিতে। তখন লীলা আমার সঙ্গিনী ছিল। সব নাটকের খোঁজ নিত। ওপেন এয়ার থিয়েটার ভাড়া নিতে হলে টাকা দিত এই লীলা। এখন যে নতুন নাটক নামানো হচ্ছে জেনেও একটা কথা বলে নি—কোন কিছু জানতে চায় নি। তখন টেলিফোন করতে হলে ডাক্তারখানা কিংবা ডাকঘরে যেতে হোত। ওন ইওর ওন টেলিফোন স্কীমে টেলিফোন এসেছে এ-বাড়িতে। কিন্তু লীলা একটা দিন সখ করে ডায়ালও করে দেখে না আজকাল।

—'আমার দিকে একবার তাকাবে না?'

খাতা থেকে চোখ তুললো না লীলা।

—'পঞ্চমুখের নতুন নাটকের রিহার্সেল চলছে।'

—'জানি।'

—'কোন্ নাটক বলতো লীলা।'

চোখ না তুলেই লীলা বলল, 'সম্রাট'।

—'তুমি একবার খোঁজ নিলে না পর্যন্ত। তুমিই তো বলেছিলে—আমরা পয়সার লোভে সিকিউরিটির লোভে সুজাতা নাটক নিয়ে পড়ে আছি। এবার ছাখো আমরা কেমন পাল্টাচ্ছি।'

লীলা মাথা নিচু করে নম্বরের টোটাল দিচ্ছিল। তাই দিয়ে যেতে লাগলো। একবার অমিয়র দিকে তাকালোও না।

—'ভয় পেয়ে শংকর চলে গেছে।'

লীলা নতুন একখানা খাতা দেখতে দেখতে বলল, 'জানি।'

—'জেনেও তুমি কিছু জানতে চাও নি? এটা কেমন ব্যাপার?' খানিক অপেক্ষা করে অমিয় বুঝলো লীলার কাছ থেকে এ-কথার কোন জবাব পাওয়া যাবে না।

—'তুমি কি আমার দিকে একবার তাকাবেও না। সারাদিন রিহার্সেলের পর ভীষণ টায়ার্ড। আমার এই শরীরে তোমাকে তো আমার দরকার হয়। আমারও তো তোমার কাছে কিছু কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে। তুমি কাছে এসে বসবে—এমন ইচ্ছেও তো আমার হতে পারে।'

লীলা চোখ তুলে তাকালো এতক্ষণে। সে মুখ ভাবলেশহীন। পলকহীন চোখে বলল, এত পরিশ্রম না করলে পারো। এই তো এতবড় অসুখ থেকে উঠলে। একটু চোখ বুজে থাকলে পারো।'

—'আমি না দেখলে কে দেখবে? যেদিকে লক্ষ্য রাখিনি—সেদিকেই গোলমাল।'

—'কেন? আর কেউ দেখার নেই?'

লীলার এ-কথায় অমিয় সরাসরি তার মুখে তাকালো। লীলার চোখ তখন পলকহীন। তাতে অমিয়র অস্বস্তিই বেড়ে গেলো। তাড়াতাড়িতে সে বলল, 'ভরত হাউজে এটা আমাদের নতুন ভেনচার। তুমি তো জানো নতুন নাটক নিয়ে আমি কেমন মেতে যাই। ঘোরে থাকি। মহলার সঙ্গে সঙ্গে বদলাই। নতুন ভেনচার স্টেজে হওয়ার আগে অব্দি আমার খানিকটা করে আয়ু ক্ষয় করে দিয়ে যায়। তুমি কিন্তু এবারে একদম এগিয়ে এলে না। অথচ সুজাতার জায়গায় নতুন ভেনচারের কথা তুমিই প্রথম আমার মাথায় ঢুকিয়েছিলে। আর এখন তুমিই সবচেয়ে সায়ালেণ্ট! নতুন নাটকে—'

আর এগেতে পারলো না অমিয়। লীলা হাতের খাতাখানা ভাঁজ করে রেখে বলল, 'নতুন? ভেনচার! কোথায়? সম্রাটে?'

নিজের গলাই নিজের কানে এবার কৈফিয়তের মত শোনালো অমিয়র। 'নতুন নয়? এ নাটক নতুন নয়? লেখার সময়টা তো তুমি জানো। তবু জানতে চাইবে নতুন কিনা? ভেনচার! বলে ঠাট্টা করছো?'

লীলা বলল, 'লিখেছো নতুন। কিন্তু আর সবই তো পুরনো। রজনী যেখানে তোমার সঙ্গে আছে—সেটা আসলে নতুন কোন ভেনচারই নয়।'

অমিয় এতটা ভাবে নি। সে বলল, 'তাহলে তো তুমি বলতে পারো—সেই একই হাউজ ভরতে সম্রাট হচ্ছে। সুতরাং এ কোন নতুন অ্যাটেমপ্ট্ নয়।'

—'তা বলছি নে। তবে তুমিই বলো—সুজাতা নাটক করতে গিয়ে তুমি যেভাবে তোমার সারাদিনের অভ্যেস তৈরি করেছো—তা কি এ নাটকে পালটাবে ?'

—'কী রকম অভ্যেস ?'

—'ভরত হাউজ তোমার ঘর-বাড়ি। বেলা এগারোটা থেকে গভীর রাত। ওখানেই কাটছিল তোমার। তোমার এতটা সময়ের সবটাই কি নাটক পেয়েছে ? পায় নি ? পেতে পারে না। এই ভেনচার আসলে নতুন বোতলে পুরনো মদ। রজনী কখনো তোমায় ছাড়বে না। নতুন নতুন নাটকের মহলা চালু করে দিয়ে তোমায় আটকাবে।'

অমিয় মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, হিংসে মানুষকে অন্ধ করে। মূর্খ করে। লীলা একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারতো—এ নাটকে রজনী রাজি ছিল না। এ নাটকের মহলা রজনীর মাথা দিয়ে বেরোয় নি। বেরিয়েছে অমিয়র মাথা থেকে। তারই জেদে এ-সব হচ্ছে। না হলে শংকরের চলে যাওয়ার কথা তো ছিল না।

অমিয় উঠে গিয়ে ভরতে ফোন করলো।

ওপাশ থেকে পাখি পড়ার মত পরিষ্কার গলা ভেসে এল। 'নমস্কার। পঞ্চমুখ। ভরত থেকে বলছি। শনি-রবি ছুটির দিন তিনটে ছ'টা—বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ছ'টায় সুজাতা। নাটক নির্দেশনা—অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাড়ে দশ সাড়ে সাত সাড়ে পাঁচ সাড়ে তিন টাকার টিকিট হলে। সর্বপ্রকার ফ্রি পাস বন্ধ।'

অমিয় ধমকে থামালো বিপুলকে। 'আজ কি শো আছে নাকি ? বলেছি না শুধু শোয়ের দিন বলবি।' বিপুলের কোন পার্সোনালিটি গড়ে উঠলো না। অমিয় দু'-একবার চেক করতে বাইরে থেকে ফোন করেছে। বিপুল বলতে পারে নি। অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পেয়েছে। তাই এখন ওই কথাগুলো ওর জপমন্ত্র। বাইরের ফোন এলেই ওর ধারণা অমিয়দা চেক করছে।

—'ছাখো তো লালু আছে কিনা। থাকলে গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে বল।'

—'একটু ধরুন অমিয়দা। আমি দেখে বলছি।'

একটু বাদেই বিপুলের গলা ভেসে এল। 'লালু খেতে বসেছে ক্যান্টিনে। খেয়ে উঠেই গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।'

—'চণ্ডীদা খেয়েছেন ?'

—'উনিও খেতে বসেছেন। ডাকবো।'

—'না দরকার নেই।'

লীলা খাতা দেখে যাচ্ছিল। পৌনে দশটা নাগাদ লালু এলো। দশটায় অমিয় গাড়ির পেছনের সিটে গিয়ে বসলো। 'চিৎপুর চলো।'

ফাঁকা রাস্তা। ঠিকানা মিলিয়ে পনেরো মিনিটের ভেতর সেই দোতলা বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থামালো লালু। সিঁড়ির মুখের সাইন বোর্ডটাও পড়তে পারলো অমিয়। রাস্তার আলোয়। নীলকমল যাত্রা সমাজ। পরের লেখাগুলো ছোট।

দোতলা থেকে হাসির টুকরো মহলার ডায়ালগের দু'-এক দানা সুর পার্টির কেউ বেহালায় ছড় টানলো—সবই গাড়ির ব্যাক সিটে বসে শুনতে পাচ্ছিল অমিয়। অনেকগুলো গলার স্বর। তার ভেতর থেকে নিজের চেনা গলা খুঁজে নিতে চাইছিল অমিয়। ট্রাম এসে সব গোলমাল করে দিল।

দোতলার সিঁড়ি ধরে দু'-একজন নেমে এসে ট্রাম ধরছিল। বাসে উঠছিল।

সিঁড়ির মুখোমুখি একখানা ফিয়েট দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার সিটে বসে ঢুলছে। অমিয়র চেনা লোকটি এসে গাড়িতে উঠলো।

—'লালু। ওই গাড়িটার মুখোমুখি গিয়ে পার্ক করো। এখুনি। পাববে?'

ফিয়েটে সেলফ্ দেবার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কমুখের অ্যামবাসাডর গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। হেড লাইটের কড়া আলো ভেতরটা আলো করে দিতে শংকরকে দেখতে পেল অমিয়। পেছনের সিটে তারই মত হেলান দিয়ে বসে আছে। মুখে আলো পড়ায় রেগে উঠে বসলো।

—'লালু। আলো জ্বালিয়ে রাখো।'

—'আমাদের শংকরদা যে—'

—'যা বলছি তাই করো। ফিয়েটকে বেরোবার পথ দিও না।'

শংকরের গাড়ি হর্ন দিতে শুরু করেছে। লালু পথ দিল না।

রাগে রাগে শংকর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। জোর পায়ে। গায়ে সিল্ক। পায়ের জুতো ফুটপাথের এটুকুর ভেতরেই বেশ সুন্দর মচমচ আওয়াজ দিল। অমিয়র ঘড়িতে রাত পৌনে এগারোটা। যে জোরে হেঁটে এসেছিল শংকর—গাড়িটা দেখে—ঠিক তত তাড়াতাড়িই মিইয়ে গেল শংকর। পেছনের সিট থেকে অমিয় পরিষ্কার গলায় বলল, 'উঠে এসো! আমি পৌঁছে দিচ্ছি তোমায়।'

কী করবে ঠিক করতে পারছিল না শংকর। ফিয়েটের বনেট চালু ইঞ্জিনের ওপর থরথর করে কাঁপছে। তাতে রাস্তায় সরকারী আলো পড়ে জায়গাটুকু একদম রূপকথার দেশ হয়ে গেল।

—'নীলকমলের গাড়ি ছেড়ে দাও।'

এ-গলা আজ ষোল বছর চেনে শংকর। 'গাড়ি তুলে দাও বিজয়। আমি এ গাড়িতে যাবে।'

—'কাল কখন যাবো স্যার ?'

শংকরের খুব লজ্জা হল। দরজা খুলে লালুর পাশে বসতে গিয়ে অস্পষ্ট কি একটা বলল। যার মানে হয়—রোজ যেমন আসো তেমন আসবে।

—'উঁহু। তুমি পেছনে আমার পাশে এসে বোসো শংকর।'

তাই বসতে হল শংকরকে। দু'জনে পাশাপাশি গাড়ির দুই জানলায়। লালুকে ডিরেকশন দেবার কিছু ছিল না। চেনা প্যাসেঞ্জার। চেনা পথ।

কথার আর কিছু না পেয়ে শংকর বলল, 'গাড়িটা ডেলিভারি নিলে কবে ? বেশ সিট করেছে কিন্তু দাদা। ডবল ফোম।'

—'খুব ভালো করে সারায় নি। আওয়াজ আছে এখনো।' শংকরের মুখের দিকে না তাকিয়েই অমিয় বলল।

—'তুমি আবার এত রাতে অদ্দুর যাবে কেন দাদা। তোমায় নামিয়ে আমায় দিয়ে আসুক লালু।'

শুনতে ভালো লাগলো অমিয়র। যেন শংকর এখনো পঞ্চমুখেই আছে। রিহার্সেলের পর দুজন একসঙ্গে বাড়ি ফিরছে।

—'নাঃ! তোমাকেই আগে পৌঁছে দিয়ে আসি। চোখে মুখে বাতাস লেগে ভালোই লাগছে!'

—'তোমার শরীর এখন কেমন ?'

অনেকক্ষণ পরে জবাব দিল অমিয়, 'ভালোই। বিশেষ কোন কমপ্লেন নেই।'

তারপর বেশ, খানিকক্ষণ চুপচাপ। দু ধারের জানলায় কলকাতা পার হয়ে যাচ্ছে। কখনো আলো কখনো অন্ধকার।

—'কলশোয়ে বাইরে যেতে হচ্ছে না ?'

—'তিনবার গেছি।'

—'ডায়ালগ সিন ডিভিশন কি রকম ?'

কেউ কারও মুখের দিকে না তাকিয়েই কথা হচ্ছিল।

—'দুটো সিন জমাট আছে। বাকি সব ঢিলেঢালা। কম্পোজিশন বাজে। টিমওয়ার্ক বলতে কিচ্ছু নেই।'

—'ঘষেমেজে নাও। এখানে তো তোমার ফুল ফ্রিডম শংকর। মাথার ওপর কোন অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় নেই।'

শংকর মাথা নিচু করলো। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'দাদা—তোমার সুজাতা এতদিনে অন্তত বিশ লাখ লোক দেখেছে। তোমার পেপার পাবলিসিটি অন্তত এক কোটি বাঙালীর চোখে.পড়েছে। এই পাবলিসিটি বিল্ড-আপের অনেকখানি সুযোগ পাচ্ছে নীলকমল।

—'পাক না।' বলে অমিয়র মনে হল একবার জানতে চায় এ শশাঙ্ক কোন্ শশাঙ্ক। কিন্তু বলতে পারলো না।

.—'একই নাম দিয়ে নাটক নামানোর জন্যে তুমি ইচ্ছে করলে কোর্টে যেতে পারো। আদালতে ইনজাংশন চাইলেই পাবে।'

—'আমি তো ও-পথে যাবো না শংকর। বরং পঞ্চমুখ অন্য নাটক শুরু করছে।'

—'নীলকমলের তাতে পোয়াবারো দাদা! নিজের আর তোমার—দুটো পাবলিসিটি বিল্ড-আপের সুযোগ ফাঁকা ময়দানে নীলকমল একা এনজয় করবে। তোমার শুধু খাটুনিই সার!'

--'করুক না। আমি দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছি শংকর। আসল নকল—দর্শক ছাঁটাই-বাছাই করে নেয়। কোন গুণ না থাকলে নীলকমলের এ লম্ফঝম্ফ দু'দিনের আর গুণ যদি থাকে তাহলে টিকে যাবে। কেউ আটকাতে পারবে না।'

—'তুমি একটুও পাল্টালে না দাদা।'

—'আমি গ্রুপ থিয়েটারের মানুষ। যেটুকু হয়েছি গ্রুপ থিয়েটারেই। আরেকটা দল যদি দাঁড়ায়—সে তো আমাদেরই ভালো। থিয়েটার মুভমেণ্টের উপকার হবে।'

—'তুমি কি মনে কর—এসব যা হচ্ছে—সবই থিয়েটার? মুভমেণ্ট?'

'লোকের ওপর নির্ভর করে শংকর। মানুষ কিভাবে নেয় তার ওপর।' গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। বাইরে আলো। অমিয়র বড় মত মাথাটা ঘিরে ফিকে আলোর রেখা। মুখখানা দেখতে পেল না শংকর। একবার রাস্তার আলো আসছে ভেতরে আবার অন্ধকার।

—'থিয়েটারের এখন আর কিছু নেই দাদা। সবটাই দর্শক। সবটাই যাত্রা। পাবলিসিটি বিল্ড-আপ। এই গ্রেটেস্ট মাস মিডিয়া শীগগিরি থিয়েটার-সিনেমাকে গিলে খাবে।'

—'পারলে খাবে। সে তো প্রাকৃতিক ব্যাপার শংকর। টিকে থাকার লড়াইয়ে যে টিকতে পারে টিকবে। বাকি সবাই হজম হয়ে যাবে। থিয়েটার তো দোআঁশলা জিনিস। তাই নয়?'

॥ একুশ ॥

শ্যামবাজার পাড়ায় আজও জাম, জামরুল, আম মাথায় ফিরি করে যায়। মোড়ের মাথায় ফেরিওয়ালীর গলা—বানারসী ল্যাংড়া। বানারসী। দোতলার জানলায় বসে শুনতে পাচ্ছিল অমিয়। একটু বাদেই আকাশ ছিঁড়ে গিয়ে বর্ষা পড়বে। সন্ধ্যে এইমাত্র মুছে গেল। স্টিরিওতে বড়ে খানের দাদরা চাপিয়ে দিয়ে অমিয় চোখ বুজে পড়েছিল। যখনই কোন নাটকে সে আর এগোবার রাস্তা পায় না—তখন কয়েকখানা রেকর্ড তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। মেঘ রাগের আমীর খাঁ কিংবা বিলায়েৎ—এঁরা তাকে কবন্ধ নাটকের গলিতে আলো হাতে রাস্তা করে দেয়। শুনতে শুনতে মাথার ভেতরটা হলঘর হয়ে যায়। ওস্তাদের গলায় টোবকিপের স্বাদ অমিয়র মাথার ভেতরে একটা আস্ত সাদা টগর ফুটিয়ে তোলে। সে আটকে যাওয়া ডায়ালগের জোড় খুঁজে পায়।

বড়ে খাঁর শেষ দিককার রেকর্ড। রেকর্ডের খাপে সেই বিখ্যাত গোঁফ ঝোলানো ছবি। এ-ঘরে এখন সে আর বড়ে খাঁ শুধু। সে একজন সাধারণ থিয়েটারওয়ালা। আর বড়ে খাঁ। দেশের ইতিহাসে একজন কিংবদন্তীর মানুষ।

সারা ঘরের জিনিসপত্রের ওপর অমিয়র চোখ ঘুরে এল। লীলা এখন এ-ঘরে আসবে না। ছেলেমেয়েরাও না। তারা জানে তাদের বাবা নতুন নাটক নিয়ে পড়েছে। এই সময়টা কিছুদিন ধরে অমিয়র ওপর দিয়ে বড় সাইজের ঝড় বয়ে যাবেই যাবে।

সত্যিই তো আমার আজ এই অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার কোন দরকার ছিল না। ও ঘরে আমার বিয়ে করা বউ লীলা এখন কিছু একটা করছে নিশ্চয়। ইতিহাসের এককালের বড় মাস্টামশায়ের মেয়ে। টাইম সিকোয়েন্সটা খুব কারেক্ট মেয়েটার। কখন অমিয়কে একা ঘরে ফেলে রেখে সরে থাকলে অমিয়র বুকের মাঝখানটায় কষ্ট হবে—তা ঠিক জানে এই পুরনো বউটা।

অন্য বারের নতুন নাটকে আসল হিসেব থাকে লীলার হাতে। এবারের নাটকে লীলা একদম অ্যাবসেন্ট। অথচ এত বড় নাটক—এত ব্যাপ্ত নাটকে অমিয় আগে কখনও নাক গলায় নি। জানলার তাকে পাশবালিশটাকে ভাঁজ করে অমিয় মাথা রেখেছে। তার মাথার ভেতরে এখন অনেক জিনিস এক সঙ্গে রাখতে হচ্ছে। অন্যবার সব মগজে রেখেও তার ওপর উৎসাহ জিনিসটা টগবগ করে ফুটতো।

নিজের শরীরের বাইরে এসে অমিয় এতকাল অসুরের শক্তিতে কাজ করেছে। এ তার কি হল।

টাকার চিন্তা নেই বলে তার আজ এই অবস্থা? সে তো চায়—পঙ্কমুখ আবার চাকার নিচে চলে যাক। সেখান থেকে আবার সবাই মিলে কাঁধ দিয়ে চাকাটাকে ঠেলে তুলুক। পড়তি চাকা! নামতি চাকা! এই নিয়ে কবি সুনীল বসু একটা কবিতা লিখেছিল। দারুণ কবিতা। সুনীল কি আজও হাবড়া থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে? আগে কত জিনিস তার মনে থাকতো। সেই ছোটবেলার কথা। স্কুলের কথা। দিদিমা বলেছিল, ফুলেব মাছি হোস।

দিদিমাগো। তুমি আমার জীবনের প্রথম হিবোইন। তুমি কবিতা লিখতে। আমি নাটক লিখি। দাদরার ওপর গানখানা রেকর্ড থেমে গিয়েও ঘবের ভেতরটা ভরাট করে রেখেছিল। অমিয়র আজকাল খুব কষ্ট লাগে একটা ব্যাপারে। থিয়েটারকে আমি আমার জীবনের ষোল সতেরো বছর দিয়ে দিলাম। তার বদলে থিয়েটার আমায় কি দিল? ছোট মেয়েটাও বড় হয়ে যাচ্ছে। তাকে আর কোলে নিতে পারবো না। ওকে কোলে নেওয়ার সময়টায় আমি রিহার্সেল দিয়েছি। দোকানে গেলে পয়সা দিয়ে নতুন মোড়কে কত সাবান কত জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। যায় না শুধু অযত্নে হারানো সময়। অমিয় নিজেকে মনে মনে কারেক্ট করলো। হেলায় হারানো।

সুজাতার পেপার পাবলিসিটিতে এখন বড় করে লেখা হয়—এশিয়ার রেকর্ড ভঙ্গ হওয়ার পথে।. বিশ্বরেকর্ড যাদের মুঠোর ভেতর। কত নাইট যেন? এখন আর মনে নেই অমিয়র। সেই চালু নাটক ফেলে অমিয়র ভেতরকার—চণ্ডীদার ভেতরকার গ্রুপ থিয়েটারি মেজাজ একদম অজানা পথে পা দিয়েছে। শংকরও তো গ্রুপ থিয়েটারের মানুষ। রজনীও তো তাই। তবু শংকর ভয় পেল কেন? নতুন নাটক যদি না জমে। যদি ভরাডুবি হয়। মাস গেলে নিশ্চিন্ত আটখানা একশো টাকার নোট কোত্থেকে আসবে। শংকর তো এত ভীতু ছিল না কোনদিন।

এবার যে সবকিছু স্টেক করতে হচ্ছে। অমিয় তো তার শরীরটাই বাজি রেখেছে। যে থাকবার সে থাকবে। যে যাবার সে যাবে। কাউকে বেঁধে রাখার দিব্যি দিয়ে স্টেজে নামে নি সে। রাতের রাস্তা দিয়ে শংকরকে নিয়ে লালু সেদিন জোরেই গাড়ি চালাচ্ছিল। একবার ভেতরের আলো জ্বালতে অমিয় শংকরের দিকে তাকিয়েছিল। সে চোখের সামনে শংকর চোখ তুলতে পারে নি। ও যখন সন্ত যুবক—তখন থেকে অমিয় ওকে জানে। শংকরের তো এমন হবার কথা ছিল না।

ও তো অন্য ধাতের মানুষ। সারা গ্রুপ থিয়েটারটাই ওর কাছে এক রকমের পিকনিক পার্টি। ও নিজেই রান্না করবে। নিজেই পরিবেশন করবে। ও কেন নীলকমলে গেল? এমন নীলকমল—যার লক্ষ্য পঞ্চমুখের সুজাতাকে দু' নম্বর করে দিয়ে নিজের সুজাতাকে এক নম্বর করতে চায়। বিষ্ণু বলেছিল বটে—এর পেছনে কে এক শশাঙ্ক দত্ত আছে—যার গলা টেলিফোনে শুনতে রজনীর বাড়ি পালানো স্বামীর গলার মত। নামেও মিল। কিন্তু এ-সব কি হতে পারে। না হয়! বিষ্ণুর মত স্ট্রেঞ্জ ইমাজিনেশন।

সুজাতার তিন তিনটে কলশোয়ের অ্যাডভান্স টাকা সম্রাটের পোশাক তৈরিতে ঢেলেও কুলোনো যাচ্ছে না। প্ল্যাস্টিক ইমালসন পেইন্টে আঁকা রুপোলী ব্যাকগ্রাউণ্ডে সারা স্টেজ থমকে থাকবে। তার এক কোণে গাঢ় লাল রংয়ের সূর্যটা সব সময় অস্ত যাবে। অক্স্ ব্লাড রেড রঙের। সব ক'টা সিনই সায়াহ্নে শুরু। একবার যদি লীলাকে ডেকে তার এসব কথা বলতে পারতো অমিয়। শুধু একবার।

—'বাবা। তোমার ফোন।'

—'বলে দে ঘুমোচ্ছি।'

—'না বাবা। ডাক্তার সেনের ফোন। তোমায় ডেকে দিতে বললেন।'

'ফোন ধরে অমিয় বুঝলো, এখুনি যাওয়া দরকার। আজ তার খুব শুয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল। ওধার থেকে ডাক্তার সেন বললেন, 'একবারটি আসুন। মিসেস দত্ত আমার চেম্বারে রয়েছেন।'

—'কি হয়েছে?'

—'আসুন না আপনি। সামনাসামনি কথা হবে।'

বেরোবার সময় এতকাল অমিয় দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে তাকিয়ে লীলাকে বলে এসেছে, 'আসি। দরজাটা আটকে দাও।'

আজ তাই বলল। লীলা চোখ তুলে তাকালো মাত্র। কিন্তু দোর অব্দি এগিয়ে এলো না। একটু দাঁড়িয়ে অমিয় বেরিয়ে এল।

বাইরে সেই কলকাতা। কী হতে পারে রজনীর? ডাক্তার সেন ওকে দেখে থাকেন। অমিয়কেও দেখেছেন দু'একবার। ইদানীং কিছুকাল ধরে রজনীর জন্তে মাঝে মাঝেই ডাবলের দরকার হচ্ছে। আচমকা থার্ড সিনে এসে প্রচণ্ড মাথায় যন্ত্রণা। কিংবা সাড়ে সাত টাকার রো থেকে কেউ প্যাক দিয়ে উঠলো, লাউডার। লাউডার প্লিজ।

রজনী নিজেই বলেছে, আমি রেস্ট চাই অমিয়। মাঝে মাঝে আমার শুধু চুপ

করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। অমিয় কিছু বলে নি। মনে মনে ভেবেছে আবার এখন কোত্থেকে নন্দনার মত মেয়ে পাই। শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করা হয়ে গেলেই পাখি পালায়। বাজারে দর ওঠে। বিশেষ করে সুজাতা নাটকের পাখির তো বাইরে কদর বেশি। বিষ্ণু দত্তর খবর যা তাতে তো তাই মনে হয়। গন্ধর্বের বিনোদন সংখ্যায় নন্দনা কীভাবে ব্লো-আপ পেয়েছিল। গন্ধর্ব নন্দনাকে নিয়ে সেবারে লেখার পর সে এখন চিৎপুর সম্রাজ্ঞী। কী একটা অপেরা যেন? ঠিক নামটা মনে পড়লো না অমিয়র। ট্যাক্সির টায়ার সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যু পেয়ে পাঁইপাঁই ছুটছিল। সেই অপেরায় নন্দনার এখন মাস মাইনে সাড়ে সাত হাজার টাকা। টাকা। তাছাড়া হোল টাইম গাড়ি। সল্ট লেকে পরিমল নিজে দাঁড়িয়ে বাড়ি তুলছে। সবই অবশ্য এদিক সেদিক থেকে ভেসে আসা কথা। খানিক বাদ দিয়েও খানিক তো সত্যি। নতুন করে পাখি পুষে তালিম দেবার পর উড়িয়ে দেবার ইচ্ছে আর নেই অমিয়র।

তবু বদলি যারা যারা সুজাতার রোলে রজনীর হয়ে করে গেছে—তাদের অনেকেই রজনীর এক সময়কার অফিস ক্লাবের নাটকে প্লে করা মেয়ে। তারা কেউ আর মেয়ে নয় এখন। তবু চালু নাটক ফেমাস ক্যারেকটার পেলে কে না খেটে অভিনয় করে। তাই কেউ খুব একটা খারাপ করে নি। বরং ভালোই বলা যায়। সবাই তো রজনীর মত উতরোবে না। সে সম্ভবত বাংলা থিয়েটারের বাগানে শেষ বড় গাছ। বাকিগুলো একে একে ঝরে পড়ে গেছে। কারও বয়স হয়েছিল। কাউকে ঝড় এসে নিয়ে গেছে। কেউ অভিমানে ক্ষয় হয়ে গেল। অমিয়র এক এক সময় মনে হয়—ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি জিনিসপত্তর-গুলো সহজসরলভাবে এগোবার সময় পিঠের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়—পা টেনে ধরে। তার কি দরকার ছিল এত সব জানার। কিছু না জেনেই তো সে দিব্যি ব্রেখট, ইবসেন, শ, পিরানদোলা করে বেড়াতে পারতো। একটা লাগসই বাংলা নাম দিয়ে খেঁদি, ক্ষেন্তির মুখে জারমার কিংবা ইটালিয়ান ক্যারেকটারের কথাবার্তা বসিয়ে দিতে পারতো। কি দরকার ছিল? কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? দিদিমা? আজ বিকেল থেকেই তাঁর কথা মনে পড়ছে অমিয়র।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের অফিসের কাছাকাছি ডাক্তার সেনের চেম্বার। সামনে একটা লরী থেমে যাওয়ায় ট্যাক্সি আটকে গেল। দু' ধারে সারি দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে।

সুজাতার রোলে ভাবল যেদিন অভিনয় করে সেদিন রজনী কী নিশ্চিন্তে গ্রিন

রুমে বসে জাঁতিতে সুপুরি কাটে, পান বানায়, গলায় গুনগুন করে নীলদর্পণের গান উঠে আসে ওর। ফোর্থ সিনে মিনিট চারেকের জন্যে বাইরে বেরিয়ে এসে খানিক জিরোবার সময় পায় অমিয়। তখন রজনীর অর্ডার মত চণ্ডীদা এক গ্লাস চকোলেট মিল্ক এগিয়ে দেয়। গায়ের পাঞ্জাবি পালটে দেয়। হেয়ার স্টাইলও সামান্য বদলে নেয় অমিয়। তখন নিশ্চিন্ত রজনীর চলাফেরা তার চোখে পড়েছে। কী স্বস্তি ওর মুখে। রজনী সাজঘরে একা একা বালিকা হয়ে ঘুরে বেড়ায় তখন। স্টেজে কিন্তু তখন পুরোদমে সুজাতা।

'ঠিক এই সময় তোমার যাওয়া ঠিক হয় নি শংকর।' অমিয় বিড়বিড় করে বলে ফেলেই বুঝলো সর্দারজী ট্যাক্সি ড্রাইভার শুনতে পায় নি। পেলেও মানে বুঝতো না।

পুলিশ এসে লরীর ড্রাইভারকে গাড়ি সাইড করতে বলল। চারদিক থেকে আটক গাড়িগুলোর একটানা হর্ন। দিব্যি ইলেকট্রিক আলোয় কাক নেমে এসেছে রাস্তায়। গম খুঁটে খাবে।

রজনীর কথা মত পঞ্চমুখের সভাপতি হিসেবে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় সুজাতা রোলের জন্যে কয়েকজনের ইণ্টারভিউ নিয়েছে। কেউ নাচে তো গায় না। গায় তো নাচে না। সিকোয়েন্স মত ঠিক জায়গায় শক্ত করে তাকে আঁকড়ে ধরতেও জানে না। কয়েকজনের তো বুধবার আর শুক্রবার রিহার্সেল চলছিল। সম্রাট নামানোর দিন এগিয়ে আসায় সব বন্ধ রাখতে হয়েছে। অথচ সম্রাটকে চালু করতে সুজাতা বৃহস্পতি শনি রবি ছাড়াও ছুটির দিনগুলো ধরে হপ্তায় কম করেও পাঁচটা শো রানিং রাখতে হচ্ছে। তা রাখতে হলে চাই রজনীকে। সুজাতা নাটকের প্রাণ। লীলার ভাষায় মিসেস দত্ত। কিংবা তোমার হিরোইন।

অমিয়র অনেক দিনের ইচ্ছে—কাগজে বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দেবে।

ভালো নাটক করিতে চাই
নাট্যামোদী সহৃদয় বাঙালী টাকা দিয়া সাহায্য করুন
শুকনো উপদেশ নিষ্প্রয়োজন।

লীলা যদি একটু বুঝতো। কিংবা বেশি বোঝে বলেই হয়তো এত শক্ত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। চালু নাটক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে এই যে, আরেক নাটক শুরু হয়ে গেল পঞ্চমুখের জীবনে—যার প্রথম দৃশ্য শংকরের প্রস্থান, দ্বিতীয় দৃশ্য শোনা যায় শশাঙ্কর উদয়, তৃতীয় দৃশ্য সম্ভবত এই ট্যাক্সিযাত্রা দিয়েই শুরু। চতুর্থ

দৃশ্য—ঝড়ের আভাস—লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাক মুখে। ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছে। নিজের ভাবনায় নিজেই একটু হাসলো অমিয়।

ডাক্তার সেনের চেম্বার প্রায় ফাঁকা। অর্থাৎ রুগীর সময়টা পার করে দিয়ে তবে অমিয় এসেছে। ভালোই লাগলো। স্লিপ পাঠাতেই ডাক্তারবাবু নিজেই বেরিয়ে এলেন। 'আসুন। আপনার জন্যেই বসে আছি।'

—'মিসেস দত্ত কোথায় ?'

—'তাঁকে দোতলায় আমাদের মিউজিয়মে পাঠিয়ে দিলাম একটু আগে। ঘুরে ঘুরে দেখুন না—এই মানুষেরই শরীরের উপাদান কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাইজ, সংস্থান—সব কিছু পালটে ফেলেছে।

ডাক্তার সেনের এ মিউজিয়মের কথা অমিয় আগেও শুনেছে। কিন্তু একবারও দেখা হয় নি তার। 'চলুন না—আমিও দেখে আসি।'

—'না। আপনি আমার সামনে একটু বসবেন। একা একা। সে জন্যেই আমি ওয়েট করছিলাম। ঘাবড়াবেন না।'

দু'জনে মুখোমুখি বসার পর ডাক্তার সেন বললেন, 'মিসেস দত্তর গলার স্বর এমন কতদিন বসে গেছে ?'

—'কয়েক মাস হল গলায় তেমন জোরালো আওয়াজ ফিরে পাচ্ছে না ও। মাঝে মাঝে ঠিক হয়। আবার খারাপ। এই তো চলছে দেখছি।'

—'কমপ্লিট রেস্ট দরকার।'

—'তা কি শুনবে ডাক্তারবাবু ?'

—'কেন ? আপনাদের তো ডাবল্ থাকে।'

—'তা আছে। কিন্তু ক'দিন বসে থাকার পরেই কেমন ভয় ওকে পেয়ে বসে। এই বুঝি থিয়েটার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। যত্ত পাগলামি।'

—'না। বিশ্রাম ওকে নিতেই হবে। হয়তো স্থায়ী স্বরভঙ্গ হয়েছে। কিংবা—'

—'থামবেন না ডাক্তার সেন।'

—'গড্ ফরবিড্। হয়তো ক্যানসারও হয়ে থাকতে পারে।'

উজ্জ্বল আলোয় ভরা ঘরখানায় কোথাও কোন ময়লা নেই। ডাক্তার সেন নিজেও স্পটলেস সাদা হাফ শার্ট গায়ে দিয়েছেন। ঝকঝকে সাদা দাঁতে হেসে বললেন, 'এখুনি ফাইনাল কিছু বলছি না। আশা করি—আমাদের আশঙ্কাটাই ভুল। এখানে আমার ডাক্তারি শাস্ত্র মিথ্যে প্রমাণিত হলে আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হবে না। ইন্স্টিটিউটে একবার ওঁকে নিয়ে যেতে হবে।'

কাঁচের সাইড গ্লাস দিয়ে এক সঙ্গে দু'জনেই দেখতে পেল—রজনী দোতলা আর একতলার মাঝামাঝি সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। নেমে আসবে। মুখে কোথাও কোন দাগ নেই। একজন বিখ্যাত সম্পন্ন ডাক্তারের বাড়ির চওড়া সিঁড়িতে একটি কঠিন ব্যক্তিত্ব রজনী 'নাম নিয়ে একা একা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে চলে আসছে।

—'আমি যদি পরে কথা বলি ডাক্তারবাবু—'

—'নিশ্চয়। পরেই তো বলবেন।'

দু'জনে একই সঙ্গে মেঝেতে সিঁড়ির মোড়ে এসে দাঁড়ালো। তারপর ডাক্তার সেন ওদের দু'জনকে দরজা অব্দি এগিয়ে দিলেন।

গাড়িতে উঠেই অমিয় বলল, 'হাউজে চল।'

—'এই! তুমি চলে এলে যে বড়! আজ না বাড়িতে সন্ধ্যেটা রেস্ট নেবে বলেছিলে! আমি এখানে আছি—খবর পেলে কোত্থেকে?'

—'শরীরটা ভালো লাগছিল না। ভাবলাম। যাই—ডাক্তার সেনকে দেখিয়ে আসি। এসে দেখি তুমি এসে গ্যাছো। ভালোই হল।'

—'তোমার কি ব্লাড ক্লোরোস্টাল কমেছে? অমিয় তোমায় কি বললেন ডাক্তারবাবু?'

—'কমে নি। বাড়েও নি রজনী।'

—'আমি ভাবছি এ ডাক্তার আমি পাল্টাবো। কোন ওষুধ দিলেন না। শুধু রেস্ট নিতে বলছেন। অথচ আমার গলার স্বর উঠছেই না। তবু বিনা ওষুধে থাকতে বলছেন। আর শুধু রেস্ট।'

—'তাই নাও না রজনী।'

—'তুমিও বলছো। আমরা এক সঙ্গে কত আশা করে সুজাতা নামিয়েছিলাম। আমরাই আবার গোটাচ্ছি।' রজনী কাছে এসে অমিয়র কাঁধে হাত রাখলো। 'জানো। একটু আগে ডাক্তার সেনের মিউজিয়মে দেখলাম—কাচের জারের ভেতর মানুষের হৃদয় ভাসছে। অ্যাসিডে। জারের মুখ বন্ধ। অবিকৃত হৃদয় অ্যাসিডে লেবুর আচারের আস্ত লেবু হয়ে ভাসছে।'

এখানে একদম চুপ করে গেল রজনী। লালুর হাতের স্টিয়ারিং এবার পাক খেয়ে গাড়িকে মির্জাপুর স্ট্রীটে নিয়ে ফেলবে। রজনী আচমকাই অমিয়র হাঁটুতে গোড়ায় হাত—তারপর মুখ রেখে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

অমিয় মাথায় হাত রেখে বলল, 'কী হল? এই ভাখো।' অমিয় অবাক

হয়েছে। রজনী কোনদিন এরকম করে নি। ডাক্তার সেনের কথায় সে ভেতর থেকে কেঁপে গ্যাছে। আস্তে বলল, 'উঠে বোসো।'

রজনী ড্রাইভারের সিটে লালুর বসে চালানো বেমালুম ভুলে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। 'আমার গলা ঠিক হয়ে যাবে দেখো। থিয়েটার থেকে আমাকে বাদ দিও না অমিয়। আমি রেস্ট চাই না।'

মুখে অবশ্য অমিয় বলল, 'পাগল! কে তোমায় বাদ দিচ্ছে? তোমার জোরেই আমরা টিকে আছি রজনী।'

নিজের কানেই নিজের গলা বিশেষ জোরালো শোনালো না অমিয়র। কিন্তু কথাটা সত্যি। সেদিন রজনী দত্ত নিজে এগিয়ে এসে সুজাতার রোল না নিলে পঞ্চমুখ আজ কোথায়! ফেরিওয়ালার মৃত্যুর ওপর কি পুরোপুরি ভরসা করা যেত? কিন্তু এও তো সত্যি—ডাক্তার সেনের কথা সত্যি হলে রজনীকে সরে যেতেই হবে। তখন আগাম পথ্য হবে—রেস্ট। পূর্ণ বিশ্রাম। নিজের ভেতরটা ঠিক না করতে পেরে অমিয় বলল, 'শনিবার ইভিনিং থেকেই তো তুমি আবার সুজাতা করছো। রবিবার ডবল শো তুমিই করবে। তুমি থাকলে সিওর হাউস ফুল। এখন আমাদের অনেক টাকা চাই রজনী। সামনেই সম্রাট।'

হাউজে পৌঁছতে চণ্ডীদা ওদের দু' জনকেই দু'পেয়ালা চা ধরিয়ে দিল। আজ কোন কাজ রাখে নি অমিয়। অল ওয়ার্ক অ্যাণ্ড নো প্লে—মেকস্ জ্যাক এ ডাল বয়।

উইক ডে-তে কোন রিহার্সেল না থাকলে হাউজ একদম নিস্তব্ধ। সাজঘরে বিভিন্ন সিনের পোশাক আলাদা আলাদা র‍্যাকে ঝুলছে। বাইরের উঠোন মত চাতালের সম্রাটের সেট তৈরির কাজ চলেছে ক'দিন ধরে। কাঠের মিস্ত্রীরা সারাদিন কাজ করে র‍্যাঁদায় ঘষা কাঠের চোকলাগুলো এক কোণে জমা করে রেখে চলে গেছে। সম্রাটের সিংহাসনখানায় সবে রুপোলী রং চড়েছে। রং শুকিয়ে তা এখন ঝকঝক করছে। অন্যমনস্ক রজনী তাতে বসে ছিল। সাজা পানের খিলি খুলে জরদা ঢালতে যাবে রজনী—এমন সময় অমিয় সোজা উঠে এসে তার হাত চেপে ধরলো। জরদাগুলো খেয়েই গলার এমন অবস্থা করেছো। ফেলে দাও।'

রজনী চোখ তুলে তাকালো। অমিয়র হাত থেকে পানসুদ্ধ নিজের হাতখানা ছাড়ানোর চেষ্টা না করেই আস্তে বলল, 'এই শেষ পানটা খেতে দাও।'

অমিয়র মনে পড়লো, সম্রাট নাটকে এভাবেই সম্রাটের আদেশে রাণীর রোলে রজনীর বিষ পানের কথা। মধুর মৃত্যুর আদেশ। কিন্তু রজনীর সে গলা কোথায়! যেখান থেকে টপ্পার দানা ফোয়ারা হয়ে উঁচুতে উঠে ঝরে পড়তো।

চণ্ডীও এগিয়ে এল, 'না দিদি—অমন খাবলা খাবলা জরদা গিলে গলার আর বারোটা বাজিয়ো না।

অমিয় বলল, 'চণ্ডীদা। তুমি কাল চিঠি পাঠাবে সবাইকে। যারা যারা সুজাতার রোলে রিহার্সেল দিয়ে গেছে—সবাইকে।

—'তাহলে তো এক গুষ্টি মেয়ে আসবে। বাছাই করবে কি করে?'

—'সে ভাবনা আমার। নন্দনাকেও একখানা চিঠি দিও।'

—'সে তো এখন রাজরাণী। চিঠি পড়ে হাসবে অমিয়। তার বাড়ি উঠছে শুনি সল্ট লেকে।'

—'তবু ডেকে ছাখো না। হয়তো আসতে পারে। পঙ্কমুখের সুজাতা নাটকই তার নামডাকের স্প্রিং বোর্ড। পুরনো কৃতজ্ঞতা সাকসেসের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পায় মানুষ। রজনী এসব কথা ভালো বুঝবে। ক্লাসিক থিয়েটারের অমর দত্ত যখন ইনসলভেন্সির লজ্জায় কালো মুখ লুকিয়ে বসেছিল—তখন কিন্তু স্টারের পয়লা নম্বর স্টার তারাসুন্দরী আবার ক্লাসিককে বাঁচাতে ফিরে আসতে চেয়েছিল।'

রজনী জানে নন্দনার জন্যে অমিয়র আলাদা করে কোন উইকনেস নেই। অমিয় নাটকের ইতিহাস, থিয়েটারের অতীতে তার শক্তির কয়লা খুঁজে পায়। এই মানুষটিকে সে যত দেখছে—ততই তার আগেকার ভাবনা চিন্তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ফি-বার আগের ছবির চেয়ে বড় হয়ে ওঠে অমিয়।

—'তাহলে তো শংকরকেও চিঠি দিতে হয় অমিয়। ও ফিরে এসে ওর আগেকার বোল নিক। আমি পারছি না।'

—'না চণ্ডীদা। সেকথা নয়। রজনীর বিশ্রাম চাই! অনেক খেটেছে। এখন কিছুদিন ওকে আমাদের রেস্ট দিতে হবে। সে জন্যেই সুজাতা রোলের সবাইকে ডেকে দেখা। যে আসে আসবে। যে খাপ খাবে—তাকে নেওয়া। চালু নাটক পাল্টানোর জন্যে তো নন্দনা যায় নি। নিজের ভাগ্য ফেরাতেই নন্দনা গেছে। শংকরের যাওয়া অন্য রকম।'

বলতে বলতে অমিয় থেমে গেল। শংকরের নাম পর্যন্ত আজকাল মুখে আনে না। কি আশ্চর্য।

রজনী মুখ খুললো, 'শংকরও তো ভাগ্য ফেরাতে গেছে অমিয়।'

—'শংকর গেছে ভয় পেয়ে। যদি সম্রাট না চলে। তাই—'

—'কি তাই?'

—'আরও একটা কথা ভেবে দেখো রজনী। শংকর আমাদের কাছে নন্দনা

কিংবা অন্ত আর পাঁচজনের মত তো ছিল না। সে যে আরও অনেক কিছু ছিল। তার যাওয়া যেমন কঠিন। তার ফেরাও কঠিন।'

রজনী ছোট করে একটা মরা হাসি হাসলো। 'কে ফিরছে তোমার এই শাসনে!'

—'আদরও তো কম পায় নি শংকর? বিশ্বাস?: ভালবাসার কথা বাদই দিলাম রজনী। একটা পান খেতে বাদ সেধেছি বলে আমায় অত কঠিন কথা বোলো না। অত কঠিন করেও হেসো না।'

—'তুমিই তো কঠিন কঠিন কথা বলছো।' কী মনে পড়তে চুপ কবে গেল রজনী। তারপর নিজেই প্রায় জেগে উঠে বলল, 'অমর দত্তর কথা বলতে গিয়ে বড়বাবু তাঁকে বাংলা থিয়েটারের নেপোলিয়ান বলেছিলেন। মায়ের মুখে শুনেছি। তা একটা কথা বলি অমিয়। ভালো করে ভেবেচিন্তে আমার মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে জবাব দেবে কিন্তু।'

অমিয় চণ্ডীদার সামনে অস্বস্তিতে ভুগছিল। রজনী আজ ডাক্তার সেনের ওখান থেকে ফিরে সব আড়াল—সব ঢাকনা তুলে দেখতে চাইছে কেন? একই সঙ্গে ওর গলায় রহস্য—আবার তরলের ছিটে লেগে আছে। অমিয় চোখ তুলে তাকাতে পারলো না।

—'অমর দত্তর কথা তুললে তাই বলছি অমিয়। কে তোমাব তারাসুন্দরী? কে তোমার কুসুমকুমারী?

—'ভুলে যেও না রজনী—আমরা টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শেষ দিকে চলে এসেছি। অমর দত্তর সে-সব দিন কিংবা কাল কবে কেটে গেছে। এখন পিওর অ্যাণ্ড সিম্পিল প্রফেশনাল ব্যাপার।'

—'তুমিই তো তারাসুন্দরীর কথা তুললে। বাঃ! এখন পিছোলে চলবে কেন অমিয়?'

-'আমি অর্ডিনারি অমিয়বাঁড়ুজ্যে। ক্ল্যাসিক বলতে বাংলা থিয়েটারের যেটুকু তলানি এখনো পড়ে আছে—সে হল গিয়ে রজনী দত্ত। সে তো আমার চোখে শুধু অভিনেত্রী নয়। সে একটা সময়।'

—'ওসব কথায় আর ভুলছি নে অমিয়। কথা পেড়ে ফেলে ফেরত নিও না। সবকালেই তারাসুন্দরী থাকে। কুসুমকুমারী থাকে। অমর দত্তর বউ হেমনলিনীও থাকে। তোমায় না বলেছিলাম—আমার খুব ছোটবেলায় আমার মা নীহারের কাছে একজন বুড়ো মত লোক এসেছিল। অনেক দিন পরে বড় হয়ে মাকে সে

লোকটির কথা মনে করিয়ে দিতে মা অবাক হয়েছিলেন খুব। বলেছিলেন—তোর মনে আছে রজনী ? তখন তো তুই খুব ছোট। উনি তোর দাদু। আমার বাবা। পরে ভেবে ভেবে বুঝেছি—আমার মা নীহার কোন্ পাঁক থেকে উঠে এসেছিলেন। বড়বাবুর ভাই নীহারকে বিয়ে করে কোন্ পাঁক থেকে তুলে এসেছিলেন। আমার বাবার কাছে আমি এ জন্যে কৃতজ্ঞ অমিয়।' এখানে পৌঁছে রজনীর গলা বুজে এল। 'তুমি আমায় সম্রাট থেকে বাদ দিও না। আমি এখনো সুজাতার রোল পারবো।'

—'একশো বার পারবে। আমি তোমার ভালোর জন্যেই তোমাকে বিশ্রাম নিতে বলছিলাম।' বলেই অমিয় নিজেকে সাবধান করে ফেললো। রজনী কি তার সম্পর্কে ডাক্তার সেনের সন্দেহটা টের পেয়ে গেছে ? মুখে বলল, 'আমি খুব আনলাকি রজনী। যার জন্যে যা ভাবি-সে তা বোঝে না। কারও ভালো করতে পারি নি কোনদিন।'

—'দোহাই তোমার। আমার ভালো করতে গিয়ে থিয়েটার থেকে আমাকে ছুটি দিও না।'

—'ছুটি কোথায় ! কিছুদিনের রেস্ট শুধু। শংকরকে কবির রোলে নামাবো ভেবেছিলাম সম্রাটে। দারুণ খুলতো। কিন্তু ফল দাঁড়ালো উল্টো। সে আরেক নৌকোয় গিয়ে চড়ে বসলো। কারও ভালো করা যে কি কঠিন। চণ্ডীদা। শংকরের আর কোন খবর জানো।'

—'শশাঙ্ক দত্ত যাত্রায় নিয়ে গেছে। তাই তো শুনছি। আমাদেরই শশাঙ্কবাবুর কাণ্ড !'

রজনী বলল, 'বাজারের হাওয়ার খবর শুনে তো আমি তাজ্জব। এত টাকা পায় কোত্থেকে শশাঙ্ক ? জাল সুজাতাকে এক নম্বর ·াতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাই না শংকরকে নিয়ে এত পাবলিসিটি।'

অমিয় বলল, 'বিষ্ণুর কথা তো। অত জোর দিচ্ছ কেন ? অন্য শশাঙ্ক দত্ত হতে পারে। একই নামে কত লোক।'

রজনী বলল, 'না অমিয়। আমার মন বলছে -এ আমারই খোকাখুকির বাবা। যেখানে আমি একটু উঠবো—সেখানেই ও আমায় টেনে নামাবে। নামাতে চাইবে। সেই কবিয়ালের সময় থেকে দেখে আসছি তো অমিয়। তৃপ্তি বেঁচে থাকতেও তো দেখেছো।'

অমিয় হাওয়া ঘুরিয়ে দিতে গেয়ে উঠলো—

"কেন রং দিলি এ ঢং করে
সাদা কাপড় রাঙিয়ে দিলি পিচকিরি মেরে।"

ফাঁকা সাজঘরে অমিয়র গমগমে গলা বড় বন্যার বড় ঢেউ হয়ে এক দমে হুহু করে বয়ে গেল।

রজনী বলল, 'থামলে কেন? এ তো অমর দত্তের "দোললীলায়" গোপা গেয়েছিল। কুসুমকুমারীর গলা। সঙ্গে ন্যাপা বোসের নাচ। আট মাত্রার ধরতাই। মায়ের মুখে শুনেছি সে গল্প। বড়বাবুও বলতেন। গাও না। বেশ তো গলা তোমার অমিয়।

—'তোমার সামনে আমার গাইতে লজ্জা করে রজনী।'

—'আমি গাইবো? শুনবে?'

—'না। থাক রজনী। গলায় কোন স্ট্রেইন কোরো না।'

—'মোটে একটা তো গান। গাই না—

"তোর কালোবরণ ভালবাসি,
যখন তখন তাই তো আসি,
আড়াল থেকে আড়ে দেখে,
তোর পায়ে পায়ে বেড়াই ঘুরে—এ—এ।"

আচমকা গান থামিয়ে রজনী অনেক দিন পরে কাচ ভাঙা হাসি হাসলো খানিক। 'বুঝলে গো! দোললীলায় গোপার চাপানে গোপ এ-গান দিয়ে উতোর কেটেছিল। ভুলো না অমিয়—আমি নীহার দাসীর ছোট মেয়ে রজনী দাসী! খট্ ভৈরবী—আড়াঠেকা!'

—'জানো রজনী। আমি ক্লাসিকের অমরেন্দ্রনাথের কথা ভুলতে পারি না। আমাদের কবি সুধীন দত্তের ছোটোকাকা অমরেন্দ্রনাথ—'

॥ বাইশ ॥

সম্রাট নামানোর জন্যে সুজাতা চালু রাখতে হচ্ছে। সুজাতা টাকা দেয়। সম্রাট দেবে কিনা—এখনো তা কেউ বলতে পারে না। চণ্ডীর চিঠির জবাবে নন্দনা ছাড়া সবাই এসেছে। সম্রাটের আধখানা সেট পড়েছে। তাতেই সুজাতার রোলে এক-একজনের মহলা দেখছিল অমিয়। ইজিচেয়ারে শুয়ে। পায়ে নাগরা। গায়ে সুতোর ফুল তোলা শাহী আদ্দির পাঞ্জাবি। এখন বাইরে কলকাতার বিকেল। ভেতরে নিওনের আলোয় খালি চেয়ারগুলোই দর্শক সেজে বসে আছে।

অমিয় এখনো রজনীকে বলতে পারেনি—তুমি এবারে জীবনে যা-কিছু আনন্দ করার করে নাও। আর তো ক'দিন।

এভাবে অসম্ভ চলাও যায় না। সে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, কীভাবে খবরটা দেবে রজনীকে। ওকে জানানোর সময় এসে গেছে। গলার স্বর রোজ রোজ যেভাবে হারাচ্ছে রজনী। এই গলা একদিন তাকে নীলদর্পণের গান শুনিয়েছে। শুনিয়েছে নলদময়ন্তীতে দময়ন্তীর গান। অমর দত্তর সঙ্গে ক্লাসিকে একদিন তারাসুন্দরী সে-গান গাইতেন। কুসুমকুমারীকে এনেছিলেন বলে অমর দত্তকে তারাসুন্দরী ছেড়ে গেলেন। যাবার সময় তারাসুন্দরী কুসুমকে বলেছিলেন, 'দেখিস ভাই! রাতে ঘুমের আগে বাবুকে তিন ফোঁটা করে ক্যালিসস খাওয়াতে যেন ভুলিসনি। নয়তো ঘুমের ভেতর মাঝরাতে গোঙাবে কিন্তু!'

কুসুমকুমারী ভুতনাথবাবুর হাতে তৈরি মেয়েমানুষ। সে বাবু সামলাতে জানতো। ভূতনাথ নাকি মাঝরাতে উঠে কুসুমকে কামড়াতে চাইতো। তাইতো তারাসুন্দরীকে বলেছিল কুসুম। বড় ভালো গাইতেন তিনি। আর নাচ? ন্যাপা বোসের সঙ্গে সে কি নাচ আলিবাবায়। মন্মথ রায়ের কাছে শুনেছে অমিয়। অমর দত্তর জীবন নিয়ে নাটক করলে কেমন হয়? বেশ কিছুকাল ধরেই থিয়েটারের জন্যে সর্বস্বপণ এই মানুষটির কথা তার বুকের ভেতর দুম দুম করে হাতুড়ি পিটছে।

দারুণ এক ফাঁদে পড়েছে অমিয়। সম্রাট মঞ্চস্থ করতে গিয়ে সুজাতা চালু রাখতে হচ্ছে। সুজাতার রোলে রজনীকে এখন বিশ্রাম দেওয়া দরকার। কিন্তু সে-

কথা কে বলবে তাকে? কে বলবে—রজনী তোমার দিন ফুরিয়ে এলো। এবার কিছুদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দে থাকো। কোথাও বেড়িয়ে এসো। তোমার ক্যানসার হয়েছে। ডাক্তার সেনের ডায়গোনিসিস তাই।

থিয়েটার থেকে বাদ পড়ে যাবার ভয়ে সেদিন যেভাবে কেঁদে ফেলেছিল রজনী —যেন জীবন থেকেই ওকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে কেউ। আসলে সত্যিই কিন্তু জীবন থেকেও রজনী বাদ পড়ে যাচ্ছে। যাবে। ধীরে ধীরে। অমিয় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়েই দেখতে পাচ্ছিল। নীহারের মেয়ে রজনী দাসী। শশাঙ্ক দত্তর ধর্ম-পত্নী রজনী দত্ত। সন্তু ওরফে সনৎ দত্তর মাতাঠাকুরাণী। বড়বাবুর ছোটো ভাইয়ের মেয়ে রজনী। যার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অব্দি আগাগোড়াই থিয়েটার। সেই রজনী সম্রাটের সম্রাজ্ঞীর রোলই বা ছাড়তে রাজি হবে কেন? এ পঞ্চমুখ তো তারই জোরে আজ এতখানি।

চারদিক গুলিয়ে গেল অমিয়র। এখন যদি লীলা তার পাশে থাক্তো। বেশি কিছু না। রাস্তা সে নিজেই ঠিক করতো। লীলা শুধু সায় দিত। তাতেই সে অনেকখানি জোর পেতো। কিন্তু লীলাও যে কথা বলে না অনেকদিন। তাব দিকে তাকায় না অব্দি। আমার শরীর এখনো খারাপ লীলা। তুমি একটু ভেবে ছাখো—তোমাকে আমার কতখানি দরকার লীলা। আমার মনের জন্যে। তোমাব মন নেই লীলা? অমর দত্ত ভাগ্যবান ছিলেন—তাঁর বউ তাবাসুন্দবী কুসুম-কুমারীদের ভালোবাসতেন। কারণ ওরা যে তার স্বামীকে ভালোবাসতো।

ক'দিন হলো পঞ্চমুখের নাট্যোৎসবের বিজ্ঞাপন পড়েছে কাগজে। ফেরিওয়ালার মৃত্যু, সন্দেশ, সুজাতা, অথ মালতী বৃষভ কথা, সম্রাট। এর ভেতর নতুন নাটক—সম্রাট। উৎসবে ট্রায়াল দিয়ে উতরে গেলে তবে সম্রাটের রেগুলার শো। তাই ভেবে রেখেছে অমিয়। আর তো দিন এসে গেল।

পোর্ট কমিশনারের এক বড় অফিসারের বউ রিহার্সেল দিতে এসেছেন। সখের থিয়েটার করেন। লম্বা চেহারা। বড় বড় চোখ। ফিকে গোঁফ আছে। গলার স্বর গাঢ়। তিরিশ হাজার বার শোনা সুজাতার ডায়ালগ চলছে। গানের জায়গায় এলে রজনী হাতে তাল ধরে মহিলার সুর ঠিক রাখছিল। প্রথম গানটায় শেষ দিকে সমে এসে ঝাঁকুনি আছে। এখানটা শুনতে বড্ড ভালো। মহিলা কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না। মিউজিক হ্যাণ্ড তিনজন। ডুগি তবলা, বেহালা, হার-মোনিয়ম। তারাও ক্লান্ত। রজনী তো বটেই। অমিয় নিজেও টায়ার্ড। কিন্তু মহিলার একদম সামনে কি করে তাকে থামতে বলে। আরও দুটি মেয়ের মহলা বাকি।

দারোয়ান একখানা চিঠি নিয়ে এল। ডাকে এসেছে। রেজিস্টি চিঠি। অমিয় বলল, 'সই করেছো?'

—'হাঁ বাবু।'

—'আমায় একবার দেখালে না? তাইতো বলা ছিল তোমাদের—'

চিঠি পড়ে গুম হয়ে থাকলো অমিয়। গানের সম ঠিক রাখতে রাখতে রজনী সব দেখছিল। একসময় নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ এই অব্দি। আপনি আবার শুক্রবার আসবেন।'

চণ্ডী বলল, 'কোন খারাপ খবর অমিয়?'

—'তেমন খারাপ নয়!' শ্রীরাম ট্রাস্ট উকিলের চিঠি পাঠিয়েছে। চুক্তি ছিল—ভবত হাউসে সুজাতা হবে। চুক্তির বাইরে গিয়ে অন্য নাটক ভরত হাউজে করা চলবে না। তাহলে ইনজাংশন আনা হবে হাইকোর্ট থেকে। শেষে অমিয় বলল, 'আমাদের নাট্যোৎসবের বিজ্ঞাপনটা দেখেছে কাগজে। এই শরীরে আবার উকিল-বাড়ি যেতে হবে।'

—'তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমি যাবো।'

—'না চণ্ডীদা। আমাকেই যেতে হবে। নাটক-পাগল বাঙালীরা এসে একবার দেখুক—গ্রুপ থিয়েটারে কত মজা! মন দিয়ে থিয়েটার করার কোন রাস্তা রাখেনি!'

কাল ছিল 'অথ মালতী বৃষভ কথা।' আজ—সম্রাট। যুগান্তর, আনন্দবাজার, অমৃত, দেশ, স্টেটস্ম্যান, অমৃতবাজার, সন্মার্গ, সাইন অ্যাডভান্স—সর্বত্র ডবল কলম তিরিশ সি এম পাবলিসিটি হয়েছে। বাংলা ডেইলি দুটিতে রিপিট বিজ্ঞাপন। সম্রাটে নাম ভূমিকায়—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্রাজ্ঞীর চরিত্রে রূপ দেবেন—রজনী দেবী।

বেশ কিছুকাল হল—রজনী তার নামের পরে আর দত্ত লিখতে দেয় না কাউকে। আজকাল নামের শেষে দাসী কেউ লেখে না। রেওয়াজ থাকলে রজনীর কোন আপত্তি ছিল না। সে স্বচ্ছন্দে তাহলে লিখতো—রজনী দাসী। সে তো আসলে নীহার দাসীরই মেয়ে।

সাজঘরে ইণ্টারকমে কার সঙ্গে কথা বলছিল অমিয়। ফোনটা নামিয়ে রজনীর দিকে তাকালো। 'কেমন বোধ করছো?'

—'ভালোই। গলাটা একটু যদি স্টেডি হোত।'

—'ভালোই তো লাগছে।'

—'তাহলে কোন ভয় নেই অমিয়। জানো—এতক্ষণ আমি তাকিয়ে তাকিয়ে তোমাকে দেখছিলাম। সম্রাটের সাজে—'

—'একজন খামখেয়ালী, অত্যাচারী সম্রাটের রোলে আমায় বেশ মানিয়েছে। কি বল?'

—'দারুণ দেখাচ্ছে। তোমার কস্টিউম সেন্স এত তীক্ষ্ণ কি বলবো। কোন কিছুই তোমার চোখ এড়ায় না। এখন তোমাকে ঠিক একজনের মত দেখাচ্ছে।'

—'কে রজনী?'

—'আমার বাবার সঙ্গে তোমার বড় মিল। তাঁর একখানা বড় ছবি তোমায় আমি দেখবো। শ্রীরঙ্গমের গ্রীনরুমে অনেক দিন ছিল। খুঁজলে—পেলেও পাওয়া যেতে পারে। আমি তখন খুবই ছোট। বাবা বম্বে গিয়ে রঞ্জিৎ মুভিটোনে সুলতানা রিজিয়া করলেন। আফলাতুন হয়েছিলেন। কী চিহারা। তখনকার একখানা বড় স্টিল শ্রীরঙ্গমের সাজঘরে আমি দেখেছি। ওঁর সঙ্গে তখন পৃথ্বীরাজ কাপুরও ছিলেন। ছিলেন জাগীরদার।'

অমিয় এই পিরিয়ড নাটকের কসটিউম আগাগোড়া গ্রীক ভাবনা থেকে নেয়নি। যদিও,তার মতে, আলেকজেণ্ডার ফিরে গেলেও গ্রীকরা তো এদেশে রাজত্ব করে কয়েক পুরুষে ভারতীয় হয়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবের শতদ্রু বিপাশায় তারা নৌকো ভাসাতো। এখন সেসব নদীর ওপর ব্রিজ কাঁপিয়ে ট্রেন যায়। ভারতীয় মশল্লা গ্রীকদের ভীষণ প্রিয় ছিল। এলাচ কথাটা গ্রীক নয়তো? তখনকার আগন্তুক রাজাদের পোশাক হেয়ার স্টাইলের কোন ছবি অমিয় দেখেনি। কিন্তু ড্রেসক্রিপশন, মুরালের কাজ, রমেশ মজুমদারের ইতিহাস বইয়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সে এই নাটকের কসটিউম ভেবে ভেবে খুঁজে পেয়েছে।

একটু পরেই স্টেজে পর্দা উঠবে। পেছনে আগাগোড়া রুপোলি রঙের ব্যাক-গ্রাউণ্ড। তার এক কোণে উঁচুতে রক্ত রঙের গোল সূর্য অস্তাচলের পথে। সব ক'টি দৃশ্যই সায়াহ্নে। সম্রাট সায়াহ্নের নাটক। ড্রপের ওপর থেকে আলো পড়ে ব্যাক-গ্রাউণ্ড সব সময় বিকেলের আলোয় জ্বলতে থাকবে। এর ভেতর স্টেজের মাঝে মাঝে কালো রঙের গথিক থাম। সম্রাট এক থাম থেকে আরেক থামে চলে যাবেন খামখেয়ালী পা ফেলে। গ্রীক জুতোর ফিতে পা জড়িয়ে জড়িয়ে হাঁটু অব্দি উঠে আসবে। মাথার চুল ভ্রূ ঢেকে ফেলবে। চিবুকে এক থাবা কালো কুচকুচে

অবাধ্য দাড়ি। চোখ দু'টি সব সময় ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে সবার ওপর দিয়ে ঘুরে ফিরে যাবে।

সেই মেকআপেই অমিয় রজনীর দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। 'তোমাকে একজন আসল সম্রাজ্ঞী বলে ভুল হয়ে যায় রজনী।'

—ধ্যাৎ! যদি আরও আগে দেখা হোত আমাদের।'

—'এইতো ভালো রজনী। খারাপ তো কিছুই হয়নি। পঞ্চমুখ এক ভাঙাহাট—'

—'ও কথা বলছো কেন অমিয়?'

—'শংকর চলে গেল। লীলা এখন অনেক দূরে। আমার শরীর তো জানো।'

—'তোমার শরীর তো সেরে উঠছে। আমাকে ছাখো তো। ডাক্তার সেন ভালো করে আমায় দেখলেন। অথচ রোগটা কি আজও বলেননি। আমি কি তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি?'

এখানে রজনীর কথা অমিয়র ভেতর অব্দি শিরশির করে কাঁপিয়ে দিল। মনে মনে বলল, মাথা ঘামানোর সময় হঠাৎ আসে।

রজনী তখন বলছিল, 'ক'দিনই তো হাউস ফুল যাচ্ছে। একস্ট্রা চেয়ার দিতে হচ্ছে। তুমি জঙ্গলে গিয়ে থিয়েটার করলেও লোকে টিকিট কাটবে। সেখানেও একস্ট্রা চেয়ার দিতে হবে।'

সেবারে শরীর খারাপ হওয়ার পর থেকে অমিয়কে সারাদিনে অনেকগুলো ট্যাবলেট, ক্যাপসুল খেতে হয়। আজকাল আর সময়ের ঠিক নেই। তাই একসঙ্গে অনেকগুলো মুখে দিয়ে একগ্লাস জল খেল।

তখন ফার্স্ট বেল বাজছে। আর খানিক বাদেই ড্রপ উঠবে।

সম্রাট একদা দেশকে যুদ্ধে জয়ী করেছেন। নদী থেকে খাল কেটে এনে কৃষকের জন্যে জলের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি গুণগ্রাহী, সৎ, নির্ভীক শাসক হিসেবে প্রজা-পুঞ্জের ভালবাসা পেয়ে এসেছেন এতদিন। সেই সম্রাট এখন খামখেয়ালী। গণ-মতকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে তিনি নিজের বিবেচনা মত দেশের ভালো করতে যাওয়ায় সবাই তাঁর ওপর বিরূপ। সবাই এখন তাঁকে ভয় করে চলে। সম্রাটের দৃষ্টিতে মৃত্যুর চিহ্ন। চোখ সদা ব্যাকুল। আদেশে তিনি কঠোর—নিষ্ঠুর। যাকে তাঁর সরিয়ে দেবার দরকার—তাকে তিনি বিষপানের আদেশ দেন। এই তাঁর চরম ভালোবাসা। তাই আদেশ পালন করার সময়েও বলতে হয়—মধুর মৃত্যু।

কবিকে সম্রাট ভালোবাসেন। কিন্তু সম্রাটের আদেশেই কবির পিতাকে ওই মধুর মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কবি বাণভট্ট কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে উত্তীর্ণ। সর্বকালের সম্রাটের কোন নাম নেই। তিনি শুধু সম্রাট। বাণভট্টের কাব্যের গুণগ্রাহী তিনি। বাণভট্টকে তিনি ভালোবাসেন।

প্রধান অমাত্য, শ্রেষ্ঠী সোমদত্ত, রাজনর্তকী—সবাই বাণভট্টকে বলছে, পিতৃ-হন্তা নিষ্ঠুর সম্রাটকে তুমিই এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। তোমার কাছে সে অসতর্ক। তোমাকে সে ভালোবাসে।

স্টেজের উপর উজ্জ্বল রূপোলি আলো ঝলকাচ্ছিল। তার ভেতর সবুজ উত্তরীয় গায়ে দীঘল চোখে বাণভট্ট সোমদত্তকে বললেন, তা হয় না শ্রেষ্ঠী। সম্রাট আমাকে ভালোবাসেন। আমি তাঁর কাছ থেকেই নানা বিষয়ে শিখেছি। তিনিই আমাকে সভ্যতার শিক্ষা দিয়েছেন।

কিন্তু সে তোমার পিতাকে হত্যা করেছে কবি। আমি যাচ্ছি বাণভট্ট। এখুনি এখানে সম্রাট আসবেন।

সম্রাটের প্রবেশ। সঙ্গে সম্রাজ্ঞী যশোধরা।

স্টেজে ঢুকেই অমিয় নির্বিকার চোখে সারা হল দেখে নিল। যাকে বলে প্যাক্‌ড হাউস। পয়লা রোয়ে ডান দিকে কাগজের লোকদের সঙ্গে বিষ্ণু দত্ত বসে আছে।

যাবেন না শ্রেষ্ঠী। দাঁড়ান প্রধান অমাত্য। দেশে নিশ্চয় শান্তি বিরাজ করছে!

শ্রেষ্ঠী সোমদত্ত বললেন, হ্যাঁ। নিশ্চয় সম্রাট। আপনার সুশাসনে অবশ্যই।

একথা বলছেন কেন শ্রেষ্ঠী? আমার শাসন সম্পর্কে আপনার মনে কি কোন সংশয় আছে? যদি থাকে বলুন। দ্বিধা করবেন না কোন। নগরীর জল সরবরাহ আজ সুনিশ্চিত। বন-সম্পদ গো-সম্পদের যথেচ্ছ নিধন আমি বন্ধ করেছি। এবার ভালো বর্ষা হয়েছে। শস্যভূমি সুকর্ষিত। ভালো কথা। আমরা কি দুজন এক সঙ্গে বসে সব কথা বলে নিতে পারি না? সতর্কতার মুখোশ, বর্ম খুলে গেলে যে যার দোষ স্বীকার করতে পারি না? এসো সোমদত্ত। আমি আমার বর্ম মুখোশ খুলে ফেলে অসতর্ক হতে চাই।

সোমদত্ত: আর হয় না সম্রাট। বড় দেরি হয়ে গেছে।

সম্রাট: তাহলে আসুন, শ্রেষ্ঠী। আমরা মুখোশ পরে, গায়ে বর্ম এঁটে দুজনে সতর্ক হয়ে কথা বলি। এখানে অমিয়র গলা কর্কশ হয়ে উঠলো। চোখে তার

ঘাতকের দৃষ্টি। অথচ ব্যাকুল। উদভ্রান্ত। ওহো ভুলেই যাচ্ছিলাম—আপনাদের জন্যে একটা খবর আছে। আপনারা হয়তো জানেন—আজকের দিনটা এক বিশেষ উৎসবের দিন —

প্রধান অমাত্য : কই পঞ্জিকায় তো সে কথা—

সম্রাজ্ঞী যশোধরা : সম্রাটের ইচ্ছায় এই উৎসব। কোন দেবতার ইচ্ছায় নয়। এ জন্য আজ এক কবি সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। সম্রাট আশা করেন—এই সুযোগে আপনারাও আপনাদের কবি প্রতিভার পরিচয় দেবেন।

সোমদত্ত : কিন্তু আমরা তো প্রস্তুত নই।

যশোধরা : প্রচুর পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। তেমনি ব্যবস্থা আছে, তিরস্কারের। অবশ্যই—খুবই হাল্কা।

সম্রাটের ভূমিকায় বিষণ্ণ গলায় অমিয় বলল, আয়োজন সম্পূর্ণ ?

যশোধরা : হ্যাঁ সম্রাট। (সৈনিককে) কবিদের নিয়ে এসো।

এখানে অমিয় পরিষ্কার বুঝলো রজনীর গলা উঁচুতে উঠতেই চাইছে না। আপনা আপনি নেমে যাচ্ছে।

সৈনিক উইংসের পেছন থেকে কবিদের নিয়ে এল। কবিতা হাতে পাঁচজন বিভিন্ন বয়সের কবি। সম্রাট হিসেবে অমিয় তাদের স্বাগত জানালো। কবিদের ভেতর বাণভট্টও রয়েছে। তার হাত খালি। সবাই স্টেজের ডান দিকে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে।

সম্রাট : এঁদের মধ্যে কেউ ?

যশোধরা : না, সম্রাট।

অমিয় সম্রাটের আসনে বসলো। সম্রাট : ক᳐ ᳐র বিষয় : মৃত্যু। চার পঙ্ক্তির রচনা হবে।

প্রধান অমাত্য : বিচারকমণ্ডলীতে কে কে থাকছেন ?

সম্রাট : শুধু আমি। আপনার আপত্তি আছে ?

প্রধান অমাত্য : না না, সম্রাট, ভাবছিলাম আমার কোন দায়িত্ব আছে কিনা!

সম্রাট : আপনার শোনার দায়িত্ব থাকছে।

সোমদেব : সম্রাট, আপনি কবিতা পাঠে অংশ নেবেন না ?

সম্রাট : নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমি হাজার হাজার কবিতা রচনা করে ক্লান্ত!

প্রধান অমাত্য : সেই কবিতাগুচ্ছের কোন সংকলন কি প্রকাশ করেছেন, সম্রাট ?

সম্রাট : প্রয়োজন নেই। চোখ খুলে থাকলেই দেখবেন পাঠ করছি, আর তখন কান খোলা রাখলে শুনতে পাবেন।

এখানে রজনী আশংকায় অমিয়কে দেখলো। ওরা এখন সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী। সম্রাট তাঁকে শক্ত করে জড়িয়ে মুখের দিকে তাকালেন। যশোধরা মুখ সরিয়ে নিলেন।

সম্রাট : আমার মুখটা দেখতে কি তোমার ভালো লাগছে না রাজ্ঞী ?

যশোধরা : আমায় ক্ষমা করো সম্রাট—

সম্রাট : ন্যাকামী করো না। চারপাশে সব ভীতু ভীতু ভাব দেখে ঘেন্না ধরে গেল। মনের কথা মুখে আনতে পারো না। বলতে পারছো না—আমাকে তোমার খারাপ লাগছে।

(যশোধরা মুখ ঘুরিয়ে চোখ মুছলেন)।

যা বলছিলাম জীবনে একমাত্র মৃত্যু নিয়েই আমি কবিতা লিখেছি। আর সেই কবিতা আমাকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিয়েছে।

সোমদেব : এতে আপনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

সম্রাট : যথার্থ ক্ষমতাব অভাব পূরণের জন্যে শিল্পীরা তাঁদের শিল্প সৃষ্টি করেন। শিল্প সৃষ্টির কোন প্রয়োজন আমার নেই। কারণ আমি শিল্পের মধ্যে বাঁচি। এখানে কর্কশ গলায় অমিয় কবিদের বলল, কি হলো ? আপনারা প্রস্তুত ?

কয়েকজন কবি একই সঙ্গে ক্ষীণ গলায় : হ্যাঁ সম্রাট।

সম্রাট : বেশ, এবার শুনুন। কবিতা পড়ার সময় আপনারা একে একে এসে দাঁড়াবেন—তারপর বলবেন—চার পঙ্‌ক্তি। আমি শিস্ দেব। এইভাবে (শিস্ দিয়ে দেখান) আমি শিস্ দিলেই প্রথমজন পডবেন। যদি কবিতার মাঝে শিস্ দিই তবে সঙ্গে সঙ্গে থেমে বসে পডবেন। দ্বিতীয়জন এগিয়ে আসবেন। এইভাবে চলবে যাকে মাঝখানে থামিয়ে দেব না, বুঝতে হবে তিনিই জয়ী। প্রস্তুত হোন (সোম-দেবের কাছে এসে) দেখছেন, প্রতিটি কাজে কত শৃঙ্খলার প্রয়োজন, এমন কি শিল্পেও।

অমিয় শিস্ দিল।

প্রথম কবি :

> "হে মৃত্যু ! হে মহান মৃত্যু
> ঘুমে ঢাকা তব কালো পাখা।"

অমিয় শিস্ দিতে হতভম্ব কবি থেমে গিয়ে নিজের আসনে চলে গেল। দ্বিতীয় কবি এগিয়ে এলে অমিয় আবার শিস্ দিল।

দ্বিতীয় কবি :

"মরণ রে! তুই চুপে চুপে নেমে আসিস,
গুহার গহ্বরে—"

সম্রাট শিস্ দিয়ে উঠলেন। দ্বিতীয় চলে গিয়ে তৃতীয় এল। আবার শিস্।

তৃতীয় কবি :

"এসো মৃত্যু! এসো প্রিয়তম!"

তীব্র শিস্। তৃতীয় চলে গিয়ে চতুর্থ এল। শিস্।

চতুর্থ কবি :

"শৈশবের সেই সোনাভরা দিনে—"

সম্রাট : থামুন। মৃত্যুর সঙ্গে শৈশবের কি সম্পর্ক? সম্পর্ক কি বলুন?

চতুর্থ কবি : সম্রাট আমার রচনার সর্বশেষে—

সম্রাট: চোপ। জন্ম থেকে মৃত্যু নিয়ে রচনা লিখতে বলেছি? ন্যাড়া করে দেব। শিস্। বাণভট্ট এসে দাঁড়ালো। খালি হাত।

সম্রাট : তোমার রচনা?

বাণভট্ট : প্রয়োজন নেই সম্রাট।

অমিয় খুশী হয়ে শিস্ দিল। সারা হাউস স্তব্ধ। দর্শকরা জমাট বেঁধে গেছে। বেশ, শোনা যাক।

বাণভট্ট : সুখের প্রতীক তুমি। তোমার স্পর্শে হৃদয়ের স্নান—
তোমার জ্যোতিই নিশীথ সূর্য—
তুমি বন্য, স্নিগ্ধ—

সম্রাট : থাক। থাক কবি। আর বলো না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। প্রতিযোগিতা শেষ। এই নাও তোমার পুরস্কার। (নিজের গলার রত্নহার বাণভট্টকে পরিয়ে দিতে দিতে) বাণভট্ট! এতো অল্প বয়সে এই ঘনিষ্ঠ রূপ তুমি কিভাবে দেখলে?

বাণভট্ট : সম্রাট। মৃত্যুকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম আমার পিতার মৃত্যুর সময়ে।

সম্রাট : এই যে! আমার সাম্রাজ্যের সব বাছাই করা কবি! আপনারা সবাই অপদার্থ। আপনাদের বন্ধু ভাবতাম। আমার মৃত্যুর পর আপনাদের কেউ আমাকে

নিয়ে কোন মহৎ কাব্য রচনা করতে পারবেন না। উফ! কি অনুর্বর আমার সাম্রাজ্য। যাকগে। উঠুন উঠে দাঁড়ান। সার বেঁধে এখান থেকে চলে যাবেন। আর যাওয়ার সময় আপনাদের পরম গর্বে ওই সব রচনা, যা এতদিন আপনাদের কাব্য সাধনার স্মৃতি বহন করছে, একটার পর একটা ছিঁড়ে খাবেন। নিন। ছিঁড়ুন। খান। (কবিরা একটা পাতা নিয়ে খেতে শুরু করলো) এবার বেরিয়ে যাবেন। বাড়ি পৌঁছোবার আগে সবটা খেতে না পারলে শূলে চড়াবো।

অমিয় শিস্ দিয়ে উঠতেই কবিরা কবিতা চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে গেল। দর্শকরা নাটকের ভেতরকার অর্থ, বাইরেকার ওপর ওপর মানে—সব মিলিয়ে হাসবে কি গম্ভীর হবে—তা বুঝে উঠতেপারছিল না। কেউবা হাসছিল। অনেকেই গম্ভীর হয়ে উঠেছে। না-বুঝে হাততালি দিয়ে ওঠার মত দর্শক পঞ্চমুখের নাট্যোৎসবে টিকিট কাটে নি। অমিয় চায় এমন নাটক—যা দেবার পর দর্শকের মনে অভিনয়, কণ্ঠস্বর, ঘটনা, স্মৃতি হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি অব্দি যাবে। তাকে ভাবাবে। মাতাবে। তাতাবে। নাটকের শেষে ড্রপ পড়ার পর আসল নাটক শুরু হবে দর্শকের মনে। অডিটোরিয়ামে তাকিয়ে অমিয় বুঝতে পারলো, সে জিনিসটাই দর্শকদের মনের ভেতরে আরম্ভ হয়ে গেছে। নয়তো সবাই চিন্তিত কেন? অদৃশ্য চাপে ভেতরটা বুঝে ফেলার যন্ত্রণায় দর্শকদের মুখগুলো ঝুলে পড়েছে। এই তো চেয়েছিল অমিয়। কালই সকালে এ দর্শকরা সম্রাট নাটকের গল্পটা সাজিয়ে বলতে পারবে না। কিন্তু ভেতরটা জেনে যাওয়ার দাগদাগানিতে চোখ পড়ায় তারা সবাই চুপ করে থাকবে।

সম্রাট : এবার আপনারাও বিদায় নিন।

সবাই উঠে দাঁড়ালো। যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে সবাই। এই সুযোগে সোমদেব প্রধান অমাত্যের কাছে এসে সম্রাটের দৃষ্টি এড়িয়ে কথা বলে নিলেন।

সোমদেব : এবার আমাদের সুযোগ অমাত্যদেব!

প্রধান অমাত্য চমকে সোমদেবের দিকে তাকাল। বাণভট্ট যাওয়ার পথে কথাটি পেয়ে আবার সম্রাটের দিকে ফিরে আসে। তাই দেখে সোমদেবের ইঙ্গিতে প্রধান অমাত্য তার সঙ্গে বেরিয়ে যান।

সম্রাট : (বাণভট্টকে কাছে আসতে দেখে বিরক্ত হন) এবার আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

বাণভট্ট : না সম্রাট, আপনাকে আমি কিছু বলছি না। কারণ আমি জানি—আপনি আপনার পথ বেছে নিয়েছেন।

সম্রাট : তবে আর জ্বালাচ্ছ কেন ? যাও !

বাণভট্ট : আপনি যা চাইছেন, পাবেন সম্রাট ! আমি আপনাকে বুঝতে এসেছিলাম, বুঝেছি, এবার আমি চলে যাচ্ছি। এছাড়া আমার পথ নেই। না আপনার, না আমার। অথচ আপনাকে আমি ভালোবেসেছি। আমি দূরে চলে যাব —বহু দূরে—বহু দূরে কোথাও গিয়ে সবকিছুর অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করব। [এক পলক সম্রাটের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে আবার প্রচণ্ড আবেগে বলল] চির বিদায় নিলাম সম্রাট। যখন সবকিছু ফুরিয়ে যাবে, তখনো মনে রাখবেন আমি আপনাকে ভালোবেসেছিলাম।

সম্রাট তাঁর ক্লান্ত হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করলেন। বাণভট্ট পা বাড়িয়েছে। হঠাৎ সম্রাট ক্ষিপ্তের মত সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কয়েক পা যশোধরার দিকে এগোলেন। বেবি মিরর থেকে আলো ঠিকরে এসে তাঁর মুখে পড়লো। ব্যাকগ্রাউণ্ডে আঁকা সায়াহ্নের সূর্য এখন লাল দগদগে। এ অবস্থায় বাণভট্ট থেমে গেল।

বাণভট্ট : সম্রাট ! শেষ পর্যন্ত আপনি আপনার সম্রাটকেই আঁকড়ে থাকলেন।

(বাণভট্ট চলে গেল)

যশোধরা : বাণভট্ট চলে গেল ?

সম্রাট : তুমি বুঝবে না···এসো, আমার কাছে এসো।

[রজনী এগিয়ে এল। এখন তার আর অমিয়র মুখ দু'খানা শুধু ফোকাসের ভেতর। স্টেজের বাকিটা দিকে আলোয় আবৃ.. অডিটোরিয়াম অন্ধকার। শুধু দরজায় দরজায় লাল হরফে একজিট।]

যশোধরা : (অমিয়র কাঁধে হাত রাখলো রজনী)। কি ভাবছো ?

সম্রাট : ভাবছি কতদিন ধরে তোমাকে আমার পাশে পাশে রেখেছি।

যশোধরা : তুমি যে আমায় ভালবাসো সম্রাট।

সম্রাট : ভালোবাসলে তো তোমায় মেরেই ফেলতাম।

যশোধরা : তবে তাই করো। [এখানে অমিয় চমকে গেল। রজনীর গলা থেকে এ কোন স্বর বেরোচ্ছে ? ও কি জেনে গেছে ওর ক্যানসার ? এ তো পুরোপুরি স্বরভঙ্গ। বুকের মাঝখানে তীর বিঁধে গিয়ে এমন স্বর তুলে দেয় গলায়।] তবু তোমার ভালোবাসা নিয়ে মরতে পারব। কিন্তু কেন তুমি মুহূর্তের জন্য স্থির হতে পারো না ? তোমার প্রচণ্ড বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে মুক্তির আনন্দ নিয়ে বাঁচতে পারো না ?

সম্রাট : বোধহয় না। বছরের পর বছর এইভাবে বেঁচে থেকে এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

যশোধরা : এভাবে বেঁচে থাকার অর্থ কোনদিন খুঁজে পাবে? ভালোবাসতে পারবে? সাধারণভাবে? স্বাভাবিকভাবে? পবিত্র হৃদয়ে?

সম্রাট : পবিত্র হৃদয়! মানুষ তার নিজের ধারণায় নিজের হৃদয়কে পবিত্র করে। আর আমার হৃদয় যা কিছু প্রয়োজনীয়—তাকেই শেষ অবধি অনুসরণ করে গেছে, তবু কিছু অপ্রয়োজনীয় কারণই এখন অবধি আমার হাত থেকে তোমার মৃত্যুকে আটকে রেখেছে। [এখানে অমিয় সম্রাট হয়ে গিয়ে হাসলো এতে আমার জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে চূড়ান্ত হবে।

সম্রাট সোজা গিয়ে স্টেজের কোণের বড় আয়নাটা নিজের দিকে ধরলেন। একবার নিজেকে দেখলেন আয়নায়। তারপর গোল করে স্টেজের ফুটলাইটের পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অমিয় কথা বলতে থাকলো। কিরকম বন্যজন্তুর মত লাগতে লাগলো তাকে।

সম্রাট : কি অদ্ভুত! হত্যা করতে না পারলে, নিজেকে কত একা লাগে। আমার লোকেদের কাছে বেঁচে থাকাটাই যথেষ্ট। আর সেই বেঁচে থাকায় আমি আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ি। যখন তুমি আর আরো অনেকে আমার চারপাশ ঘিরে থাকতে—তখন আমার চারধার কত ফাঁকা ছিল। চারপাশের অসীম শূন্যতায় দৃষ্টি কখনো বাধা পেতো না। একমাত্র মৃতের সঙ্গ আমাকে স্বস্তি দেয়।

অমিয় দর্শকদের সামনে এগিয়ে এল। দারার রোলে বড়বাবু এরকম এগিয়ে আসতেন। একদম ফুটলাইটের সামনে। অমিয় একটু সামনের দিকে ঝুঁকে, রজনীর উপস্থিতি ভুলে গিয়ে)

সম্রাট : একমাত্র মৃতেরা সত্য। ওরা আমারই মত। ওরা আজ আমার প্রতীক্ষায় আছে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ওদের অনেকের সঙ্গে সহজভাবে যে কত কথা বললাম—অথচ ওরাই বেঁচে থাকতে আমার কাছে করুণা চেয়েছে—ষ্টিন ওদের একের পর হত্যা করেছি—

(অমিয়র গলার মডুলেশন, কসটিউম, চোখেমুখে বন্য ক্লান্তি, লালচে আলোর ফোকাস—সবকিছু মিলে গিয়ে রজনীর মনে হল—গুলি-খাওয়া একটা বন্য বাইসন মৃত্যুর ঠিক আগে আচমকাই এই স্টেজে ঢুকে পড়েছে। বিরাট, বিশাল, ক্লান্ত, অবসন্ন। অমিয়কে তার ঠিক তাই লাগছে।)

যশোধরা : এসো। আমার কাছে এসো। আমার কোলে মাথা রাখো।

অমিয় রজনীর কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে তার কোলে মাথা রাখলো।

যশোধরা : (মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে) এখন ভালো লাগছে না? বিশ্রাম নাও এখন কত নিস্তব্ধ আমাদের চারপাশ।

সম্রাট : নিস্তব্ধ! বড্ড বাড়িয়ে বলছো দেবী। কান পেতে শোন।

(দূর থেকে কিছু অস্ত্রের ঝনঝনা ভেসে এলো।)

সম্রাট : ওইসব হাজার হাজার ছোট ছোট শব্দগুলো কানে ঢুকছে না? ঘৃণা ক্রমশ মানুষের রূপ নিচ্ছে। (কিছু ফিসফিসানি শোনা গেল।)

যশোধরা : এখানে আসার সাহস কারুর হবে না।

সম্রাট : সাহসী কেউ না এলেও নির্বোধ তো আসতে পারে।

যশোধরা : নির্বোধরা ক্ষমতাহীন হয়। কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা ওদের নেই।

সম্রাট : তবু ওরা হত্যা করতে পারে। কারণ আহত সম্ভ্রমবোধে ওদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ওরা কিন্তু তারা নয়—যাদের সন্তান বা জনককে আমি হত্যা করেছি। তারা আমায় বোঝে। তারা আমার সঙ্গে আছে। আমার মুখের স্বাদ তাদের মুখেও। কিন্তু ওরা—যাদের আমি শুধু বিদ্রূপ করেছি, ঠাট্টা করে মজা পেয়েছি—আজ সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওরা ক্ষিপ্ত—আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই আমার।

যশোধরা : আমবা আছি—আমবা অনেকে আছি তোমার পাশে—তোমায় ভালোবেসে—আমরা তোমায় রক্ষা করবো।

সম্রাট : তোমরাও কমে যাচ্ছো, ক্রমশ—প্রতিদিন। তা র বিসর্জনের বাজনা আমি নিজেই বাজাচ্ছি। আরো একটা ব্যাপার— শুধু নির্বোধরাই আমার বিপক্ষে নয়। কিছু সাহসী আর সুখলোভী মানুষ আজ ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

যশোধরা : না, তারা কেন তোমার মৃত্যু চাইবে? যদি চায়, তোমাকে আঘাত করার আগেই স্বর্গ থেকে বাজ নেমে আসবে তাদের মাথার ওপর।

সম্রাট : স্বর্গ থেকে। ওরে নির্বোধ—স্বর্গ কোথাও নেই। (অমিয় সোজা হয়ে বসলো) কিন্তু কী ব্যাপার—তোমার আবেগ হঠাৎ এতো উথলে উঠলো কেন? এ খেলা তো আমরা কোনদিন খেলিনি।

অমিয় ফুট লাইটের ওপারে প্যাকড হাউজের দিকে তাকিয়ে বুঝলো দর্শকরা এখন জমাট একখানা মানুষের চাঁই হয়ে গেছে।

যশোধরা : (রজনী উঠে দাঁড়ালো। তারপর স্টেজের এক থাম থেকে আরেক থামে যেতে যেতে) বুঝতে পারো না? এতদিন দেখে এসেছি অন্যকে হত্যার,

আনন্দে তুমি মেতে উঠেছো। আজ হঠাৎ শুনছি তোমারও ওই দশা হতে পারে। তোমার নিষ্ঠুর বীভৎস চেহারাটা কতদিন সোহাগে ভালোবাসায় রাঙিয়ে দিতে চেয়েছি—কিন্তু আমার বুকে মাথা রেখেও তুমি প্রেতেদের নিয়ে মনে মনে খেলা করেছো। তোমার ভেতরের মানুষটা ক্রমশ শুকিয়ে প্রেতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি আমিও ক্রমশ তোমার চোখে পুরনো হয়ে যাচ্ছি, আগের উন্মাদনা আর তুমি আমাকে নিয়ে পাও না। আমিও এতেই অভ্যস্ত হয়ে ক্রমশ তুমি আমায় ভালোবাসো কিনা—এই কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু চেয়েছি তুমি শান্ত হও, সুন্দর হও, স্বাভাবিক মানুষ হও। তোমার মধ্যে একটা শিশু আছে যে নানা নতুন নতুন খেলায় মেতে উঠতে চায়। এখনো তোমার সামনে এক দীর্ঘ পথ রয়েছে। বলো, বলো আমাকে, জীবনের চেয়ে বেশি দাম আর তুমি কাকে দিতে চাও।

সম্রাট : তুমি আমাব সঙ্গে অনেকদিন রয়েছো, অনেকদিন।

যশোধরা : আরও অনেকদিন থাকবো তাই না ?

সম্রাট : জানি না। আমি শুধু জানি রাতের পর অনেক রাত তুমি আর আমি থেকেছি। রাতের পর রাত, দুঃসহ আনন্দহীন সব রাতে তুমি আমায় দেখেছো, পেয়েছো। (রজনীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে খেলতে খেলতে) আমার এখন ভরা যৌবন। তবু মনে হয় আমি যেন বৃদ্ধ। অনেক স্মৃতি, অনেকের ভিড় আমায় ভারাক্রান্ত করে বৃদ্ধে পরিণত করেছে। তুমি সব কিছুর সাক্ষী হয়ে আজও আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছো। তুমিও ক্রমশ বুড়িয়ে যাবে।

যশোধরা : তার মানে তুমি চিরদিন আমায় পাশে পাশে রাখবে!

সম্রাট : জানি না। শুধু জানি—এটা খারাপ, ভয়ঙ্কর—যাকে ভালোবাসি সে ক্রমশ বুড়িয়ে যাবে।

রজনী ভয় পেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। কিন্তু সম্রাট এবার আদর করে তার গলা জড়িয়ে নেয়।

সম্রাট : শেষ সাক্ষী রাখাটা কি ভালো?

যশোধরা : জানি না। শুধু জানি—আজ আমি সুখী। কিন্তু আমার সুখ তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারছি না কেন ?

সম্রাট : কে বলে আমি অসুখী ?

যশোধরা : সুখের অসীম দয়া। সুখ রক্তপাত ঘৃণা করে।

সম্রাট : তবে নিশ্চয় দু ধরণের সুখ আছে। আর আমি খুনে সুখটা বেছে

নিয়েছি। তাই আমিও সুখী। এমন এক সময় ছিল যখন ভাবতাম আমি বুঝি যন্ত্রণার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। কিন্তু না, আরও এগোনো যায়। ওই সীমার বাইরে রয়েছে অপার নির্মল আনন্দ। আমাকে ছাখো। (রজনী সম্রাটের দিকে ফিরলো) আমার খুব হাসি পেতো যখন দেখতাম বছরের পর বছর আমার সভাষদরা অত্যন্ত সন্তর্পণে আমার আর রাজনর্তকী মধুমতীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতো। ওরা সবাই ভুল করেছে। আর আমিও তখন বুঝতে পারলাম শুধু প্রেমই আমার কাছে যথেষ্ট নয়। আর ওই কথাটা আজ আবার বুঝতে পারলাম—তোমার দিকে তাকিয়ে। একজনকে ভালোবাসা মানে কি ক্রমশ তার পাশে থেকে থেকে বুড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা! অমন ভালোবাসার মানে বুঝতেই পারি না। মধুমতীকে আমি বিষ পানের আদেশ দেব। মৃত মধুমতীর চেয়ে বুড়ি মধুমতীকে দেখতে কত কুৎসিত লাগবে। ভালোবাসার মানুষকে মৃত্যু এসে হঠাৎ ছিনিয়ে নিলে বেশির ভাগ লোক কত কষ্ট পায়। অথচ ওটা খুব সাময়িক কষ্ট। কারণ কোন শোকই চিরকালের নয়। আর শোক! মানুষের গর্বের একটা খোলাখুলি প্রকাশ মাত্র। দেখলে তো কোন অজুহাত আমি দেখছি না। ভালোবাসা, ঘৃণা, অনুতাপ—কিচ্ছু না। এমনকি আত্মরক্ষার জন্যও কিচ্ছু না। কিন্তু আজ!—আজ আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ। কারণ আজ আমি আমার অনেক স্মৃতি অনেক মোহ থেকে মুক্তি পেয়েছি। (তিক্ত স্বরে অমিয় হেসে উঠলো তখন পরিষ্কার দেখলো বিষ্ণু দত্ত সাড়ে দশ টাকার রোয়ে স্ট্যাচু হয়ে তার দিকে তাকিয়ে) আমি জেনেছি শেষ পর্যন্ত কিছুই থাকে না – কেউ না। এই জানার মানে কি জানো? ইতিহাসে আমরা মাত্র দু-তিনজন চিহ্নিত হবো—যারা এই মুক্তি অর্জন করেছে—এই সুখের স্বাদ পেয়েছে। কি সোহাগিনী! এক অপূর্ব জীবন নাটকের একমাত্র সাক্ষী রইলে তুমি। এইবার তোমার ওপর য[illegible]কা নেমে আসুক।

রজনীর গলা অমিয় দু' হাতে চেপে ধরলো।

যশোধরা : (রজনী প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে) না, অসম্ভব। এই সুখ আমি চাই না। এই ভয়ঙ্কর মুক্তি আমি চাই না।

সম্রাট : (ক্রমশ রজনীর গলা জোরে চাপতে চাপতে) এরই নাম সুখ প্রিয়া। এরই নাম মুক্তি। এই দুর্লভ মুক্তির জন্যে আমিও আজ ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছি। এই মুক্তিকে ঈশ্বরের মত নিঃসঙ্গ এক অপার আনন্দ পাওয়া যায়।

ক্রমশ রজনীর শ্বাসরোধ হতে শুরু করলো। তার মুখে যন্ত্রণার ছাপ। কিন্তু অমিয়কে সে কোন বাধা দিল না। শরীর নুয়ে পড়তে থাকলো, মুঠো আধখোলা। অমিয় রজনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলতে থাকলো।

সম্রাট : আমি বাঁচি, আমি মরি। ধ্বংসের বীজ আমি আমার চারপাশে ছিটিয়ে দিয়েছি। ব্রহ্মা কি আমার চেয়েও শক্তিমান! আমার চেয়েও বেশি সুখ দিতে পারে! সুখ! তুমি সুখ পাচ্ছো না? এই মাধুর্যময় মুক্তিতে তুমি ক্রমশ ঈর্ষা, ঘৃণা রক্তেভরা এই পাপকুণ্ড থেকে ক্রমশ কতদূরে সরে যাচ্ছো। কী অপার আনন্দ। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার কী অপূর্ব প্রকাশ! অ্যাতো ভালোবাসা পৃথিবীতে ধরে না। (হাসিতে অমিয়র মুখ ভরে গেল। সেখানে ওপর থেকে ফোকাস এসে পড়লো) তাই তো তোমার আমার পছন্দের মুক্তি দিচ্ছি।

যশোধরা : (রজনীর গলায় ভয়ঙ্কর কণ্ঠের শব্দ) ওগো ··

সম্রাট : চুপ! কিছু বলে আমায় দুর্বল করে তুলো না। তাড়াতাড়ি আমার কাজ করতে দাও, সময় ফুরিয়ে এসেছে। সময় বড় অল্প সখি। (রজনীর মৃত্যু হল অমিয় সস্নেহে তাঁকে তুলে ভালো করে শুইয়ে দিল। তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। বন্য চোখ তুলে এবারে অমিয় দর্শকদের দিকে তাকালো। তখন তার গলা দিয়ে কর্কশ ধ্বনি ছুটে বেরিয়ে আসছে) তুমিও অপরাধী। কিন্তু হত্যা তো কোন সমাধান নয়। (ঘুরে দাঁড়িয়ে অমিয় স্টেজের কোণের আয়·ায় নিজের ছবিকে ভেংচিয়ে উঠলো) সম্রাট! তুমিও—তুমিও অপরাধী। হয়তো কিছু বেশি বা কম। তবু আজকের এই পৃথিবীতে কে আমায় শাস্তি দেবে? যেখানে কোন বিচারক নেই, কোন সৎলোক। (আয়নার অমিয়র কাছে মুখ নিয়ে অমিয় ভাঙা গলায়·বলে উঠলো) গ্যাখ বন্ধু, গ্যাখো। সবাই তোমায় ফাঁকি দিল। ওই গাঢ় লাল রঙের সূর্যটা ডুবলে যে চাঁদ উঠবে—তাকে আমি পাবো না। কখনো না। কোনদিনও না। সবাইকে চিনে ফেলা কি তিক্ত অভিজ্ঞতা। শেষ মুহূর্ত ক্রমশই এগিয়ে আসছে। ওই শোন অস্ত্রের ঝঙ্কার। নিষ্পাপ লোকেরা অস্ত্র হাতে নিয়েছে—জয় ওদের হবেই। আমি আজ কেন ওদের দলে নেই? ওদের সঙ্গে? আমি ক্রমশ ভীতু হয়ে পড়ছি! কি পরিহাস! মানুষের ভীরুতাকে আজীবন উপহাস করে আজ তাদেরই মত ভীতু আমি। তবু কিছু যায় আসে না। ভয়েরও শেষ আছে। এখুনি অসীম শূন্যে মিলিয়ে গিয়ে সব বোঝাপড়ার বাইরে চলে যাবো — যেখানে আমার হৃদয় চিরশান্তি পাবে।

কয়েক পা পিছিয়ে আবার আয়নার দিকে ফিরলো অমিয়। দর্শকরা আয়নায় তার ছবি সিটে বসেই দেখতে পাচ্ছে। এবার অমিয়র গলা অনেকটা শান্ত। এবার অনেকটা স্থির গলায় সে বলতে লাগলো।

সম্রাট : তবু সত্যিই কত সাধারণ। যদি আমি চাঁদকে পেতাম। কিংবা যদি

ভালোবাসাই সব হোত। তাহলে হয়তো সবকিছুই বদলে যেত। আমার এই তৃষ্ণা আমি কোথায় মেটাবো? কোন্ মানুষের হৃদয়ে? কোন্ দেবতায় আমার আজকের তৃষ্ণার উপযুক্ত সরোবরের গভীরতা আছে? (হাঁটু গেড়ে বসে ফোঁপাতে লাগলো অমিয়) আমার চাহিদা মেটাতে পারে তেমন কিছু নেই এই পৃথিবীতে, নেই অন্য কোথাও। আর আমিও জানি, তুমিও জানো (অমিয় ফুঁপিয়ে দু'হাত আয়নায় তার নিজের ছবির দিকে বাড়িয়ে ধরলো) সমস্তই আমি চেয়েছি অসম্ভবকে পাওয়ার জন্যে। অসম্ভব! তোমাকে আমি তন্ন তন্ন করে সারা পৃথিবীতে খুঁজেছি। কোথাও না পেয়ে নিজের মনের গোপনে গভীরে খোঁজ করেছি। আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি (এখানে অমিয়র গলা ভরন্ত হলের সিলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে গম গম করতে লাগলো) ছাখো, হাত বাড়িয়েছি—কিন্তু দেখেছি সব সময় তুমি, হ্যাঁ—শুধু তুমি আমায় বাধা দিয়েছো—আর আমি এসেছি আজ তোমাকে ঘৃণা জানাতে। আমি একটা ভুল পথ বেছে নিয়েছিলাম—এমন এক পথ। যা আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে না। আমার মুক্তি তাও তো যথার্থ না ... ... কিছুই না, এখনও কিছু না। উফ্! এই অন্ধকার কী ভীষণ। সখা তো এলো না। আমরা যে চিরদিনের মত দোষী হয়ে যাবো। (অমিয় মাইকের আওতায় এসে সশব্দে নিঃশ্বাস নিল) সব মানুষের দুঃখে আজ বাতাস কত ভারী। খুব কাছাকাছি অস্ত্রের আওয়াজ। সঙ্গে মৃদু গুঞ্জন। অমিয় উঠে একটা টুল নিয়ে এসে আয়নার সামনে রাখলো। হাঁপাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ টুলটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড চীৎকারে আয়নার দিকে ছুঁড়ে দিল।

সম্রাট: সম্রাট! আমার সম্রাট! তুমি ইতিহাসে আশ্রিত হও।

টুলের আঘাতে আয়নার কাচ ভেঙে পড়লো। অমিয় কথাটা বলেই পেছন ফিরে কয়েক পা এগিয়ে গেল। দর্শকরা দেখলো, ভাঙা আয়নার ভেতর দিয়ে ষড়-যন্ত্রীরা একে একে স্টেজে ঢুকছে। অমিয় পদশব্দে সচেতন হয়ে ওদের দিকে ফিরে ওদের দেখেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। পাগলের হাসি।

ওরা এগিয়ে এসে একের পর এক আঘাত করতে শুরু করলো। প্রথমে শ্রেষ্ঠী সোমদেব—তারপর কবি বাণভট্ট। ওদের আঘাতে অমিয়র অট্টহাসি থেমে গেল। সে স্টেজের ধুলোতেই লুটিয়ে পড়লো। মুখ দিয়ে জন্তুর আওয়াজ বেরিয়ে এল।

তখনো প্রধান অমাত্য পাগলের মত আঘাত করে চলেছেন। অমিয় নড়ে উঠলো।

স্টেজে হঠাৎ সবাই যে যেখানে ছিল, যেমন ছিল—সে অবস্থাতেই জমাট হয়ে থেমে গেল। শুধু অমিয় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। মুখে, বুকে, পোশাকে—রক্ত। প্রথমে সে বিড়বিড় করে কি বলল। তারপর স্পষ্ট শোনা গেল—

সম্রাট : আমি এখনো বেঁচে আছি।

ওই অবস্থাতেও অমিয়র মুখে মৃদু হাসি।

দর্শকদের তখনো ঝিম্ ভাঙেনি। মঞ্চের সবখানি অন্ধকার। শুধু ফোকাসের ভেতর ওই অবস্থায় অমিয়র মুখের মৃদু হাসি পুরো সিনটাকে ধরে রেখেছে। রজনী স্টেজের অন্ধকারে মৃতদেহ হয়ে পড়ে থাকতে থাকতেই বুঝতে পারছিল—এখুনি পাবলিক হাততালিতে ভরত হাউজ ফাটিয়ে ফেলবে।

কিন্তু—

কিন্তু তার বদলে অন্য কাণ্ড ঘটলো। দর্শকরা তখনো বুঝতে পারেনি। কেউ ভাবতেও পারেনি।

করিডোরের পয়লা দরজা দিয়ে হইহই করে কারা ঢুকে পড়লো। অমিয় কিছু ভাববার সময়ই পেল না। অন্ধকারে কি এসে পড়ল ব্যাকগ্রাউণ্ডের রূপোলি সায়াহ্ন আঁকা পর্দার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তা ছিঁড়ে দিল। চণ্ডী বুদ্ধি করে উইংসের পাশের মেন সুইচ টিপে সারা হল আলো করে ফেললো। টিকিট কেটে দেখতে আসা পাবলিক এতক্ষণ অন্য জগতে ছিল। তাদের ঘোর তখনো কাটেনি। রজনী উঠে দাঁড়িয়েছে। একখানা আধলা ইট তার পায়ের সামনে এসে পড়লো। ঠিক তখনি অমিয় তাকে টেনে ডানদিকের উইংসের আড়ালে সরিয়ে দিল। তখন আরেকখানা ইট এসে পড়ল স্টেজে।

তিনটে লোক লাফিয়ে স্টেজে উঠে পড়েছে। প্রথমেই তারা লাথি দিয়ে কালো রঙের কাঠের চারটে থাম ফেলে দিল। কাঠের থাম কাঠের স্টেজে পড়ে বাজ পড়ার আওয়াজ করে উঠলো। তাতে দর্শকরা ভয়ে ভড়কে গিয়ে যে যেদিকে পারে ছুটলো। কয়েকজন ধাক্কা ধাক্কিতে আছাড় খেয়ে পড়েছে। একখানা ইট এসে বেবি মিররটা ঝনাৎ করে ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো অমিয়র চোখের সামনে। তবু অমিয় স্টেজ থেকে নড়লো না। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে রজনী কাঁদছে। 'চলে এসো। চলে এসো অমিয়। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

—'না।'

ততক্ষণে স্টেজ থেকে নেমে সেই তিনজন গুণ্ডা চেহারার লোক উৎসবের সাজে সাজানো স্টেজের দু'পাশের চাঁদমালা ছিঁড়ছে। বাকি দশবারোজন গুণ্ডাক্লাসের

লোক সাড়ে দশটাকার রোয়ের একজন দর্শককে ধরে এলোপাতাড়ি মারছে। অমিয় তাকে চিনতে পারলো। গন্ধর্বর বিষ্ণু দত্ত। সে যেন জোরে চেঁচিয়ে কি আপত্তি করছে। গালাগালিতে বিষ্ণুর গলা শোনা গেল না। খানিকবাদে বিষ্ণু পড়ে গেল। দুই রোয়ের মাঝখানের মেঝেতে।

ওরা যেমন এসেছিল—তেমনি হঠাৎ চলে গেল। অমিয়কে জোর করে উইংসের ভেতর টেনে আনতে গিয়ে আরেকজনকে দেখে রজনী একদম থেমে গেল। সাড়ে সাত টাকায় রোয়ে বাঁ দিকের কোণে বেরোবার দরজার গায়ের সিটে সে বসেছিল। একজন দর্শক। এই লণ্ডভণ্ড ফাঁকা হলে সে এতক্ষণ চুপচাপ বসে সব দেখছিল। টিকিট কেটে দেখতে এসে ফাউ সিনগুলো কেন বাদ যায়—এমন ভাব নিয়েই এতক্ষণ বসে ছিল লোকটা। ফাঁকা হলে। এত গণ্ডগোলে একটুও ঘাবড়ায়নি। সারা হল উজ্জ্বল আলোয় খা খা করছে। এইবার সে উঠে দাঁড়ালো। আস্তে হেঁটে এগজিট লেখা খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দূরের স্টেজ থেকেও রজনী পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে শশাঙ্কর পায়ের কালো পাম্পশু চিক্‌চিক্ করছিল। খুব যত্ন করে ব্রাশ করানো। একদম ভোল পালটানো চেহারা। চেনাই যায় না। রজনী ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো। তখন অমিয় প্রায় সম্রাটের মতই বিড়বিড় করে বলল, 'এ যে হবে আমি জানতাম।'

রজনী চমকে ঘুরে তাকালো। 'কি? কি জানতে অমিয়?'

—'শ্রীরাম ট্রাস্ট ইনজাংসন পায়নি। তবে তার জের যে এতটা হবে তা ভাবিনি।'

সামনের খোলা দরজা দিয়ে ট্রাম রাস্তার গোলমাল হুহু করে হলের ভেতর ঢুকে পড়ছিল। গুণ্ডারা তখন আর কেউ নেই। অমিয়র পায়ে গ্রীক যোদ্ধাদের স্ট্রাপ দেওয়া জুতো। পরনে ঝালর লাগানো সম্রাটের পোশাক। এখন তার দৃষ্টি সত্যিই এলোমেলো।

—'বিষ্ণু যা বলেছিল তা সত্যি অমিয়।'

রজনীর একথা শুনতে পেল না অমিয়। সে তখন চেঁচিয়ে ডাকছে। 'ও চণ্ডীদা। তাড়াতাড়ি সামনের দরজা আটকে দাও। কি হয়েছে দাদা?—বলতে বলতে এখুনি একপাল লোক ঢুকে পড়বে। জবাব দিতে দিতেই দম ফুরিয়ে যাবে। আর শ্যামবাজার থানা চাও তো লাইনে। পি বি এক্‌সে কি বিপুল আছে এখন? সে বেচারাও ভয়ে পালিয়েছে নিশ্চয়!'

প্রধান অমাত্য, বাণভট্ট, সোমদত্ত, রাজনর্তকী মধুমতী, সৈনিকরা—সবাই

এতক্ষণ গ্রীণরুমে যে যেখানে পারে সেঁধিয়ে ছিল। চণ্ডী টিকিট কাউণ্টারের গায়ে সদর দরজা আটকে ফিরে আসতে আসতে তারাও একে একে উদয় হতে লাগলো। প্রথমে সোমদত্ত। সুজাতায় অমিয়র ডাবল করার জন্যে ভদ্রলোককে আনা হয়েছে। এখনো রিহার্সেল ইনকমপ্লিট। অমিয়র আগের ডবল শংকরের পিছু পিছু কল্যাণীর সঙ্গে নীলকমলে চলে যাওয়ায় এই ব্যবস্থা। এখনো সুজাতায় তার পার্ট মুখস্থ হয়নি। ভদ্রলোক তো তখনো কাঁপছেন। তার পেছনে পিনাকী। মুখে তার প্রধান অমাত্যের বার্ধক্যের মেকআপ। ছত্রখান স্টেজে তাকে আরও বুড়ো লাগছে। তাকে এ অবস্থায় দেখে অমিয় প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো। 'দেখছো কি? নিচে নেমে লোকটাকে ধরো না। সেই থেকে মেঝেতে পড়ে আছে।'

—'কে অমিয়?'

রজনীর কথার জবাব দেবার সময় ছিল না অমিয়র। সবাইকে, নিয়ে স্টেজ থেকে নামতে নামতেই বলল, 'আর কে! আমাদের একমেবোনদ্বিতীয়ম্ বিষ্ণু দত্ত! কিংবা পাবলিক! যা ইচ্ছে বলতে পারো।'

রজনীও ছোটো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ফুটলাইটের ভাঙা কাচ সামলে নিচে নেমে এল।

—'বারোয়ারি ঠ্যাঙানিতে একদম সেন্সলেস।' বলতে বলতে অমিয় উপুড় হয়ে পড়ে থাকা বিষ্ণুকে চিৎ করে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে রজনী 'মাগো!' বলে সামনের সিটটা ধরে ফেললো। তারপর টাল রাখবার জন্যে সেখানে বসে পড়লো। অজান্তেই সম্রাজ্ঞীর জরিবসানো শাড়ির আঁচল দাঁতে কামড়ে ধরেছে। তার চোখের কোণে জল এসে দাঁড়ালো।

অমিয় এসব দেখে ধমকে উঠলো। 'ছুটে ফ্রিজ থেকে বরফ নিয়ে এসো। যাও।' অজ্ঞান বিষ্ণু দত্ত তখন চিৎ হয়ে ভরত হাউজের সিলিং দেখছে। মুখে ধুলো মাখানো রক্ত। বাঁ চোখের নিচেটা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। রজনী বরফ আনতে উঠলো।

কিন্তু যাওয়া হল না তার।

চণ্ডীর সবে আটকানো সদরে কে দুম দুম করে ঘুষি মারছে। রজনী ঘুরে দাঁড়ালো। বিষ্ণুকে ছেড়ে অমিয়ও সবার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে।

॥ তেইশ ॥

—'দরজাটা খুলে দাও তো চণ্ডীদা।'

রজনী আপত্তি করলো। 'এখন খুলে কাজ নেই।'

অমিয় দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'খুলে দাও তো চণ্ডীদা। যা থাকে কপালে।' ভাঙা সিটের একটা পায়া হাতে তুলে নিল অমিয়। রজনী পরিষ্কার দেখলো, অমিয় আবার সম্রাট হয়ে গেছে। মুখে সেই বন্য ভাব। চোখ দু'টি ব্যাকুল। মাথার চুলে ভ্রূ ঢাকা পড়ে গেছে। গায়ের কসটিউম তো সম্রাটেরই। বদলাবার সময় পেল কোথায়!

ফাঁকা, লণ্ডভণ্ড হলঘরে পায়ের কাছে একজন অজ্ঞান দর্শকসুদ্ধ ওরা সাত-আট জন শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। রজনী বলল, 'আগে লালবাজারে একটা ফোন করে নিলে পারতে।'

চণ্ডী দরজা খুলতেই বাতাসে ভেসে আসা পাতার মতই নিশ্চিন্ত, খুশী নন্দনা ভেতরে ঢুকে পড়লো। 'অ্যাতো সকাল সকাল দরোয়ান ওদিককার কোলাপসিবল আটকে দিয়েছে? কি ব্যাপার? এ-পথেই ঢুকে পড়তে হল।'

চণ্ডী বলল, 'নন্দনাদি যে। কী মনে করে—এতদিন বাদে?'

—'তোমরা তো আর খোঁজখবর নেবে না। একখানা পোস্টকার্ড ছেড়েই খালাশ! এই যে দাদা।' দূর থেকে অমিয়কে দেখতে পেয়ে নন্দনা হাসতে হাসতে হেঁটে আসতে লাগলো। তখনো অমিয়র পোশাক, মুখের মেকআপ, ব্যাকস্টেজের ভাঙাচোরা দশা ভালো করে চোখে পড়েনি।

নন্দনা বলতে বলতে আসছিল, 'ফুটপাথে আলো নেই। জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা। এই কি তোমাদের নাট্যোৎসব।'

নন্দনা এখন কী যেন এক অপেরার—নাম মনে পড়ল না অমিয়র—মোটা মাইনের হিরোইন। রীতিমত সচ্ছল চেহারা। সময়টা খুঁটিনাটি মনে পড়বার মতোও নয়। অমিয়র সন্দেহ হল। খবর পেয়ে অপেরার হোল-টাইমের গাড়ি ছুটিয়ে আমাদের দুর্দশা দেখতে আসেনি তো নন্দনা?

—'এতদিন পরে? কি মনে করে?'

নন্দনা হাসতে হাসতেই এগিয়ে আসছিল—দু'ধারের চেয়ারের মাঝখান দিয়ে। 'চলে এলাম দাদা। আর বনবাদাড়ে ঘুরতে পারিনে। না বলে চলে গিয়েছিলাম বলে তাড়িয়ে দেবেন না কিন্তু। যেমন বলবেন তেমন শুনবো। পরিমলকে তো জানেন! আমার অবস্থা আপনাদের তো না-জানার কথা নয়।'

রজনী রাস্তার আঁচল দিয়েই চোখ মুছে নিল। ওদের পায়ের কাছে তখনো অজ্ঞান বিষ্ণু দত্ত চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মুখে হানা দেওয়া রক্তে ভরত হলের মেঝের বারোয়ারি পায়ের ধুলো মাখামাখি। সে গন্ধর্ব কাগজের ড্রামা ক্রিটিক। এই নন্দনার ব্লো আপ দিয়েই একবার গন্ধর্বের বিনোদন সংখ্যার কাভার করেছিল বিষ্ণু। সেই পাবলিসিটির জোরে নন্দনার মাসমাইনে এখন—সেরকমই শোনা যায়—ছ'সাত হাজার টাকা। অপেরার হিরোইন তখনো বিষ্ণু দত্তকে দেখতে পায়নি। নন্দনা প্রায় কৈফিয়তের গলাতেই বলে যাচ্ছিল—'সারা চিৎপুর এখন নটসূর্য—নটচন্দ্রে ভরে গেছে। অশোককুমার, দিলীপকুমার তো আকছার! হিরোইন খেতে বসলে রুপোর থালা। হিরোর জন্যেও রুপোর থালা। সাব-হিরোর জন্যে স্টেইনলেস স্টিল। নফরের বেলায় কলাই থালা। এতরকমের গ্রেডেশন--কি বলব দাদা। এক একদিন কান্না পেয়ে যেতো।'

অমিয় সে-কথায় না গিয়ে আস্তে বলল, 'চণ্ডীদা। বিষ্ণুকে ধরো। গ্রীণরুমে নিয়ে গিয়ে আগে তো শুইয়ে দিই। তারপর ডাক্তার ডাকা যাবে।'

—'ওমা! কে করলো এরকম।' বলতে বলতে নন্দনা মেঝেতে বসে পড়ে বিষ্ণুর মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিল। মুখখানা দেখে কান্না চাপতে পারলো না নন্দনা। শাড়ির আঁচল দিয়ে খুব সাবধানে ফুলে ওঠা চোখ নাক মুখের ওপর থেকে ধুলো সরিয়ে দিতে লাগলো।

তা দেখে অনেকদিন পরে অমিয় চারদিকের অন্ধকারের ভেতর কোত্থেকে খানিকটা শান্তির, আনন্দের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ছে দেখতে পেল।

রজনীর কিন্তু একদম ভালো লাগলো না। বিড়বিড় করে বলেই ফেললো, 'যত্ত বাড়াবাড়ি।'

বিষ্ণুকে ধরাধরি করে গ্রীণরুমে আনার পর অমিয় বলল, 'তুমি তো এখন মোটা মাইনের মানুষ নন্দনা। আমাদের এখানে তো তোমায় অত দেওয়া যাবে না।'

—'যা দেবেন তাতেই থেকে যাবো। আমি পরিষ্কার আলো হাওয়ায় স্টেজে উঠতে চাই দাদা।'

—'পরিমল রাজি হবে তো ?'

—'ওর কথা বাদ দিন তো। সল্ট লেকের বাড়িটা মাঝামাঝি হয়ে পড়ে আছে।'

একথা শুনে ভেতরে ভেতরে একজন খুব কেঁপে উঠলো। তার নাম রজনী। সে মনে মনে বলল, এ কি শুনছি। এই দুনিয়ায় একজনের বেশি শশাঙ্ক দত্ত থাকার দরকার নেই। একজনই যথেষ্ট। নন্দনার জন্যে তার মনটা ভারি হয়ে এল।

—'আরও এক মুশকিল দাদা। আপনাদের এখানে বেশ ছিলাম। অপেরায় দেখছি রসিকের অভাব নেই। যে-ই আমায় দেখে সে-ই প্রেমে পড়ে যায়। কি অবস্থা বলুন তো।'

—'কেন। ভালোই তো।'

—'আপনিও ও-কথা বলছেন দাদা।'

—'আমায় আর দাদা বোলো না। এবার আমি একটা প্রেম করে দেখি তোমার সঙ্গে। চুটিয়ে—'

সবাই একসঙ্গে হোহো করে হেসে উঠলো। বিষ্ণু বাদে। তার তখনো জ্ঞান আসেনি। চণ্ডী ডাক্তার আনতে গেছে।

রজনীর গলা একদম অচল। সে কথাটা দেখা গেল রিহার্সেলের সবাই বুঝতে পারছে। পারছে না শুধু রজনী। কিন্তু সে-কথা [illegible]কে বলবে কে ?

শুধু গলা নয়। অ্যাকশনেও অনেক গোলমাল হয়ে গেছে এ ক'মাসে। সুজাতা আগে ছিল দু'ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটের শো। এখন ঢিলেঢালা হয়ে তা তিনঘণ্টা পঁচিশ মিনিটে এসে দাঁড়িয়েছে। বিকেলের শো-তে কোন অসুবিধে নেই। অসুবিধে সন্ধ্যের শোয়ে। লাস্ট ট্রেনের প্যাসেঞ্জাররা অসুবিধায় পড়ে। শীত আর বর্ষার রাতে ট্রাম বাস ফাঁকা হয়ে যায় শোয়ের পর। মেয়েরা তাহলে দেখতে আসবে না।

সুজাতার টিমওয়ার্ক আগে ছিল অঙ্কের মত। কেউ একটা একস্ট্রা ডায়লগ জুড়ে দিলে ভীষণ ধাতানি খেতো অমিয়র কাছে। এ ক'মাসে অমিয় সব দিক দেখতে পারেনি। যে যা পারছে জুড়ে দিচ্ছে সংলাপে। ফলে ডায়লগের শক্ত আঁটুনি ঢিলে হয়ে গিয়ে মনোমত আগেকার এফেক্ট হচ্ছে না। মিউজিকহ্যাণ্ড পারলে একচরণ একস্ট্রা ছড় টেনে নিজের জন্যে আলাদা করে হাততালি পেতে চায়। ঘোর অরাজকতা।

কতদিক সামলাবে অমিয় ? কাকে সামলাবে ?

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে রজনীকে নিয়ে। তৃতীয় অঙ্ক সেকেণ্ড সিনে রজনীর গান এখন—অমিয় ঘড়ি দেখেছে—সাড়ে চার মিনিট নিয়ে নিচ্ছে। আগে নিত আড়াই মিনিট। তাও এখন গাইতে গাইতে হাঁফায়। দমে কুলোয় না।

রজনীকে সে বলতে চায়, ডক্টর সেনের কথা মতো চল রজনী। তুমি এবার রেস্ট নাও। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাকি ক'টা দিন সুখে থাকো। তোমার ঘণ্টা কিন্তু পড়ে গেছে। যে-কোন দিন তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। ও জিনিস অনেক দিন হল জানান দিয়েছে। তোমাকে কিছুই ভেঙে বলা হয়নি। বলতে সাহস হয়নি আমার। শশাঙ্কটা তো মানুষ না। নয়তো তারই তো এসব দেখার কথা। তারই তো বলার কথা রজনীকে।

অথচ এই রজনী আগে স্টেজে ঘুরতো চাবুকের মত। তার অ্যাকশনের দাপটে, গলার মায়ায় ড্রপ পড়ার পরেও অডিয়েন্স খানিকক্ষণ ঝিম মেরে থাকতো। কোন কথা বলতে পারতো না।

শেষের সিনে রজনী আর অমিয় ফ্রি হয়ে যায় সুজাতায়। ড্রপ পড়ার মুখে সরোদে গাঢ় গুণকেলি বেজে ওঠে। তার আগে সুজাতা বলে—আমি সবসময় ভুলতে চাই আমি কে ? আর তুমি সবসময় আমায় মনে করিয়ে দাও— আমি কি ?

এই কে আর কি দর্শকের মনে রজনী একদম গেঁথে দেয়। এই সিনটাও শ্লো হয়ে পড়েছে। তিনবার রিপিট করেও রজনীর অ্যাকশনে, গলায় কোন স্পিড আনতে পারলো না অমিয়। এক কাণ্ডই করে বসলো তখন। বেতের মোড়ায় বসে নন্দনা রজনীর জন্যে সামনের কাচের টেবিলে পানের বাটা রেখে পান সাজছিল। দুপুরবেলাতেও কড়া আলো জ্বালাতে হয়েছে। শিয়ালদার কাছাকাছি এ-পাড়ায় এখনই শীতকালের ঢিলেমি এসে গেছে হাওয়ায়, ট্রামের আওয়াজে, ফেরিওয়ালা-দের ফিরি করে বেড়ানোর হাঁকে।

অমিয় ডাকলো, 'উঠো এসে নন্দনা। তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গলা মিলিয়ে নি। রজনী ততক্ষণ একটু রেস্ট নিক।'

হাতে জাঁতি। তার ভেতরে সুপুরি। সেই অবস্থায় নন্দনা বড় করে তাকালো রজনীর মুখে। এ মুখ সে থিয়েটারে নামার আগে থেকেই জানে। ছোটবেলায় তার স্কুলে ঢোকার মুখে একবার দেওয়ালের পোস্টারে দেখেছিল। তারপর সুজাতা

করতে এসে কাছাকাছি দেখেছে অনেকবার। তখন কখনো এমুখ রজনীর বিশ্রী লেগেছে। আবার সুন্দরও লেগেছে। এক একদিন রজনীর দাপটের অভিনয় তাকে অবশ করে দিত। নন্দনা শুধু তাকিয়ে থাকতো।

আজ কিন্তু সে রজনীর মুখে তাকাতে পারছিল না।

রজনীও কারও দিকে তাকাতে পারলো না। যেন কিছুই হয়নি—এভাবে আস্তে হেঁটে বাঁ দিকের উইংস দিয়ে মিউজিক হ্যাণ্ডদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে গ্রীণরুমে চলে গেল।

অমিয় তখনো ব্যাপারটা বোঝেনি। সে এখন সুজাতা থেকে সম্রাট হতে চায়। যাবার জন্যে সুজাতাকে দরকার। চালু নাটক এক্সপেরিমেণ্টের রসদ জোগায়। কিন্তু চালু নাটকই আবার গ্রুপ থিয়েটারের পথের কাঁটা। তাকে এড়িয়ে এগোয় কার সাধ্য।

নন্দনা দ্বিধাভরে এগিয়ে এসে মাথার ওপরের বড় ফোকাসের গোল আলোর ভেতর দাঁড়ালো। এ রোল সে একশো নাইটের ওপর করে গেছে পঞ্চমুখে। অমিয়র সঙ্গেই। বড় টাকা, বড় হোর্ডিং, বড় করে পেপার পাবলিসিটি পাওয়ার জন্যে সে চলে গিয়েছিল সেবারে। যাবার আরও একটা কারণ ছিল। বোধহয় রজনী। কিন্তু সেই রজনী আর আজকের রজনী তো একদম আলাদা। সে নিজেও তো পালটে গেছে অনেকখানি। এ-ক'মাসে অনেকগুলো ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনেছে। কিনেছে সল্ট লেকের জায়গা। ফাঁকা মাঠে তার আধখানা বাড়ি পড়ে আছে। বাকি আধখানা কোনদিনই শেষ হবে না।

—'নাও শুরু কর নন্দনা। আট তারিখ চাঁপাডাঙায় কলশো।'

—'তুমি কি কলশো নিয়ে চিন্তা করো দাদা?'

—'চিন্তার কিছু নেই কিন্তু ওদিনই তিনমাইল পিছিয়ে তারকেশ্বরের কাছাকাছি পাঠক পাড়ার মাঠে ওদেরও কলশো আছে।'

—'কাদের অমিয়?'

—'আমাদের নীলকমলের—চণ্ডীদা!'

—'একই নাইটে? একই জায়গায়?'

—'কাছাকাছি জায়গায় একই রাতে দুই সুজাতা। পঞ্চমুখ আর নীলকমলের। ও রাতেই পাবলিক বুঝবে—কে জাল প্রতাপচন্দ্র! আর কে আসল!'

—'তাহলে তো অমিয় রজনী দিদির গলাটা ভালো করা দরকার। ডক্টর সেনকে কল দাও।'

—'কল তো অনেক দেওয়া হল চণ্ডীদা। আর এত তাড়াতাড়ি কি গলায় আগেকার সেই স্বর ফিরিয়ে আনা যায়। আমি ভাবছিলাম—'

অমিয় নেমে যেতে চণ্ডী বলল, 'নন্দনাকে দিয়ে করাবো ?'

—'হ্যাঁ। রজনী রেস্ট নিক ক'মাস !'

—'মন্দ বলনি। কিন্তু রজনী কি রাজি হবে।'

—'রাজি হতে হবে চণ্ডীদা। নইলে পাকাপাকি স্বরভঙ্গ হয়ে যাবে। আমাদের নন্দনা তো সুজাতা করেছে অনেকদিন। সম্রাটেও সম্রাজ্ঞী পারবে ও। কি ? পারবে না নন্দনা ?'

—'তুমি দেখিয়ে দিলে আমি সব পারি। কিন্তু দিদি—'

—'ওর কথা ভেবো না। একদম তো বসে থাকবে না। মাঝে মধ্যে সুজাতা করবে। তৈরি থাকলে সম্রাজ্ঞী যশোধরার রোলেও নামবে। পার্ট মুখস্থ ? ওর মতো স্মৃতিশক্তি আমাদের কার আছে ? এখনো তিরিশখানা বাংলা নাটকের গান, সব ক'জনের ডায়ালগ রজনী হুবহু বলবে—গাইবে। শী ইজ এ ফেনো মেনন। চাঁপাডাঙার কলশোয়ে নীলকমলের সঙ্গে তোমাকেই ফাইট দিতে হবে নন্দনা। সুজাতা আসলে হিরোইনের বই। নাম ভূমিকায় আবার অনেকদিন পরে তুমি। শুধু এই কথাটুকু মনে রেখো নন্দনা।'

অমিয়র কথায় অনেকদিন পরে নন্দনা আগেকার সেই অভিনয়ের জেদ, সাহস, আনন্দ খুঁজে পাচ্ছিল। অপেরায় গিয়ে সে এ জিনিসটার স্বাদ পায় নি একবারও। সে ছিল সেখানে অপেরায় একটি দামী আসবাব হয়ে। যে-ফার্নিচারে রং, পালিশ, তোয়াজ দরকার হয়—ঠিক তাই ছিল সে। এখন আবার সে অভিনয়ের জগতে সহজ আটপৌরে হয়ে যেতে পারছে। এখন সে স্বচ্ছন্দ পায়ে অভিনয়ের আঙিনায় ঘুরে বেড়াতে পারবে। যাত্রার পোস্টারে গাঁয়ের মানুষজনকে ভোলানোর জন্যে তার নামের আগে বাংলায় লেখা থাকতো—গ্ল্যামার কুইন ! এই ইংরিজি কথা দুটোর জন্যে সে এতদিন মরমে মরে ছিল। এবার সে আবার সাধারণ হয়ে উঠতে পারবে। কখনো কখনো অর্ডিনারী হওয়া যে কত দরকারী—অপেরার গ্ল্যামার কুইন হিরোইন থাকার পর সে আবার বুঝতে পারছে।

রিহার্সেলের ভেতর এই মাত্র যে নাটকটা হয়ে গেল—তার পরিণাম যে অনেক-দূর গড়াবে তা সবাই বুঝতে পারছিল। চণ্ডী চুপ। অমিয় স্ক্রিপ্টের পাতা ওল্টাচ্ছিল তার আর সুজাতা ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় নেই। সম্রাটের জন্যে ফুয়েল চাই। তাই—ব্যবহারে ব্যবহারে ময়লা ধরে যাওয়া হাতে লেখা সুজাতার স্ক্রিপ্টের পাতার

পর পাতা উল্টে যাচ্ছিল অমিয়। তাড়াতাড়ি। হাতের আঙুল উঠতে চাইছিল না। কোত্থেকে রাজ্যের ক্লান্তি এসে তাকে টেনে নিচ্ছিল ভেতরে। নিজেই অমিয় স্ক্রিপ্টের পাতাখানা বন্ধ করে বলল, 'আজ আর দরকার নেই। কাল কিন্তু ঠিক একটায়। সবাই সময় মত এসো।' বলে অমিয় বাঁ দিকের উইংসে মিলিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে সাজঘরে যাবে। এখন একবার রজনীর মুখোমুখি হওয়া দরকার। ঠিক করলো, আজ রজনীকে সে বলবে—কেন তার ছুটি নেওয়া দরকার। তার অসুখটা কি? গলার অবস্থাই বা কি?

ফ্রিজের পাশের দরজা পেরোলেই রজনীর দেখা পাওয়া যায়। হয়তো ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছে। নয়তো পালঙ্কে। কিংবা আয়নায় বসে চুপ করে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আজকাল এই এক রোগ হয়েছে রজনীর।

অমিয় ফ্রিজের ওখান থেকেই ফিরে দাঁড়ালো। নিজেকে বলল, এখনো রজনীকে বলার সময় হয় নি। তার নিজের শরীর খারাপ। শংকর এখন নীলকমলের। হাতে দু'খানা নাটক। তার ভেতর একখানা কি দাঁড়াবে শেষ অব্দি তা কেউ বলতে পারে না। এই অবস্থায় রজনীকে সত্যি কথা বলে আপসেট করার ঝুঁকি নিতে পারলো না অমিয়।

আবার যখন স্টেজে এসে দাঁড়ালো অমিয়—তখন সেখানে কেউ নেই। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল—লনের গায়ে বাঁধানো বেঞ্চিতে চণ্ডীদা আর নন্দনা। ক্যান্টিন থেকে চা নিচ্ছে কয়েকজন। নাটকের জন্যে কোন ঝুঁকি নেবে না বলে আজও রজনীকে অন্ধকারে রাখতে হয়েছে। সে এখনো জানেই না কেন তার গলা ভেঙেছে। কেন সারছে না। আর ক'দিন পরে হয়তো অসুখটা সারা শরীরে জানান দিতে শুরু করবে।

নিজেকে এবার খুব সেলফিস লাগলো অমিয়র। যেমন তার আজকাল নিজেকে লাগে লীলার সামনে। এজন্যেই কি শংকর চলে গেল?

এই একই অমিয় ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে আসা অমিয়কে বলল, তিষ্ঠ ক্ষণকাল। তুমি অতসব ভেবে কাবু হয়ে পড়লে কোনদিনই আর সম্রাট স্টেজে নামাতে পারবে না। এখন তুমি উকিল বাড়ি যাও। শ্রীরাম ট্রাস্ট ইনজাংসন পায়নি ঠিকই। কিন্তু শো-কজ করবেই। কেন ভরত হলে সম্রাট নাটক চলবে তার কারণ দর্শন। এমন চিঠি কিন্তু আদালত থেকে ওরা বের করবেই।

অমিয়র ইচ্ছে হল—এখনই একবার সোজা স্কুলে গিয়ে লীলার সঙ্গে দেখা করে। টিচার্স রুমে। স্লিপ পাঠাবে ভেতরে। লীলা ছুটে বেরিয়ে এসে তাকে দেখে

অবাক হবে। কিন্তু সে-ইচ্ছেও চাপতে হল অমিয়কে। এখন একনম্বর কাজ—উকিলবাড়ি।

গাড়ির ব্যাকসিটে বসে চলন্ত কলকাতাকে জানলার কাচে পিছলে যেতে দেখতে পাচ্ছিল অমিয়। এবার তার নিজেরও লম্বা ছুটি চাই। উকিলবাড়ি, ইনকামট্যাক্স, মাস গেলে তেয়াত্তর জনের মাইনে। তার ওপর আছে রজনীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডক্টর সেনের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া। ভিজিট। এক্সরে। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে সম্রাট নাটকের কসটিউম, লাইট, মিউজিকহ্যাণ্ড, পাবলিসিটি, রিহার্সেলের খরচ। সম্রাট কি পাবলিক পাবে?

ব্রিজ পেরিয়ে ড্রেসিংরুমে ঢুকলে অমিয় তখন রজনীকে পেলো না। লালু তাকে তখন পঞ্চমুখের গাড়িতে চাপিয়ে গিরিশপার্কের ফ্ল্যাটবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। নীহার দাসীর ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাট। যেখানে রজনী দাসীর আস্তানা।

এ-বাড়ি একদা ছিল সুখের গৃহকোণ। শশাঙ্ক গোড়ায় গোড়ায় বাজাতে যেতো। তখন সন্তু অনেক ছোট। মনোরমা কিংবা সরমা পৃথিবীতে আসেনি। সে-সময় সৌখিন নাটকের দলে অভিনয় করে পার নাইটে পঞ্চাশ টাকা পেত রজনী। মাসে দশ বারোদিন কাজ থাকতো। শুধু বর্ষাকালে কাজ কমে গেলে টানাটানি যেত। তা শশাঙ্ক তখন কোনদিন মুখ কালো করে নি।

কিন্তু সেই শশাঙ্ককে আমি সাড়ে দশটাকার রোয়ের পাশে ভিড়ের ভেতরে দেখলাম কেন?. আমারই দিকে তাকিয়ে ছিল। গোলমালের ভেতর আর কেউ ওকে লক্ষ্য করে নি। শশাঙ্কর মুখে কি হাসি ছিল? চাপা হাসি? না রাগ ছিল চোখে?

আমরা কতকাল আলাদা আলাদা হয়ে ঘুরে মরছি। আমার আজকাল ওকে দেখলে রাগ হয়। ঘেন্না আসে। এই কি ওর প্রতিশোধের ভালোবাসা? না, ভালোবাসার প্রতিশোধ? জীবন এতখানি খরচ হয়ে যাবার পর আমরা দু'জন কোথায় আছি এখন? শশাঙ্ক বাইরে ঘুরে বেড়ায়। পারতপক্ষে আমার সামনে পড়তে চায় না। সেদিনের পর এ-বাড়িতেও ও আর আসে না। কোত্থেকে টাকা পাচ্ছে? এ টাকা এতদিন ওর কোথায় ছিল? আমার জন্যে তো একদিন একটা টাকাও খরচ করে নি। বরং একসঙ্গে থাকার সময় আমি যা হাতে তুলে দিয়েছি—তাই খরচ করেছে শশাঙ্ক। এখন নীলকমলের অমন চাউস পেপার পাবলিসিটির

টাকা আসছে কোত্থেকে ? আমরা দু'জনই খুব আনলাকি। এই বয়সেও কেউ কাউকে জানি না। দেখতে পাই না। দেখা হয় না। কেউ কাউকে পাই নি। আমার যে তোমাকে ঘেন্না করে শশাঙ্ক।

দরজা খুলে দিল মনোরমা।

—'একটু চা করবি মা ?'

—'দিচ্ছি। এত তাড়াতাড়ি চলে এলে মা ? শরীর খারাপ হয় নি তো ?'

—'না। সন্তু কোথায় রে ?'

—'সেই ভোরে বেরিয়েছে। তুমি তখন ঘুমিয়ে ছিলে মা।'

সরমা হয়তো অবেলায় ঘুমোচ্ছে। কিংবা পাশের ফ্ল্যাটে সেই এঁচোড়ে পাকা মেয়েটার সঙ্গে গুলতানি দিচ্ছে।

খানিকবাদে মনোরমা চা হাতে ঘরে ঢুকে দেখলো মা সোফা-কাম-বেডে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকলো না রজনীকে। বিকেলের ফ্যাকাসে রোদ্দুর চোখে এসে পড়তে পারে বলে পশ্চিমের জানালার পর্দা নামিয়ে দিয়ে চা নিয়ে মনোরমা ভেতরে চলে গেল।

রজনীর ঘুম ভাঙালো সন্তু। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। অন্ধকারে ছেলের হন্তদন্ত ছুটোপাটিতে রজনী জেগে গেল। 'এত চেঁচাচ্ছিস কেন ? আলোটা জ্বেলে দে সন্তু।'

আলো জ্বলে উঠতেই রজনী চমকে গেল। 'এ কি চেহারা হয়েছে তোর সন্তু ? খাসনি ? চান করিস নি।'

—'আমার অত কথা বলার সময় নেই মা। বাবা এসেছিল ?'

—'আমি তো জানি না। কেনরে ?'

—'ন্যাকা ? সব জানো তুমি।'

রজনী ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেল। সবে দাড়ি উঠছে সন্তুর। 'নিজের মাকে এ তোর কি কথার ছিরি ?'

—'তোমাদের দু'জনকে আমার ঘেন্না করে। ঘেন্না করে—'

রজনী শান্ত গলায় বলল, 'আমরা তোর কি করেছি ?'

—'কেন এ পৃথিবীতে আনলে আমাকে ? আমাদের ? আমরা তোমাদের কাছে কি দোষ করেছিলাম। দু'জনে দু'জায়গায় দিব্যি দল খুলে বসে আছো। কাগজে ছবি দেখছি। বিজ্ঞাপন দেখছি। আর আমি টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি।'

—'টাকা কি তোমাকে দিই নি আমি ? স্কুলের পরীক্ষাই তো দিলে না তুমি।'

—'পুরনো কথা তুলছো কেন মা? তোমার কাছে ব্যবসার জন্যে টাকা চেয়েছিলাম। তুমি পাঠালে বাবার কাছে। বাবা পাঠালো তোমার কাছে। আমি শুধু মাকুর মত ঘুরে মরছি! আজ বলেছিল আমায় দেবে। কিন্তু ঘরে গিয়ে দেখি বেপাত্তা। লুকিয়ে কোথায় যায় তাই আমি দেখবো। আমার নাম সনৎ দত্ত। গিরীশ পার্কের সস্তা! তার সঙ্গে চালাকি—'

—'তোমার বাবা তোমায় টাকা দেবে বলেছিল?'

—'হ্যাঁ। কেন? তোমার আপত্তি আছে? তাও তো তোমরা একসঙ্গে থাকো না! থাকলে না জানি আরও কতদিক থেকে আমায় বাগড়া দিতে! মাইরি! এমন মা দেখিনি কোথাও। আমার কপাল!'

—'আমারও কপাল বাবা!'

—'তোমায় ডাকছে তুমি যাও না। অমিয়র তো শরীর ভালো নয়। না গেলে চটে যাবে ভীষণ। যাও নন্দনা। রিহার্সেলটা দিয়ে এসো।'

—'না রজনীদি। সম্রাজ্ঞী তোমার রোল। ফার্স্ট নাইট তুমি করেছিলে।'

—'সে তো ফেস্টিভাল নাইট ছিল! বেগুলাব শো করবে তুমি।'

—'তা কেন দিদি। তুমিই তো করবে। তোমায় মানাবে খুব। আসলে মানায় তোমাকেই।'

রজনীর এসব কথা আদৌ বিশ্বাস হচ্ছিল না। আসলে মেয়েটা হয়তো বানিয়ে বানিয়ে তার প্রশংসা করছে। এসব মেয়েকে সে জানে। কেন যে কোন্ মতলবে অপেরার অমন মোটা মাস মাইনে ছেড়ে চলে এল—তা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি রজনী। ভেতরে ভেতরে তার বিরুদ্ধে পঞ্চমুখে কোন্ অজানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। সে তার শুরু বা শেষ কোনোটাই ধরতে পারছে না।

সেদিনকার সেই রিহার্সেলের বিকেলের পর থেকে রজনী অমিয়র দিকে আর সোজাসুজি তাকায়নি। অমিয় তার চোখে চোখ না রেখেই কথা বলছে। রজনী শুধু নিজেকে বলেছে—এ আমি জানতাম। এমনটা যে একদিন হবে তা আমি অনেকদিন আগেই জানি।

অমিয় দু'বার বলবার চেষ্টা করেছে রজনীকে। কথা শুরু করে অন্য কথায় চলে গেছে। কি করে বলবে—তুমি এবার বসে যাও রজনী। তোমার গলা উঠছে না। তোমার বড় চিকিৎসা সামনে। পঞ্চমুখকে বাঁচাতে হলে—নাটকের মুখ চেয়ে—

তোমার বসে পড়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। কিন্তু যার জন্যে পঞ্চমুখ আজ এতখানি—তাকে কি করে ওসব কথা বলবে অমিয়।

রিহার্সেলের জায়গা থেকে উঠে এসে অমিয় এখন সাজঘরের দরজায়। মেকআপ নেওয়ার সারি সারি চেয়ারগুলো ফাঁকা। সিনওয়ারি পোশাকের ডাই হ্যাঙারে ঝুলছে। ইণ্টারকমের টেলিফোনটা অল্প আলোয় ঝাপসা মত।

অমিয়কে দেখে নন্দনা উঠে দাঁড়ালো। রজনী যেমন বসে বসে দর্জিকে কথাটি বোঝাচ্ছিল—তেমনই বসে থাকলো। সেই অবস্থায় বলল, 'আমি তো নন্দনাকে বলছি রিহার্সেল দিতে। তবু যাবে না মেয়েটা স্টেজে।'

অমিয় গম্ভীর গলায় বলল, 'কেন ?'

এবার নন্দনা ফুলে উঠলো। সে কোনদিন এভাবে অমিয়র সামনে কথা বলেনি। আর আশ্চর্য!—আজ তাকে কথা বলতে হচ্ছে কার জন্যে। সেই রজনীর জন্যে। যার উপর রাগে রাগে সে একদিন পঞ্চমুখ ছেড়েই চলে গিয়েছিল। 'কেন বোঝো না দাদা ? এখনকার স্টেজে ওঁকে রিপ্লেস করার মত আমরা কি কেউ আছি ? রজনী দত্ত স্টেজে হেঁটে গেলে সাড়ে দশটাকার রোয়ের দর্শকরা মাথা এগিয়ে দিয়ে বসে। তুমি হেঁটে গেলে তা হবে ? আমি গেলে হবে ?'

—'কে অস্বীকার করেছে নন্দনা ?'

—'তাই তো করা হচ্ছে। ও রেস্ট নেবে কেন ? গলা খারাপ রিহার্সেল দিতে দিতে সেরে যাবে।'

—'না। সারবে না নন্দনা। বরং স্ট্রেইন পড়ে ইনকিওরেবল্ হয়ে উঠবে।'

অমিয়র কণ্ঠস্বরে নিয়তি এসে ভর করলো। দর্জি এতটা বাংলা ইংরেজি বোঝে না। সে অবাক হয়ে দেখলো, ভরত হলের হিরোইনের হাত থেকে কসটিউমের স্যাম্পেল কাপড়ের গোছাটা ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেছে। মাথা নিচু করে দিদিমণি কেঁদে উঠলো।

দর্জি ভয় পেয়ে বলল, 'আমি কাল আসবো দিদি। এখুন আপনারা বাতচিত করুন।'

অমিয় তখনো পুরোপুরি খুলে বলতে রাজি নয়। তাই হালকা করার জন্যে বলল, 'রজনীর গলা সেরেও যেতে পারে। আমরা আবার ওঁর গানের সময় পিন-ড্রপ সায়লেণ্ট অডিয়েন্স পাবো। কিন্তু যতদিন গলা না সারছে – ততদিন কি ওঁর বিশ্রাম দরকার নেই। নিলে ক্ষতিটা কি ? পঞ্চমুখের জন্যে কম তো খাটেনি ও।'

অনেক দিন পরে আবার রজনী অমিয়র চোখে সোজাসুজি তাকালো। 'তার প্রতিদান কেউ চায়নি অমিয়।'

—'তোমার দেনা পঞ্চমুখ কোনদিন শোধ দিতে পারবে না।'

—'শোধবাদের কথা হচ্ছে না। .আমায় থিয়েটার থেকে বাদ দিচ্ছো কেন?'

—'কে বললে বাদ। এ দল তো তোমার রজনী। সত্যি কথা বললে—আমরা তোমার অন্নে পালিত।'

—'লালন পালনের কথা ছাড়ো।' এরপর রজনী তার গলা আর স্বাভাবিক রাখতে পারলো না। কান্না এসে বাকি কথাগুলো ঝাপসা করে দিল।

আজকে শো নেই। এখন বিকেলবেলার গ্রীণরুম। অমিয় আস্তে আস্তে বলল, 'এখনো তোমাকে সব কথা বলার সময় আসেনি রজনী।'

—'সে আমি জানি অমিয়। নয়তো নন্দনাকে চিঠি দিয়ে আনালে কে!'

—'ছিঃ দিদি। চণ্ডীদার চিঠি পেয়েছিলাম আমি। ওখানকার শেকল কাটতে সময় নিল বলে ক'দিন দেরি হল আমার আসতে। ওকথা বলছো কেন দিদি?'

—'রজনীর কথায় রাগ কোরো না নন্দনা। আমরা কেউ রাগ করবো না। এখন ও এরকম দু'চারটে কথা বলবে। আমরা তো আগের রজনীকে জানি।'

এবার রজনী জোরে কথা বলতে গিয়ে এক কাণ্ডই করে বসলো। নন্দনা চমকে উঠলো। অমিয় জানতো তাই চমকালো না। গা ছমছম করানো ঘ্যাসঘেসে গলায় কথাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল রজনীর গলা থেকে। 'দোহাই তোমাদের—আমাকে মহৎ বানিয়ে তাকে তুলে রেখো না। স্টেজের ধুলো না মাখলে আমি শুতে বসতে ঘুমোতে পারি না। আমি কি দোষ করেছি তোমাদের কাছে অমিয়?'

সে কথায় না গিয়ে পঞ্চমুখের স্থায়ী সভাপতি অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ঘোষণার গলায় বলল, 'চাঁপাডাঙাতেই সুজাতার অভিনয় লাস্ট নাইট। শেষ রজনী নন্দনা। তারপর যা হয় হবে—আমরা পাকাপাকি সম্রাটে চলে যাবো। ডুবি ডুববো। ভাসার হোলে ভাসবো।'

—'কেন দাদা?'

—'সুজাতায় এবার দাঁড়ি টানা দরকার।'

রজনী কোন কথা বলল না। চেয়ারে বসেই ঝুঁকে পড়ে মেঝে থেকে স্প্যাম্পেলের কাপড়ের গোছা হাতে তুলে নিল। নিতে নিতে মনে পড়ল, সামনে অনেক কাজ। সম্রাট নাটকে চারজন কবির চার রঙের কসটিউম হবে। চার রঙের

উত্তরীয়। সম্রাটের রোলে অমিয়র মুখে বজ্রদৃষ্টি ফুটিয়ে তুলতে ভ্রূ অব্দি ঢাকা'পড়ে এমন একটা উইগ চাই। আর চাই একখানা বিশাল আয়না। এসব একটু একটু করে তাকে এখন গোছাতে হবে। সে এখন গ্রুপের হিরোইন থেকে মাসিতে প্রোমোশন পেয়েছে যে—। এরপর একদিন নতুন হিরোইনের পানের নেশা থাকলে বাইরে কলশোতে গেলে জরদার কৌটোও গুছিয়ে তুলে নিতে হবে তাকে। এককালের রজনী দত্তকে। কিংবা রজনী দাসীকে। এবার সে নামের শেষে দাসী লিখবে ঠিক করলো।

নন্দনা এক পা এক পা করে দু'জনের দৃষ্টির ভেতর দিয়ে স্টেজে ওঠার সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ালো। এখন ওদের দু'জনকে নিভৃতে থাকতে দেওয়া দরকার। তাই প্রায় এক ছুটে নন্দনা উইংসের পাশে গিয়ে স্টেজে ঢুকে পড়লো।

এই সময় অমিয় কয়েক পা এগিয়ে রজনীব চেয়ারের হাতলে হাত রাখলো। খুব আস্তে নিজের গাল কাৎ করে রজনীর শুকনো সিঁথিতে চেপে ধরলো। রজনী তার নিজের বাঁ হাতখানা আটকে রাখতে পারলো না কিছুতেই। আপনা আপনি উঠে গিয়ে অমিয়ব কনুই, হাতেব ওপর দিয়ে মোলায়েম প্রলেপ হয়ে ওঠা নামা করতে লাগলো।

—'আমি বড় ক্লান্ত রজনী।'

—'জানি। তোমাব সঙ্গে কথা হয় না কতদিন।' বলে মনে হল রজনীর—রঞ্জিৎ মুভিটোনের স্যুটিংয়ের সেট থেকে মেকআপসুদ্ধ তাব বাবা এই মাত্র এসেছেন।

তখন অমিয় বলল, 'বাড়িতেও লীলা যে কতদিন কথা বলে না আমার সঙ্গে। আমি যে কি একা রজনী।'

॥ চব্বিশ ॥

পথে তারকেশ্বর পেরিয়ে পাঠকপাড়ার মাঠে নীলকমলের সুজাতার জন্যে স্টেজ তৈরি হয়েছে চোখে পড়ল পঙ্কমুখের। ওরা যাচ্ছিল চাঁপাডাঙার মোড়ে। উজিয়ে আরও তিন মাইল। এই রাস্তাই চলে গেছে আরামবাগ। সেখান থেকে ঠাকুর আর মায়ের বাড়ির দিকে এই একই রাস্তা। অনেক ঘুরে ঘুরে দু'জায়গায় প্রণাম ঠুকে তবে বাঁকুড়া যাওয়া যায়।

একই গাড়িতে নন্দনা, অমিয় আর রজনী। অনেকদিন পবে তিনজন একসঙ্গে চলেছে সুজাতার শেষ কলশো নাইট আজ চাঁপাডাঙার মোড়ে। অমিয় আগেই বলেছে—সুজাতা অভিনয়ের আজই শেষ রজনী। তাবপর থেকে শুধু সম্রাট।

শোয়ের দেরি ছিল। রজনী বলল, 'চল যাই জয়রামবাটি অব্দি ঘুরে আসি। এখনো তো বেলা দশটাও বাজেনি।'

নন্দনা বলল, 'না দিদি। একটু শুয়ে বসে নেওয়া দরকার কিন্তু। ওদিকে তো আবার শংকর আছে নীলকমলে।'

শংকরের কথা উঠতে অমিয় কিছু বলল না। তাই দেখে নন্দনা আবাব মুখ তুললো। 'বাঁকুড়ার পথে অনেকবার তো দিদি জয়রামবাটিতে নেমেছো। আজ না গেলেই নয়?'

কলকাতা থেকে প্রায় সকাল সকাল ওরা এসে পড়েছে এখানে। রজনী বলল, 'জয়রামবাটি ঘুরে বেলাবেলি এসে ঘুমোলেও চলবে। শো তো সেই রাত আটটায়।'

রজনী আর বলতে পারলো না। গাড়ি চালাচ্ছে লালু। নভেম্বরের মিষ্টি রোদ্দুব। আজকাল লালু গাড়ি সারাতে গিয়ে পয়সার এদিক ওদিক করছে প্রায়ই। রজনী সব বুঝেও আগের মত কড়া হাতে আটকাতে পারছে না কিছুই। লালুর পাশে বসেছে অমিয়। খানিক আগে চাঁপাডাঙার মোড় পেরিয়ে মুণ্ডেশ্বরী নদীর ওপর ব্রিজে উঠে আসার সময় অমিয়র মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উড়ছিল। শোয়ের আগে চণ্ডী জবাকুসুম দিয়ে অমিয়র মাথা আচড়ে দেবে। পাট পাট করে।

আমি জানি সামনের সিটে বসে আমাদের দু'জনের সব কথাই অমিয় এতক্ষণ শুনেছে। কিন্তু একটা কথাও বলল না। এবারে ফিরে এসে নন্দনার ধিঙ্গিপনা যেন আরও বেড়েছে। আমি রজনী পঙ্কমুখের গাড়িতে করে জয়রামবাটি যেতে চাইছি,

—তাতে নন্দনার মত মেয়েও আপত্তি জানাবে? আর অমিয় সব শুনেও চুপ করে থাকবে? অমিয় চুপ করে থেকে নন্দনাকে সাপোর্ট করছে?

আমি তো ওদের যুক্তি এক কথাতেই মেনে নিয়েছি। কোন প্রশ্ন তুলিনি। সম্রাটের রেগুলার শোয়ে সম্রাজ্ঞী যশোধরার রোলে নামবো বলে আমার নাকি এখন গলার রেস্ট দরকার। তাই সুজাতায় ক'নাইট হল নামিনি। আমি তো অমিয়র কথা মেনে নিয়েছি।

আমার সামান্য একটা কথা মেনে নিতে তোমাদের সবার এত আপত্তি? গাড়িতে জয়রামবাটি যাতায়াত তো আরামবাগ থেকে মোটে ঘণ্টা দু'য়েকের মামলা। আজকে চাঁপাডাঙার মোড়ে সুজাতার শেষ রজনীতে নন্দনা হবে সুজাতা। আমি থাকবো গ্রীণরুমে। মিউজিক হ্যাণ্ড, কসটিউম, লাইট, কন্টিনিউটি—সব কিছুই দেখতে হবে আমাকে। আর আমার একটু জয়রামবাটি ঘুরে আসার অধিকার নেই? ক' লিটারই বা তেল পুড়বে?

প্রফুল্ল সেনের সাজানো আরামবাগ গাড়ির জানলায় পিছলে যাচ্ছিল। কাবলের মোড়। বটতলা। ইরিগেশন বাংলো। ধানকল। হাইটেনশন তারের রুপোলি পেল্লাই খুঁটি মাঠের ভেতর দূরে দূরে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রেল লাইনের গায়ে একটা বাতিল ব্রিজের নিচে ক্যালেণ্ডারের ছবির মতই নিস্তব্ধ—গাঢ় সবুজ আলুক্ষেত। চারার সারি মাঠের ভেতর দূর গাঁয়ের দিগন্তে গিয়ে ঠেলে উঠেছে।

অমিয় সেদিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, 'ওখানে আগে নদী ছিল। বোধহয় দামোদর।'

নতুন শীতের আলাদা আমেজ। তার ভেতর পঞ্চমুখের মার্ক থ্রি পিচ রাস্তার ওপর দিয়ে একদম উড়ে যাচ্ছিল। রজনী দেখলো—অমিয়র মাথার পেছনটা—চওড়া কাঁধ তাকে ভীষণভাবে টানছে। এখুনি একবার পেছন থেকে দু'হাতে অমিয়কে জড়িয়ে ধরতে পারলে ভালো হোত। কিন্তু লালু আছে। তার নিজের পাশেই বসে আছে সেই ধিঙ্গি মেয়েটা। তাছাড়া জড়িয়ে ধরার মত সেসব দিনও যে কবে হাতের আঙুল দিয়ে গলে গেছে। এখন তা ভীষণভাবে টের পেল রজনী। তার জয়রামবাটি যাওয়া নিয়ে একটা কথাও কি বলতে পারলো না অমিয়? অথচ লালুর হাতে গাড়ি তো এখন জয়রামবাটির পথেই। ওইতো রাইসমিলের চিমনি দেখা যাচ্ছে। এবার বাঁ দিকে ঘুরে সোজা খানিকটা গেলেই মায়ের দেশ। মন্দিরের পাশে সেই টিউবয়েলটা আছে কি? সারাদিন রাতে যার জল বন্ধ হয় না। সর্বক্ষণ আপনাআপনি জল পড়ছে। সামনে দিঘি। সকাল সন্ধ্যে মাগনা অন্ন প্রসাদ। যে

যাও পাবে। শেষরাতে মন্দিরে মায়ের আরতি। বাঁকুড়ার কোতুলপুরো সঙ্ঘো সঙ্ঘো: কলশো সেরে একবার অমিয় আর রজনী একটা রাত এখানকার গেস্ট হাউসে রেস্ট নিয়েছিল। রাতে প্রসাদ পেয়েছিল।'

সেই ভোর রাতে এসপ্ল্যানেড থেকে স্টার্ট নিয়েছে লালু। কোলাঘাটে চা। তারকেশ্বরে প্যাঁড়া। যেখানেই গাড়ি থামে সেখানেই নন্দনা টুক করে পাফ বুলিয়ে নেয় মুখে। অপেরা ফেরৎ মেয়েটা আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছে। আজকাল জোর দিয়ে কথা বলতেও শিখেছে। নন্দনা এখন তার পুরোপুরি দাম চায়। কারণ সে নাম পেয়েছে। টাকার অঙ্কে দাম না পেলে তার বদলে নন্দনা যে পঞ্চমুখের তরফ থেকে তার পায়ে পুরোপুরি গড় করা সারেণ্ডার চাইবে—স্বীকৃতি চাইবে এটা তো জানা কথাই। থিয়েটারের মেয়ে হয়ে একথা রজনীর চেয়ে কে আর বেশি বুঝবে। নন্দনা এখন ধিঙ্গি খুকী হয়ে হয়তো আবদারও করে বসতে পারে— আমায় নামিয়ে দিয়ে তোমরা জয়রামবাটি ঘুরে এসো। কারণ, নন্দনা জানে— পঞ্চমুখের কলশোয়ে সে এখন মেইন ড্র। আর: ঠিক এখনই এভাবে গলাটা বিট্রে করছে রজনীর। ভাগ্য! ভাগ্য!!

রজনী অবাক হল। কই? নন্দনা তো একটা কথাও বলছে না। বরং ভোরের ধরা ঘুমটা বিউটি স্লিপ দিয়ে পুষিয়ে নিচ্ছে। আচমকাই রজনী বলে উঠলো, 'গাড়ি ঘোরা লালু।'

গাড়ির বাকি তিনজন চমকে তাকালো। তার আগে লালু অবশ্য গাড়ি ডেডস্টপ করে নিয়েছে।

অমিয় ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার?'

নন্দনাও জেগে উঠেছে।

রজনী বলল, 'কেন শীত করছে জানি না। এখন ফিরে গিয়ে বরং গরম জলে চান করব। ফিরে চল লালু।'

অমিয় ঘুরে বসে বলল, 'যেতে আমাদের আপত্তি নেই কোন। ভেবে ছাখো রজনী। এতটা এসে ফিরে যাবে? যা তোমার ইচ্ছে—'

রজনী মুখে বলল, 'হ্যাঁ।' মনে মনে বলল, 'আপত্তি?' 'আমাদের?' তোমরা কে কে একজোট করে 'আমরা' হয়েছো অমিয়? যা তোমার ইচ্ছে! কেন? আমার ব্যাপারে তোমার কোন ইচ্ছে নেই অমিয়? বাঃ।

কিন্তু এসব কোন কথাই রজনীর মুখে ফুটলো না। লালু ততক্ষণে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছে। ফিরতি পথে নন্দনা আর ঘুমোতে পারলো না। লালু এবার

আস্তেই চালাচ্ছিল। অমিয় গাছের গায়ে, বাসের পেছনে নীলকমলের সুজাতার পোস্টার পড়তে পড়তে ফিরছিল। পঞ্চমুখের পোস্টারও চোখে পড়ছিল অমিয়র

নীলকমল লিখেছে—অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট—শংকর। একশো কুড়ি পয়েন্ট টাইপে। সে তুলনায় চাঁপাডাঙার পার্টির পোস্টার অনেক শোভন। কিন্তু হলে কি হবে! লোকের তো বড় বড় টাইপগুলোই চোখে পড়বে আগে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট! মাস গেলে আটখানা একশো টাকার নোট বরাদ্দ ছিল। এখন ক'খানা শংকর?

ওদের জায়গা হয়েছে স্কুলবাড়িতে। কর্মকর্তারা এগিয়ে এলেন। বায়নার সময় পার্টিকে বলাই থাকে—রান্নায় ঝাল দেবেন না। জার্নি করে গিয়ে শো করতে হলে কতকগুলো রেস্ট্রিকশন মেনে চলতেই হয়।

চাঁপাডাঙার পার্টি বেশ বড় করে স্টেজ করেছে। যাত্রার ঢঙে। অডিয়েন্সের ঠিক মাঝখানটায়। শুধু একদিক থেকে রাস্তার মত বাঁশের রেলিং ঘেরা পথ চলে গেছে গ্রীণরুমে। এণ্ট্রান্স এক্‌জিটের সুবিধের জন্যে ওই রেলিং। নয়তো দু'দিক থেকে উৎসুক দর্শকের চাপ এসে স্টেজে ঢোকার পথই বন্ধ হয়ে যায় এক এক জায়গায়।

সামনের পিচরাস্তা দিয়ে কাটা ধানের বোঝা নিয়ে গরুর গাড়ির সারি। তাদের সামনে রিক্‌শা সাইকেল থেকে একটি ছেলে মাইকে চেঁচাচ্ছিল—পঞ্চমুখের আসল সুজাতা। পাঁচটাকা, তিনটাকা, দু'টাকা, একটাকা। আজ সন্ধ্যা আট ঘটিকায় অভিনয় শুরু। আসল সুজাতা। আসল। অভিনয় ও পরিচালনায়—অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে অমিয়র ভ্রূ কুঁচকে গেল। কর্মকর্তাদের একজন এসে গাড়ির দরজা ধরলো। অমিয় বলল, 'মাইকে ওসব কি বলছে? আসল? নকল?'

ভদ্রলোক স্থানীয় স্কুলের কেউ হবেন। কারণ তার পেছনে স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা একজন দাঁড়িয়ে। সম্ভবত ছেলেদের জলটল দেয়। কর্মকর্তা হাসিমুখ করে বললেন, 'বলতে হয় স্যার। আমি তো কলকাতায় গিয়ে আপনাদের অভিনয় দেখে এসেছি। তাইতো জানি কারা আসল।'

—'সেকথা মাইক বাজিয়ে বলার কি আছে? অভিনয়েই বিচার হয়ে যেতো।'

—'হয় না স্যার! এদিক থেকে তারকেশ্বর যেতে পাঠকপাড়ার মোড়ে নীলকমলের তাঁবু পড়েছে। ওরা কি ডাহা মিথ্যুক। মাইক নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে—আর বলছে—নকল হইতে সাবধান। অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট শংকর অভিনীত—আসল সুজাতা। একদম এক নম্বর।'

—'তাই বুঝি।'

—'তবে আর বলছি কি স্থার। আপনারা দু'খানা গান যদি বাড়িয়ে দিতে পারেন—তাহলে খুব ভালো হয়।

—'বাড়িয়ে দেব মানে? কি বলছেন আপনি—'

—'ওদের সুজাতায় আটখানা গান রেখেছে। তাইতো শুনছি।'

—'সে জন্যে আমাদের গান বাড়িয়ে দিতে হবে?'

—'যদি পারেন স্থার—। এই চ্যারিটি শোয়ের টাকায় এবাব আমরা নতুন এগারো বারো ক্লাশের ছাদ আঁটবো। গাঁথুনি আগেই করা ছিল।

পাঠকপাড়ার মাঠে নীলকমলের গ্রীণরুম। চট দিয়ে ঘেরা। মাথার ওপরেও চট। মোটে এক সন্ধ্যের মামলা। শংকর মেকআপ নিতে নিতে দূরে তারকেশ্বর মন্দিরের চুড়ো দেখতে পাচ্ছিল। দিদির জন্যে দুধপুকুরের একশিশি জলও নিতে হয়েছে শংকরকে। দিদিটা ছিল বলে এখনো বাড়ি ফিরতে ভালো লাগে। মেকআপের টেবিলে তারকেশ্বরের সেই বিখ্যাত বাঁধানো ফটো। রাঢ়ে চঃ—। তাও কিনেছে শংকর। দিদিটা যা খুশি হবে না! আজকাল কিছুই ভালো লাগে না শংকরের।

দূরে মন্দিরের মাথাটা অন্ধকারে মিশে যাচ্ছিল। বছরের প্রথম হিমপড়া সন্ধ্যে। চটে ঘেরা পাশের ঘরে কল্যাণী সুজাতা সাজছিল বসে বসে। গলায় নাটকের গানের কলি গুনগুনিয়ে উঠেছিল। ঐপাশে বসে সবই শংকরের কানে আসছিল। এরকমই একটা সুর—আরও ঘন—আরও তীব্র—হারিয়ে যাওয়া আরেক গ্রীণরুম থেকে শংকর প্রায়ই ভেসে আসছে শুনতে পায়। রজনীদির গলার টিপ্বার আরও যে কত ভালো ছিল।

সেদিন শশাঙ্কবাবুর কথায় একটা খবর শুনে শংকর ভেতরে ভেতরে ক'দিন ধরেই ব্যথায় টাটাচ্ছে। শশাঙ্ক তারিয়ে তারিয়ে বলছিল—রজনী দেবীর গলায় কেমন ঘ্যাসঘেসে আওয়াজ বেরোয় আজকাল। শশাঙ্ক শুনে এসেছে। 'গলা ওঠে না। একটুখানি গেয়ে রজনী হাঁফাতে থাকে। পাবলিক প্যাক দিয়ে ওঠে। তাই নাকি নন্দনাকে হাতে পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। এবার স্থাখো গে নাট্যকার পরিচালক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি হয়!'

শুনতে শুনতে শংকর বলে উঠেছিল, 'কেন ? কেন শশাঙ্কবাবু ?'

—'আহা ! বুঝছো না শংকর ভাই। এই কথাটা বুঝলে না ? পঙ্কমুখ ওদের জমিদারী। ওদের দু'জনের জমিদারী। আমি, তুমি, নন্দনা, কল্যাণী, চণ্ডীবাবু—আমরা সবাই যে ওদের হয়ে জনখাটা মজুর। ওঁরা দুজনে তদারকি করে ফসল তুলবেন গোলায়। নাটকের তদারকি ! অভিনয়ের ম্যানেজারি ! পাবলিসিটির মাতব্বরি ! আর তোমরা খেটে মরবে। নাম হবে ওদের। টাকা ফেলে দেবে ব্যাংকের ফিকস্‌ডে।'

শংকর বলেছিল, 'রজনীদি তো আপনার বউ।'

—'সে ছিল এক সময় ভাই। অনেকদিন আগে।'

—'এখনো তো আপনারই ছেলেমেয়ের মা।'

—'সে সব অ্যাকসিডেন্ট। পঙ্কমুখে তোমার থাকাটাও কি অ্যাকসিডেন্ট ছিল না শংকর।'

শংকর জোর দিয়ে আপত্তি করতে পারেনি। তাকে একশো টাকার নোটের সংখ্যা এরা ভীষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ট্রামবাসে ওঠে না শংকর অনেকদিন। চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে গাড়ি, পেট্রল, ড্রাইভার। তাছাডা অ্যানুয়াল বোনাস চালু হচ্ছে নীলকমলে।

তবু শংকরের খারাপ লাগে। রজনীদিকে একবার গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে বড়। দাদাকে গিয়ে সে এখন কি বা বলতে পারে। অমিয় তো তাকে দেখলে ধমকাবেও না। মারবেও না। হিসেবও চাইবে না। কোন কৈফিয়ৎও অমিয়কে তার দিতে হবে না। তবু তার সামনে গিয়ে সে দাঁড়াবার সাহস পায় না কেন ? নন্দনা তো দিব্যি ফিরে গেছে। শুধু আমিই পারিনি।

আইব্রো পেনসিলটা নিয়ে সবে বসেছে শংকর। ঠিক এমন সময় হুড়মুড় করে টেম্পোরারী লাইন টানা কড়া আলোর ভেতর যে ঢুকে পড়ল তার মেকআপ রুমে—সে আর কেউ নয়। পরিমল। মাটিতে লোটানো কোঁচার ডগা গোবরে মাখা-মাখি। বুকের সব ক'টা বোতাম খোলা।

—'এই যে শংকর। নন্দনা কোথায় ? এরা আমায় ঢুকতে দিচ্ছিল না।'

গন্ধটা বিলিতির। পরিমলকে শংকর হাড়ে হাড়েই চেনে। পঙ্কমুখে থাকতে এই লোকটাই নন্দনাকে না জানিয়ে অমিয়র কাছে ঘন ঘন টাকা চাইতো। শংকর অনেকবার ভাউচার সই করিয়ে টাকা দিয়েছে।

—'নন্দনা কোথায় ? শো তো শুরু হবে এখুনি।'

—'আপনি এলেন কোত্থেকে ?'

—'কেন ? কাগজ দেখে। তারকেশ্বর লোকাল। তারপর রিকশো সাইকেল। দাও না ভাই মেয়েটাকে ডেকে। শ'দুই টাকার বড় দরকার পড়ে গেল হঠাৎ। আমি হিরোইনের হাজব্যাণ্ড। আর আমার পথ আটকায় ? কি সাহস ! অমিয়বাবু কোথায় ? রজনীদি ?'

—'আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন পরিমলবাবু। ওরা কেউ এখানে থাকে না।'

—'কেন ঘোরাচ্ছো ভাই শংকর। মোটে তো দু'শো টাকা। বেশি না তো। ওটাকা তোমাদের হাতের ময়লা। অথচ আমি পেলে বেশ সুখে কেটে যাবে দু'টো দিন। আমার তো সব তোমরা ঠকিয়ে নিয়েছো।'

—'বাজে বকবেন না। এখানে ও নামে কেউ থাকে না।'

—'কেন কষ্ট দিচ্ছো ভাই। ডাকো না নন্দনাকে। আমার সবই তো তোমরা নিয়েছো। অমন মোটা মাইনের অপেরার কাজ—তাও তোমাদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে চলে এলো।'

শংকর বলতে যাচ্ছিল, আপনি ভুল করেছেন। এ সুজাতা সে সুজাতা নয়। পেপারে ঠিকই দেখেছেন—তবে এখানে নয়। সে সুজাতা আরও তিন মাইল উজিয়ে চাঁপাডাঙার মোড়ে। সেখানে আপনার নন্দনাকে পাবেন।

তাতে হয়ত পরিমল জানতে চাইতে পারতো—তবে এটা কোন্ সুজাতা ভাই ?

জানতে চাইলে, শংকর ঠিকই করে রেখেছিল, পরিষ্কার বলবে- এটা নকল সুজাতা। দু'নম্বর।

কিন্তু সে সব কিছুই বলা হল না শংকরের। কখন শশাঙ্ক এসে পরিমলের পেছনে দাঁড়িয়েছে। আজকাল শশাঙ্ককে শংকর ভয় করে। কেন করে তা জানে না।

—'নন্দনাকে চাই তো আপনার। চলুন আমার সঙ্গে।'

পরম বিশ্বাসে পরিমল বলে উঠলো, 'চলুন। এইতো বেশ ঝুলি থেকে বেরুচ্ছে একে একে ! তবে যে বলেছিলে শংকর—নন্দনা এখানে নেই।'

খানিকবাদে দেখা গেল- চাঁপাডাঙার মোড়ে রিকশা থেকে পরিমল নামছে। কাছাকাছি গেলে ওর আদ্দির পাঞ্জাবির পকেট থেকে একশো টাকার নোটের আভা ফুটে উঠেছে দেখতে পাওয়া যেত।

পঞ্চমুখের সুজাতায় ফার্স্ট সিন ফার্স্ট অ্যাক্ট এইমাত্র শেষ হল। অন্তত দশ হাজারের ওপর দর্শক। বেহালার যতীনবাবুর ছড় থেকে কান বাঁচিয়ে রজনী বসে ছিল। তাকে বসে থাকতেই হয়। নয়ত নন্দনার গান সমে এসে মিলবে না। জায়গাটা একটু উঁচু মত। যারা চেনে তারা লক্ষ্য করলেই দেখতে পেত—রজনী দেবী মিউজিক হ্যাণ্ডের পাশে মূর্তি হয়ে বসে আছেন। যেভাবে লোকে আর কি ধ্যানে বসে।

চারদিকে পিন-পড়া নিস্তব্ধতার ভেতর রজনীর আঁচল ধরে কে টানলো। চমকে ফিরে তাকিয়ে রজনা দেখলো, ধুতি পাঞ্জাবি পরনে একটা লোক তার দিকে তাকিয়ে চেনা দেবার হাসি হাসছে।

চমকে গিয়েছিল রজনী। অবাকও হয়েছিল। কে এভাবে তাকে আঁচল টেনে ডাকতে পারে। যে পারে—সে তো এখন স্টেজে।

—'নেমে এসো রজনীদি।'

স্টেজের এ-দিকটায় অল্প আলো। উঁচু মঞ্চের পেছনে নিচুতে দাঁড়িয়ে পরিমল তাকে ডাকছে। বুকের সবটা খোলা। মাথার চুলে ডান চোখটা ঢাকা পড়েছে।

নেমে এসে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রজনী গন্ধ পেল।

পরিমল তাকে নাক কোঁচকাতে দেখে বলল, 'মাইরি বেশি খাইনি দিদি।'

রজনী জানে, এখন নন্দনা বা অমিয় এ-অবস্থায় পরিমলকে দেখতে পেলে একটা অনর্থ বাধবে।

প্রায় গরু তাড়ানোর ভঙ্গীতে পরিমলের পিঠে হাত দিয়ে রজনী বলল, 'চল ভাই গ্রীণরুমে গিয়ে বসিগে দু'জনে।'

—'কোন ভয় নেই দিদি। আমার একটুও নেশা হয়নি। সামান্য খেয়েছি।'

মাতাল হয়ে তলিয়ে যাবার আগে লোকে এভাবেই বলে। রজনী তা জানে। তাই বলল, 'চল ভাই। বসে বসে কথা হবে।'

পরিমলের আবছা মনে পড়লো, খানিক আগে রিক্শা থেকে নেমে শশাঙ্ক নামে একজন দয়ালু লোকের দেওয়া দু'খানা একশো টাকার নোটের একখানা তাকে ভাঙাতে হয়েছে। খুচরো ছিল না। রিক্শা ভাড়া দেবে কি দিয়ে। তাই খুচরো করতে হাইওয়ের গায়ে পাঞ্জাবী ধাওয়া থেকে ছোট একটা লাইট কিনতে হয়েছিল তার। খানিক ধাওয়ায় বসে—খানিক চলন্ত রিক্শায় হাওয়া খেতে খেতে সে খেয়েছে। বাকিটা রিক্শাওয়ালাকে বকশিশ করতে হল তার। এখানে তাকে সুস্থ অবস্থায় যেতে বলে দিয়েছিল শশাঙ্ক। বউয়ের কাছে নাকি সভ্যভব্য হয়ে

যেতে হয়। ঘাসের ভেতর পায়ের পাম্পশু ডুবিয়ে পরিমল দেখছিল—তার বউ নন্দনা বেডরুম সিনে অমিয়র হাত থেকে বার বার ফসকে যাচ্ছে। গলায় ঠুংরির বোল। চালে চলনে একদম সোনাগাছির মেয়েছেলে। নিজেরই অজান্তে পরিমল নিজের দাবনায় স্টেজের ঠুংরির তালে তাল দিয়ে উঠলো হাতে। 'বাঃ! বেড়ে শিখিয়েছো দিদি। আজ তিনমাস একটা খোঁজ নেয় না আমার। পয়সা দেবারও নাম নেই কোন। তারকেশ্বর স্টেশনে নেমে দেখি পকেট আমার গড়ের মাঠ রজনীদি!'

গ্রীণরুমে যাওয়ার রেলিং-ঘেরা পথটা কিছু নির্জন। হাজার দশেক দর্শকের বিশ হাজার চোখ এখন স্টেজে। পরিমলের শেষ কথায় তার নিজের ভিতরটা কেঁপে উঠলো। শেষে তোরও নন্দনা—। মুখে বলল, 'এসো ভাই ডাব খাবে?'

—'খাওয়াবে? দাও তাহলে।'

টেম্পোরারি গ্রীণরুমের বড় আয়নায় রজনী তার আর পরিমলের ছায়া দেখতে পাচ্ছিল।

পরিমল বলল, 'এই জায়গায় জোড়া সুজাতা। তোমরা তাহলে শংকরকে তাড়িয়ে দিয়েছো।'

রজনী বুঝলো কোন কথা বলে লাভ নেই পরিমলের সঙ্গে। এখুনি বেহেড্ মাতাল হয়ে যাবে। তার মানে যদি লালুকে দিয়ে গাড়ি করে তারকেশ্বর স্টেশনে পৌছে দেওয়া যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। পেটি ক্যাশ থেকে সাতখানা দশ টাকার নোট পরিমলের হাতে তুলে দিয়ে রজনী বলল, 'কাল বিকেলে ভরত হাউজে যেও—তখন নন্দনার সঙ্গে দেখা হবে। টাকাও পাবে।

—'ঠিক বলছো তো দিদি?'

—'ঠিক। একদম ঠিক।'

—'সল্ট লেকের বাড়ি হয়ে গেলে তুমি দিদি একদিন কিন্তু আসবে।'

—'বাড়ি কতদূর?'

—'লিন্টেল অব্দি হয়ে পড়ে আছে আজ ছ'মাস।'

—'শেষ করে ফেল। তারপর নিশ্চয় যাব। এখন গেলে তো বসতে দিতে পারবে না।'

—'শেষ তো হচ্ছে না। টাকা দিলে তো শেষ হয়।'

—'কেন? নন্দনা দিচ্ছে না?'

—'বন্ধ করে দিয়েছে দেওয়া।'

—'আচ্ছা। আমি বুঝিয়ে বলব।'

লালু পরিমলকে তুলে নিয়ে তারকেশ্বর স্টেশনের দিকে চলে গেল। যে করে হোক হাওড়ার ট্রেনে তুলে দিতে হবে। তার ওপর রজনী দিদিমণির এই অর্ডার হয়েছে। ট্রেন না পেলে বাসে। বাস না পেলে—কুমড়োর লরিতে। কিংবা কয়লার। নয়তো পরিমল আবার এখানে ফিরে আসবে।

রওনা করিয়ে দিয়ে রজনী আয়নার রজনীর দিকে তাকালো। পরিষ্কার গলায় বলল, 'গুণধর!' কাকে বলল, নিজেই বুঝে উঠতে পারলো না। শশাঙ্ককে? না, পরিমল কে?

বেশি রাতে পঞ্চমুখের ট্রুপ বাসে কলকাতা ফিরছিল। বাতাসে ঠাণ্ডা রাতের ঝাপটা। পেছনে লালুর গাড়িতে ওরা তিনজন। অমিয়, রজনী, নন্দনা। লালু রূপনারায়ণের সেতুতে গাড়ি তুলেই আপন মনে বলল, 'পরিমলদা এতক্ষণে শ্যামবাজারে পৌঁছে গেছেন।'

—'পরিমল? কখন এসেছিল?'

রজনী নন্দনার মুখের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'তোমরা তখন স্টেজে। বেহেড মাতাল হয়ে এসেছিল। টাকা চাইছিল।'

—'দিলে?'

—'দিতে হল। বেশি নয়—সত্তর টাকা। নয়তো যাবে না! কী কেলেঙ্কারি বাঁধায় শেষে। লালুকে বলে কুমড়োর লরিতে ওঠাবার ব্যবস্থা করতে হল।'

—'টাকা না দিয়ে আমায় ডাকলে না কেন?'

—'তুমি তখন অভিনয় করছিলে নন্দনা।'

নন্দনা অন্ধকার গাড়ির ভেতরে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। রূপনারায়ণের বুকে একটা খড়ের নৌকোয় আগুন লাগলো এইমাত্র। প্যারালাল ব্রিজ দিয়ে মালগাড়ি পাস করছিল। তার ভেতর নন্দনার কান্না চাপা পড়ে গেল। তখন নন্দনা বলছিল, 'সব জায়গায় টাকা চেয়ে চেয়ে এইভাবে আমার নাম ডোবালো লোকটা। সল্ট লেকে বাড়ি তোলার নাম করে টাকা নিয়ে যেত খেপে খেপে। শেষে একদিন মাতাল অবস্থায় ধরা পড়লো। ফাঁকা মাঠে আমার এত কষ্টের টাকা একখানা আধখানা বাড়ি হয়ে পড়ে থাকলো। কোথায় কোথায় যায় আজকাল। সে লোককে কি বলে টাকা দিয়ে আসকারা দিলে দিদি? তুমিও শেষকালে ষড়যন্ত্রে ওর সঙ্গে হাত মেলালে—'

—'কি বাজে বকছিস নন্দনা। তখন না সামলালে টাকার জন্যে স্টেজে তোর কাছে চলে যেত পরিমল।'

—'যেতো। যেতো। আমি সামলাতাম।'

—'না। তা হয় না নন্দনা। নাটক ভণ্ডুল হয়ে পঞ্চমুখ ডুবতো। তা আমি হতে দিতে পারিনে।'

—'তুমি ইচ্ছে করেই ওকে টাকা দিয়েছো দিদি। আমি জানি। ইচ্ছে করেই—'

—'বাজে বোকো না।' শুকনো গলাতে কোনমতে কথাটা শেষ করল রজনী। আশ্চর্য ! অমিয় একটুও আপত্তি করছে না। আর কথা বললে, রজনী বুঝলো, তার গলায় কান্না এসে যাবে। সে মরলেও নন্দনার সামনে কাঁদতে পারবে না। তাহলে তার এ-কান্নাকে সেদিনের এই পুচকে মেয়েটা প্রার্থনা বলে ভুল করতে পারে।

কাচবন্ধ গাড়িতে বসে একটু আগে অমিয় রূপনারায়ণের বুকে একটা আবছা মত নৌকোতে আগুন ধরে উঠতে দেখেছে। সে আস্তে বলল, 'বেশি টাকা নয়তো নন্দনা। মোটে সত্তর।'

রজনী শান্ত গলায় বলল, 'তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা ওকে আরেকজন দিয়েছে।'

—'কে দিদি ?'

—'শশাঙ্ক। দু'শো টাকা। সব গলগল করে বলে গেল পরিমল। ট্রেন থেকে নেমে ভুল করে ওদের ওখানেই গিয়েছিল প্রথম। সেখানে শশাঙ্ক টাকা দিয়েছে। রিক্শায় বসিয়ে দিয়ে চাঁপাডাঙার মোড়ে আমাদের শোয়ের কথাও বুঝিয়ে বলে দিয়েছে। রাস্তার ডিরেকসন দিয়ে।

এবারে নন্দনার চোখের জল, গলায় কথা—একসঙ্গে শুকিয়ে গেল।

ভোর রাতে বাড়ি ফিরে অমিয়র ঘুম ভাঙলো বারোটার পর। ফাঁকা বাড়ি। ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় স্কুলে। লীলাও নিশ্চয় বেরিয়ে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে কলঘর। সেখান থেকে বেরিয়ে সামনের ঘরে চোখ পড়তে অবাক। 'কি ব্যাপার ! স্কুলে যাওনি ? ওরাও তো যায় নি দেখছি। কি করছো সবাই মিলে ?'

—'দেখতেই পাচ্ছি। বিছানা প্যাঁটরা বাঁধা হচ্ছে। কোথায় যাবে ? আমি কিন্তু এখন গাড়ি দিতে পারবো না ক'দিন। সম্রাটের রিহার্সেল চলবে পুরো কদমে।'

একটু থেমে একই নিঃশ্বাসে অমিয় বলল, 'কিছু খেতে দাও। বড় খিদে পাচ্ছে।'

—'ঢাকা দেওয়া রয়েছে। তুলে খেয়ে নাও।'

লীলার একথা ভালো লাগলো না অমিয়র। কেউ না দিলে—কোন আয়োজন. উদ্যোগ না থাকলে তার একদম খেতে ইচ্ছে করে না। আগাম সাজানো জিনিসের অবহেলায় তার চিরকালের অরুচি। তবু খিদের জন্যে অমিয়কে বলতেই হল।

লীলা তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাকসো গোছাচ্ছিল।

—'এতো দেখছি এলাহি কাণ্ড। কতদূরে যাচ্ছো?'

—'কার্শিয়াংয়ে। আমাদের বড় দিদিমণির একটা বাড়ি আছে ওখানে। ওর স্বামী করে গিয়েছেন।'

—'বাঃ। চমৎকার। কদ্দিনের জন্যে যাচ্ছো? এত জিনিস নিয়ে যাচ্ছো?'

—'যতদিন থাকতে পারি।'

—'তোমার স্কুল?'

—'গতকাল আমি রিজাইন দিয়েছি।'

অমিয়র খাওয়া থেমে গেল। 'রিজাইন দিয়েছো? তোমার অত সাধের চাকরি?'

—'আর চাকরি করার মানে হয় না। অনেকদিন তো করলাম। ওরা কার্শিয়াংয়ের ঠিকানায় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটির চেক পাঠিয়ে দেবে।'

অর্ধেক খেয়ে হাত ধুয়ে এসে এ-ঘরের বিছানায় বসলো অমিয়। 'হাতে টাকা আছে তোমার?'

—'ফিক্স্‌ড ফাণ্ডে কিছু জমেছিল। সেটা তুলেছি কাল। চেক পাওয়া অব্দি চালিয়ে নিতে পারবো।'

—'ওদের স্কুল?'

—'টি. সি. নিয়ে নেব পরে। ওখানে ভর্তি করব। অ্যানুয়াল দিতে ওরা ক'দিন এখানে এসে থাকবে।'

—'আমি তো কিছুই জানি না লীলা। কখন এতসব ঠিক করলে?'

—'অনেক দিন। রেডি হতেও তো মাস খানেক লেগে গেল।' বাক্স গোছাচ্ছিল লীলা আর কথা বলছিল। একবারও চোখ তুলে অমিয়র দিকে তাকায় নি। এমন'কি বিন্দুও না। সে খুব মনদিয়ে নারকোল দড়ি দিয়ে শতরঞ্চি পাকানো চাউস বিছানাটা দু'বোনকে নিয়ে বাঁধছিল।

—'টাকা ফুরিয়ে গেলে কি করবে ?'

—'এখন তো বাড়িভাড়া লাগবে না ছ' মাস্। হাতে টাকা থাকতে থাকতে কাজ জুটিয়ে নেব ওখানে। নয়তো টিউশুনি পাবো নিশ্চয়।'

ছোট মেয়েটা একদম অমিয়র মুখ পেয়েছে। সে এগিয়ে বলল, 'তুমিও চল না বাবা একসঙ্গে। বেশ মজা হবে। ট্রেনের জানলায় বসে গল্প করতে করতে যাবো।'

অমিয় জানতো খুব বেমামান শোনাবে। তবু তাকে বলতে হল। খুব সত্যি কথাই বললো। 'আমার সময় কোথায় মা! আর ক'দিন বাদেই নতুন নাটক—সম্রাট।'

বলেও অমিয়র কানে নিজের গলা ভ্যাঙচানির চেয়ে ভালো কিছু শোনাল না। এখন তার একটা কথা বলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু বলা হল না। কথাটা খুব সাধারণ। 'আমার শরীর ভালো নয় লীলা। আমি খুব একা। শোয়ের পর এই ফাঁকা বাড়িতে ফিরে আমি থাকবো কি করে ?'

কিন্তু সে-কথা এখন আর বলা যায় না—তা অমিয় ভালো করেই জানতো।

সুজাতা নয়। রেগুলার শো হিসেবে সম্রাট আবার মঞ্চস্থ।

নতুন আয়না আনতে হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা চোখের মায়া। কিংবা লাইটিংয়ের ভাষায় অপটিকাল ইলিউশন। প্রতি শোয়ে তো আর একখানা করে আনকোরা আয়না ভাঙা যায় না। শশাঙ্কর লোকজনই যা ভেঙে দিয়ে গেছে।

চালু সুজাতা নাটকের এতদিনকার পাবলিসিটি বিল্ড আপ এখন নীলকমল একাই উশুল করবে। গাঁয়ে গঞ্জে। হাটে মাঠে। শশাঙ্কর এখন আর পড়িমরি করে আসল সুজাতা বনে যাওয়ার লড়াই লড়তে হবে না। একদম ওয়াক্ ওভার!

সম্রাটের কসটিউমে পায়ের জুতোর স্ট্র্যাপ হাঁটু অব্দি উঠে এসেছে অমিয়র। নতুন উইগের চুল দুই ভ্রূ ঢেকে ফেলেছে। পটভূমি—সায়াহ্ন। শেষ বিকেলের লাল সূর্যটা টুপ করে খসে পড়ার আগে মঞ্চের কোণে প্রায় লটকে আছে।

রাজনর্তকী মধুমতীর রোলে নন্দনা। দিব্যি মানিয়েছে। সার্টিনের কাঁচুলি আর জিংক অকসাইড্ মাখানো খোলা শরীর নিয়ে নন্দনা ভারতনাট্যমের স্টেপ দিচ্ছিল স্টেজে। সিংহাসনে সম্রাট। চোখ দুটো একদম বন্ধ।

ঠিক তখন সম্রাজ্ঞী যশোধরার মেকআপ নিয়ে রজনী মঞ্চে এসে বাঁ দিকের ফুট লাইটের সামনে দাঁড়ালো। ডান দিকে মাথার ওপর থেকে ফোকাস নেমে এসে

তাকে আলাদা করে ফেললে। রজনীর মুখখানা থমথমে। অন্ধকারের সঙ্গে অডিয়েন্স মিশে ছিল।

রজনী গলা তুলতেই. তা চিরে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে রজনী কি বলল। পাবলিক চেঁচিয়ে উঠলো, 'লাউডার'! লাউডার প্লিজ !!'

সিংহাসনের সম্রাট কিছুই শুনতে পেল না। কোনদিন এরকম হয় না অমিয়র। আজ নিয়ে পাঁচদিন হল ছেলেমেয়েদের নিয়ে লীলা ভোরের ট্রেনে কার্শিয়াং গেছে। অমিয়র কাছে কোন টাকা চায়নি।

॥ পঁচিশ ॥

'লাউডার ! লাউডার প্লিজ !!'

সাড়ে সাত টাকার রো থেকেই আওয়াজ উঠলো প্রথম। তারপর পাঁচ টাকা, তিন টাকার রো থেকেও সে আওয়াজ আরও জোরালো হয়ে উঠলো। সম্রাজ্ঞী যশোধরা প্রথমটা একদম ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপর সোজা ফুটলাইটের দিকে এগিয়ে এসে রজনী গলা তুলে ধরলো। কণ্ঠস্বর আর গ্রীবা—একই সঙ্গে—ফোকাসের ভেতর দাঁড়িয়ে। বাংলা থিয়েটারের প্রায় দুই যুগের সেই বিখ্যাত গ্রীবা। যা থেকে একদিন অহীন্দ্র চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে রজনী আলেয়ার রোলে গান গেয়েছে। চন্দ্রগুপ্তে কে. সি. দে-র হাত ধরে গাইতে গাইতে স্টেজে এনট্রান্স নিয়েছে। তখত এ-তাউসে ছবি বিশ্বাসের সামনে এই গ্রীবা ডানদিকে হেলিয়ে দিয়ে তখনকার সত্য যুবতী রজনী সংলাপ ছড়িয়ে দিয়েছে পাবলিক স্টেজে।

কাজ হল। তখনকার মত রজনী সামলে নিতে পারলো। অডিয়েন্স আবার মন্ত্রমুগ্ধ।

রাজনর্তকী মধুমতী হিসেবে নন্দনা একটু আগে নেচেছে। নন্দনাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। রজনীদির আগেকার গলার স্বর খানিকক্ষণের জন্যে সম্রাজ্ঞী যশোধরা ফিরে পেয়েছিল। সেটুকু শুনে সে তার ডায়ালগ ভুলে বসে আছে। রজনীদি। তোমার গলার স্বর এত সুন্দর। কোথায় এমন স্বর সব সময় লুকিয়ে রাখো ? কিন্তু অভিনয়ের মাঝখানে বলে নন্দনা এর একটা কথাও বলতে পারলো না। সে আগেও অবশ্য রজনীর গলায় এ-স্বর শুনেছে। কিন্তু ইদানীং তো রজনী কথা বললেই সে ভয় পায়। কী এক ফ্যাসফেসে আওয়াজ। শুনলে গা শিউরে ওঠে। এ-গলা কোত্থেকে পেল রজনীদি ?

অমিয় সম্রাটের আসনে বসে চিরকালের সম্রাট হতে চাইছিল। কিন্তু লাউডার প্লিজের আওয়াজের ভেতরেও সে সকালের ট্রেনের ভিড়ে একটা ফ্যামিলিকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। মা, একছেলে, দুই মেয়ে ওরা কার্শিয়াং চলেছে। ছবিটা ক'দিন আগের। কার্শিয়াং পৌঁছে আমার ছেলে কি একবার আমার অভাব বোধ করে নি ? লীলা কি আমাকে পাশে না পেয়ে কোনো অস্বস্তিতে পড়ে নি ?

লাউডার প্লিজের আওয়াজ অমিয় ভ্রূক্ষেপও করে নি। সে রজনীকে জানে।

এমন অবস্থায় রজনীর মত ভেটার্ন আর্টিস্ট একটা না একটা কিছু করবেই। কিন্তু এমন যে রজনী করে উঠবে তা ভাবতেও পারে নি অমিয়। এ কোন্ গলার স্বর? কোন গাছতলায়—ছায়ার ভেতর এই শব্দ করেই ঝর্ণার জল বয়ে যায়। কিংবা কোন ঝর্ণাতলায় গাছের ছায়া এভাবেই পড়ে থাকে। এত গভীর। এত মিষ্টি।

রজনীর গলায় সংলাপ নতুন মানে নিয়ে অডিটোরিয়ামে ছুটে যাচ্ছিল। সম্রাটকে তার সিংহাসনে নড়ে চড়ে বসতে হল। অমিয় পরিষ্কার দেখলো রজনী রীতিমত হাঁফাচ্ছে।

শোয়ের শেষে অনেকদিন পরে রজনী নিজেই অমিয়কে ডাকলো। অনেকদিন এভাবে ডাকে না রজনী। গ্রীণরুমের ভেতর একদম শেষে রজনীর বিশ্রামের জন্যে পালঙ্ক। তাতে এক পা ঝুলিয়ে বসেছে সম্রাজ্ঞী যশোধরা। তখনো মেকআপ ধোয়নি রজনী। ঝোলানো বাঁ পায়ে আলতার দাগ। গৃহস্থ রজনীকে তার মেয়ে মনোরমা ক'দিন আগে আলতা পরিয়ে দিয়েছিল। ঘরসংসারে তা খানিকটা মুছে গেছে।

মেকআপের চেয়ারে বসে অমিয় ইণ্টারকমে বুকিংয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। হাউসফুল গেছে। খবর নিচ্ছিল একস্ট্রা রোয়ের। শেষে মোট ক'খানা দিতে হচ্ছে?

শোয়ের পর ইদানীং বেশ খানিকক্ষণ একা থাকে। গুনগুন করে গাইতে গাইতে মেকআপ তোলে। কিংবা টেপে তুলে রাখা তার নিজেরই গলায় টপ্পা চালের পুরনো থিয়েটারি গানের দু'চার কলি বাজিয়ে শোনে ক্যাসেট থেকে।

এমন সময় দূরে গ্রীণরুমের কোণের পালঙ্ক থেকে রজনীর গলা পেল। 'অমিয় এদিকে একবারটি এসো—'

খানিকবাদে ভেতরে গিয়ে অমিয় তো অবাক। পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসে আছে সত্যিকারের কোন রাজ্ঞী। আর গলার স্বর যাকে বলে রিয়েল টিম্বার। গভীর, টনকো, স্বাদু। এ-গলা এতদিন কোথায় লুকিয়ে বসেছিল রজনী।

—'কাছে এসে বোসো। নন্দনা কোথায়? চণ্ডীদা? ওদের ডাকো—'

—'কেন? তুমি এখন উইল লিখতে বসবে নাকি রজনী!'

—'ডাকোই না।' বলে আবছা মত হাসলো রজনী। 'আমার বোধহয় বেশি সময় নেই অমিয়।'

—'ও কথা বলছো কেন? আজ তো দারুণ অভিনয় করলে। স্টেজে আমরা সবাই চমকে উঠছিলাম।'

—'এ তো সুজাতা নয় অমিয়। 'সুজাতা'য় সুজাতাই সব। এ নাটকের নাম —সম্রাট। এখানে সম্রাটই সব। এ তোমারই নাটক। তোমাকে এ নাটক অনেক দূর নিয়ে যাবে অমিয়।'

—'কিন্তু দর্শক আজ অভিনয় দেখলো তোমারই। আমরা তোমার পাশে কেউ দাঁড়াতে পারিনি। ঢাকা পড়ে গিয়েছিলাম রজনী। অমন গলার স্বর এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?'

—'তাইতো তোমাদের আজ আমি ডাকছি। আমার বোধহয় সময় নেই আর—। পাবলিক আওয়াজ দিতেই গোড়ায় আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তারপর সোজা ফুটলাইটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাঁফাচ্ছি। গলা উঠছে না। যতটা জোর ছিল—তাই দিয়ে বুকের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে সংলাপ বললাম। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর থেকে অমিয়—কি বলবো—একখানা পাথর যেন ডায়ালগের ধাক্কায় সরে গেল। আর অমনি—আমার আগেকার সেই গলা ফিরে এলো। আমিও অবাক। তবে কি আমার গলা সেরে গেল?'

অমিয়র পাশে এসে নন্দনা ফোল্ডিং চেয়ার টেনে বসেছে। পেছনে দাঁড়িয়েছে চণ্ডী। রজনী কথা বলছিল আর হাঁফাচ্ছিল। ওরা অবাক হচ্ছিল সবাই। রজনীর সেই ফ্যাসফেসে আওয়াজ আবার গলায় ফিরে আসছিল একটু একটু করে। অস্বস্তি, ভয়ে নন্দনা নড়েচড়ে বসলো।'

—'শেষ হওয়ার আগে মানুষ ভালো জিনিস ফিরে পায়। পাবেই অমিয়। সে যত অল্প সময়ের জন্যেই হোক না কেন!'

—'থাক। আর কথা বোলো না। তুমি একটু চুপ করে বোসো।'

—'নন্দনা এবার থেকে সম্রাটে রেগুলার শো করবে।'

—'আমি তো করছি দিদি।'

—'না। রাজনর্তকীর রোলে নয়। তুমিই এখন থেকে রাজ্ঞী যশোধরা।'

অমিয়র মনে হল, রজনী আজ ফতুর হবার জন্যেই পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে সম্রাজ্ঞী সেজে বসেছে। আস্তে বলল, 'সে দেখা যাবে এখন। তুমি বরং মেকআপ তুলে নিয়ে একটু বিশ্রাম কর। আমি লালুকে দিয়ে চাইনিজ খাবার আনাচ্ছি সবার জন্যে।'

—'আমার জন্যে আনাবে না অমিয়। আমি খাবো না।'

—'কেন?'

—'শরীরটা ভালো নেই। আর—'

—'আর কি? বল রজনী।'

—'বলছি। স্টেজে সেই সময় থেকেই আমার গলায়, বুকে কিসের কষ্ট হচ্ছে। থামছে না।'

—'বলবে তো। নন্দনা। ডাক্তার সেনকে লাইন দিতে বলতো। চণ্ডীদা। লাইন না পেলে তুমি গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ধরে আনবে।'

ওরা দু'জন উঠে যেতে রজনী অনেকদিন পরে আবার অমিয়কে একা পেল।

শো ভাঙার পরে তার গ্রীণরুম ভীষণ ম্যাটমেটে লাগে। কিন্তু সেখানেও এই দু'জন সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর কসটিউম মেকআপে জ্বলজ্বল করছিল।

রজনী বলল, 'লীলাকে আমার ওপর রাগ করে থাকতে বারণ করবে।'

—'করবো। তুমি কথা না বলে চুপ করে থাকো তো। ডাক্তারবাবু এসে যাবেন—'

—'একটু কথা আমি বলবোই অমিয়। তোমার কথা শুনে যদি রেগুলার শো থেকে বসে যেতাম—গলায় রেস্ট নিতাম—তাহলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি এতটা চাপ পড়তো না। আমি যে আর অভিনয় করতে পারবো না—তা আমি আজ বুঝতে পেরেছি। সব শোয়ের আগেই একবার অন্তত খানিকক্ষণের জন্যেও আগে কার ভালো জিনিস ফিরে আসে!'

—'আর কথা বোলো না। মেকআপ ধুয়ে এসো। ডাক্তার সেন আসবেন—'

—'আসুকগে। লীলাকে বলবে— সে আমার ওপর ভুল করে রেগে আছে। যা হবার নয়—তা কি আর জীবনের মাঝখান থেকে হয়!'

—'লীলা কোথায় যে তাকে বলবো?'

—'কেন?'

—'সে তো ছেলেমেয়ে নিয়ে কার্শিয়াংয়ে বসে আছে।'

—'কবে থেকে? কবে ফিরছে?'

—'ফিরবে না। এখানকার চাকরি থেকে রিজাইন দিয়ে টাকা পয়সা তুলে নিয়ে গেছে।'

—'কি বলছো অমিয়? ছেলেমেয়েদের স্কুল?'

—'অ্যানুয়াল দিতে আসবে। যাবার সময় টি. সি. নেবে।'

রজনী চুপ করে গেল। তারপর খুব আস্তে বলল, 'শুধু আমার জন্যে! আমারই জন্যে! তুমি খাচ্ছো কোথায়?'

—'যখন যেখানে যা পাই। বাড়িতে ঠিকের লোকও রেঁধে রেখে যায়—'

—'কার্শিয়াং গিয়ে ওদের নিয়ে এসো জোর করে।'

—'আর তো ক'টা দিন পরেই পরীক্ষা দিতে আসবে ওরা—'

—'সে জন্যে বসে থেকো না অমিয়! তোমাকে বড় দরকার লীলার—'

অমিয়র দিক থেকে কোন জবাব না পেয়ে রজনী আবার বলল, 'আমার শেষ তো খুব কাছাকাছি। লীলা এটুকু অপেক্ষা করতে পারলো না?' তারপর আপনা-আপনিই বলল রজনী, 'ভীষণ বোকা। লীলা বড় মূর্খ!'

অমিয় কোন কথা বলল না। সে এখন সম্রাটের মেকআপ—সম্রাটের কসটিউমে একখানা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে। গ্রীক জুতোর স্ট্র্যাপ হাঁটু অব্দি উঠে এসেছে। মাথার ওপর একশো ওয়াটের ডুম ঝুলছিল।

নন্দনা ভেতরে এসে বলল, 'ডক্টর সেন এখুনি আসছেন।'

শশাঙ্ক নিত্যকার অভ্যেস মত দুপুরের ভাত খেল ঘরে বসে। পাইস হোটেলের মাসকড়ারি মিল। খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে সিগারেট ধরাবার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, পকেট ফাঁকা। একটা পানও খাওয়া দরকার। হোটেলের ছেলেটা এঁটো নিতে আসবে। দরজা ভেজিয়ে পাঞ্জাবি গলিয়ে নিল গায়ে। তারপর মোড়ের দোকান। ভাতঘুম দিয়ে বিকেল বিকেল শশাঙ্ক নীলকমলে যাবে। পারলে আজই সন্ধ্যের শোয়ে শংকরকে নিয়ে সম্রাট দেখবে। তাইতো কথা হয়ে আছে। দু'জনকে অবশ্য পেছনের রোয়ে ঘাপটি মেরে বসেই দেখতে হবে। পঞ্চমুখের সুজাতার ভূত ঝাড়াতে পারলেও সম্রাট এখন নতুন উপসর্গ। শংকরকে তো আর সব বলা যায় না। পঞ্চমুখের দিকে ছেলেটার পেছুটান আর গেল না। শ্রীরাম ট্রাস্টের সেক্রেটারিবাবু তো এখন শশাঙ্ককে দেখলেই বলেন, ও মশাই! এ কি করলেন? ওরা যে আবার নতুন নাটক নামালো!

মাথা পরিষ্কারের জন্যেও পান চিবিয়ে একটা সিগারেট ধরানো দরকার। পানের রসের সঙ্গে সিগারেট টানতে টানতে শশাঙ্ক দুপুরের রেডিওতে পালুস-কারের পুরনো ঠুংরি পেয়ে পানের দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

পাইস হোটেলের ছেলেটা এঁটো নিয়ে যাবার পর শশাঙ্ক দত্তর ঘরে ঢুকলো গিরিশ পার্কের সস্তা। রজনীর একমাত্র ছেলে সন্তু। সনৎ দত্ত। দু'পাশের চাপা ছাদের নিচে ছোট ট্রেডলে শব্দ করে ওষুধের লেবেল ছাপা হচ্ছিল।

ঘরে ঢুকে সন্তু দরজা ভেজিয়ে দিল। দিনের বেলাতেও ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সুইচ্ হাতড়ে আলো জ্বাললো। নোনায় ফুলে ওঠা পুরনো দেওয়াল। টাঙানো

দড়িতে লুঙি, পাজামা, তোয়ালে। দেওয়ালের তাকে সোপকেস, পেস্ট, ব্রাস, সেভিং সেট, তিন বছরের তিনখানা পঞ্জিকা। উল্টো দেওয়ালে বাংলা ক্যালেণ্ডারের ওপর খদ্দরের পাঞ্জাবি ঝোলানো।

সন্তু ছুটে গিয়ে পকেট হাতড়ালো। নাঃ! কিচ্ছু নেই। জোরেই বলে ফেলল, 'বাবাটা সাবধান হয়ে গেছে।' বালিশের নিচে হাতড়ে পেল একটা চাবির গোছা। একটা চাবি ঘরের তালার। আরেকটা নাহয় বাথরুমের চাবি। সন্তু জানে এসব জায়গায় বাথরুম যাতে বারোয়ারি হয়ে না পড়ে সেজন্যে বাড়িওয়ালা পাঁচ ভাড়াটের হাতে এমন চাবি দিয়ে দেয়। তাহলে বাজার এলাকার উঠকো লোকজন খোলা বাথরুম পাবে না। কিন্তু গোছায় দেখছি তিনটে চাবি! নীলকমলের নয়তো? কিন্তু পেপার পাবলিসিটিতে বাবার নাম তো নীলকমলের কেষ্ট বিষ্টুর মত ছাপা নয়। সে কেন চাবি বয়ে বেড়াবে? নিশ্চয় দারোয়ানের কাছে সে-সব চাবি থাকে।

তাহলে এই একটা বেশি চাবি কোথাকার? সন্তু এদিক ওদিক তাকাতে থাকলো। তারপর উবুহয়ে তক্তপোশের নিচে উঁকি দিয়েই ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে বসে পড়লো। শশাঙ্কর নামে তিন হরফের একটা তুবড়ি টাইপের খিস্তি ফায়ার করে সন্তু একটানে ট্রাঙ্কটা বের করে আনলো। তারপর চাবি ঘোরাতেই তালা খুলে গেল।

ডালা তুলতেই সন্তুর নাকে ন্যাপথালিনের কড়া গন্ধ এসে লাগল। চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তিরিশ বাই পনর ইঞ্চি স্টিলের ট্রাঙ্ক। গভীর প্রায় বিশ ইঞ্চি হবে। আগাগোড়া কারেন্সি নোটের পিন আটা গোছায় ঠাসা। গলা অব্দি। বেশির ভাগই একশো টাকার নোট। নরম, শান্ত—পরিচিত রঙের। একসঙ্গে এত? কত টাকা হবে?

সন্তু উঠে গিয়ে ভেজানো দরজা চেপে খিল আটকাতে ভুলে গেল। গোড়ায় তিন চারবার পরিপাটি সাজানো নোটের থাকে খুব আলগোছে হাতবোলালো। তারপর আপনাআপনিই শশাঙ্কর নাম ধরে তার মুখ দিয়ে খিস্তি বেরিয়ে আসতে লাগলো। শেষে সন্তু নিজেই নিজেকে শুনিয়ে ফাঁকা ঘরের ভেতর পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো—বাবা তুমি এত বড়লোক?

একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। পারলো না। সন্তুর তখন মাথা ঘুরছিল। পরিষ্কার বুঝলো, এ-অবস্থায় আর খানিকক্ষণ থাকলে সে নিজেই মেঝেতে শুয়ে পড়বে। তোমার এত টাকা আর সে-কথা তুমি আমায় একবারও জানাওনি বাবা? তুমি তো মহা হরফন পার্টি। এত থাকথাক গজ তোমার কাছে? এখানে হেসে

ফেলল সন্তু। বাবা এখানে থাকলে জানতে চাইতো—গজ মানে কি সন্তু? গজ মানে গজআঁকা একশো টাকার নোট। সব তো জানো বাবা—তবে আর এত ন্যাকামি কেন! বেশ তো এতগুলো টাকা লুকিয়ে রেখেছিলে বাবা! তোমার আর কিছু শেখার বাকি নেই! তুমি গিরিশ পার্কের সন্তুর বাবা তো!

ভেজানো দরজার বাইরে আলোর আভাস দূর থেকেই দেখতে পেল শশাঙ্ক। দরজার মুখটা অন্ধকার বলে দিনের বেলাতেও আলো জ্বালালে জ্বলজ্বল করে। পানের দোকান থেকে ফিরছিল। আমি বেরোবার সময় তো আলো জ্বেলে রেখে যাইনি। তবে কি পাইস হোটেলের ছেলেটা আলো জ্বালিয়ে পয়সাকড়ির খোঁজে বিছানাপত্র হাটকাচ্ছে? সর্বনাশ।

আস্তে দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিতেই শশাঙ্কর শরীর অবশ হয়ে গেল। এই অবস্থায় পাইস হোটেলের ছেলেটাকে দেখলে শশাঙ্ক তার সঙ্গে টাকা দিয়ে রফা করতো! টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতো ছেলেটার।

কিন্তু এখন যে মেঝেতে বসে ট্রাঙ্ক খুলে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে তার সঙ্গে তো কোন রফা চলবে না। পাইস হোটেলের ছেলেটা টাকায় রাজি না হলে তাকে খুন করে এঘরেই গুম করার চেষ্টা করতে পারতো শশাঙ্ক। কিন্তু সন্তুর সঙ্গে তো গায়ের জোরে পারবে না শশাঙ্ক। আর ওকে তো খুনও করতে চায় না শশাঙ্ক। বরং এসবই তো ওরই জন্যে করে যাচ্ছে সে। শুধু সেজন্যই শশাঙ্ক এই ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে নেমেছে। যাতে সন্তু ওরা পরে ভালোভাবে বাঁচতে পারে। কোন অভাবে না পড়ে। এখন এসব সন্তুকে বললে বুঝবে না। তাই শশাঙ্ক কিছু বলেনি। সময় হলেই বলতো।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সে কি বলবে সন্তুকে? ও টাকা আমার নয় সন্তু। সন্তু জানতে চাইবে—তবে কার বাবা? শশাঙ্ক বলবে—একজন গচ্ছিত রেখে গেছে। সন্তু বলবে—ব্যাঙ্কে না রেখে তক্তপোশের নিচে ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রেখেছো কেন? শশাঙ্ক বলবে—অনেক টাকা তো। ইনকাম ট্যাক্স ধরবে। তাই—

তাহলে বাবা আমি খাতার ব্যবসার জন্যে সামান্য টাকা চাইতে এসে খালি হাতে ঘুরে গেলাম। তুমি বললে, আজ না, কাল না, অমুক দিন, অমুক জায়গায় আয়—তখন কত ঘোরালে। এই তো টাকা ছিল তোমার—দাওনি তো আমাকে। আমি তোমার একমাত্র ছেলে। তুমি, মা—দু'জনে কতো রোজগার কর। তবু?

এরপর শশাঙ্ক আর কাল্পনিক সংলাপে থাকতে পারলো না। কি কুক্ষণেই যে

দরজা খোলা রেখে বেরিয়েছিল। তা নাহলে তো এ-ঝামেলায় পড়তে হোত না তাকে।

সন্তু পকেটের রুমাল পেতে একশো টাকার নোটের থাক তুলে নিল দু'খানা। তারপর একটানে বিছানার চাদরটা মেঝেতে নিয়ে নিল। ও সর্বনাশ! সন্তু তো দেখছি ট্রাঙ্ক ফাঁকা করে নোটের বাণ্ডিলগুলো ধোপার গাঁঠরি বেঁধে নিয়ে যাবে ঠিক করেছে। ঠিক পেছনে দরজায় দাঁড়ানো শশাঙ্কর পা টলে উঠলো।

এখন দুপুরবেলা। একখানা দেওয়ালের ওপারেই মেশিনম্যানরা কথা বলছে। শশাঙ্ক ডাকলেই আসে। কিন্তু এ-অবস্থায় ডাকে কি করে? মেঝেতে অতগুলো টাকার নোট। নাহলে শশাঙ্ক ওদের বলতে পারতো। বলতেই পারতো—আমি একা লোক থাকি এখানে। ছাখোতো ভাই কোত্থেকে এক ছোকরা ঢুকে পড়ে ঘর হাটকাচ্ছে। তখনকার মত সন্তুকে অস্বীকার করতে তার আটকাতো না। তাহলে আখেরে সন্তুরই ভালো হোত। টাকাগুলো তো একদিন সন্তুই পাবে।

শশাঙ্কর পা এবারই একদম টলে গেল। সেই সঙ্গে দরজায় রাখা হাত দু'খানা শরীরের দু'পাশে শব্দ করে খুলে পড়লো। দরজার দু'পাল্লা ততক্ষণে একদম খুলে গেছে।

—'কে?'

ঘরের বাসিন্দা শশাঙ্ক সন্তুর এই 'কে?' শুনে চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। গিরিশ পার্কের সন্তা এক ঝটকায় কোমর থেকে চাকু তুলে নিয়েছে হাতে। চোখে জ্বরে-ভুল-বকা প্রলাপের দৃষ্টি। লালও হয়েছে।

সন্তু দেখলো—তার নিজের বাবা তারই পেছনে চিড়িয়াখানার নতুন জাগুয়ারটার পোজে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। দর্শকের খোঁচা খাওয়া একটা রাগস্ত জিনিসের ছবি আজকালের মধ্যে কোন্ কাগজে দেখেছে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'বাবা?'

তারপরই সে দেখলো, শশাঙ্ক দেওয়ালের ডান কোণের দিকে এগোচ্ছে।

দু'জনেই তখন দু'কোটি বছর আগেকার মানুষ হয়ে গেছে। যখন—রাগ, ভালোবাসা, হিংসে নিখাদ, স্পষ্ট ছিল। যখন—আঘাত মানে ছিল মৃত্যু। সন্তু দেখতে পেলো বাবা যদি আর একটু এগোয় তাহলেই ঘরের কোণের লাঠিটা হাতে পেয়ে যাবে।

—'খবর্দার বাবা।'

শশাঙ্ক থেমে গেল। তার কব্জির কাছে সন্তুর হাতের চাকু। 'আর এগোলে--'

সন্তুর এই ধমক একদম রিয়েল। কোন ফাঁকি নেই। শশাঙ্ক আস্তে বলল, 'এ-টাকা আমার নয় সন্তু। হাত দিসনে—'

—'ইস্‌! মাইরি!! বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে সাজিয়ে রাখবো!'

—'রেখে দে সন্তু। ও পরের টাকা।'

—'নীলকমলের টাকা তো।' সন্তু কথা বলছিল আর নোটের গোছা সাজাচ্ছিল চাদরে। দিনের বেলা ইলেক্‌ট্রিক আলো ঘরটাকে আরো হলুদ করে ফেলেছে। তার ওপর কেঁপে ওঠা দেওয়ালে দু জনের ছায়া।

—'না নীলকমলের টাকা নয় সন্তু। রেখে দে—'

সন্তু এখন তার বাবাকে একটুও বিশ্বাস করতে পারছিল না। টাকা বলে কথা। তাও এতগুলো। পরিষ্কার গলায় বলল, 'তবে এ টাকা কার?'

—'এক বন্ধুর। গচ্ছিত রেখে গেছে আমার কাছে।'

—'বন্ধুর? তোমার আবার বন্ধু কোথায়' বাবা! হাসালে—। যাও এখন দরজা থেকে সরে দাঁড়াও। ভেতরে এসে বন্ধ করে দাও। কথা শোন বাবা। নইলে ঝাড়বো এমন এক ঘা—।' বলতে বলতেই সন্তু নোটের গোছা সাজাচ্ছিল চাদরে। সব সময় একচোখ শশাঙ্কর দিকে। তেমনি ভাবেই বলল, 'টাকাগুলো বাড়ি নিয়ে যাবো আমি। মাকে দেবো কিছু। তুমিও এসো না রাত করে। এত টাকা। মা, আমি, তুমি—সবাই বসে ঠিক করা যাবে—! কি বল? কথা বলছো না যে একদম। কি ব্যাপার? চুপ মেরে গেলে!'

—'কি আর বলবো বল সন্তু। সবটাতেই তুই জোর খাটাবি। আমি তোর বাবা—'

—'অস্বীকার করছি না তো। কিন্তু তুমি তো নিজেই জানো তুমি কত গুণধর। এতগুলো টাকা লুকিয়ে নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছো। তুমি মাইরি খুব টান্টু! ফের আবার মানে জানতে চেয়ো না কিন্তু বাবা।'

—'ওগুলো পরের টাকা সন্তু।'

—'তাইতো আমি নিয়ে যাচ্ছি। একটু এগিয়েছো কি কষে ঝাড়বো এক লাথি—। এর কিছু টাকা মাকে আমি দোবই।'

সন্তুর মুখে তার মায়ের কথা শুনে শশাঙ্ক ভেতরে ভেতরে আগুন হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ঠিক রাখতে হচ্ছিল। এতগুলো টাকা। এভাবে হাতছাড়া হবে? শেষে রজনীর হাতে গিয়ে না পড়ে। ছুরিখানা রুমালে রেখে পা ছড়িয়ে বসে সন্তু চাদরের বোঝায় কষে গিঁট দিচ্ছিল।

শশাঙ্ক ঝাঁপিয়ে পড়লো। সন্তু যেন তৈরিই ছিল। ছড়ানো বাঁ পা খানা একটু শুধু নাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাতে আটকে গিয়ে শশাঙ্ক উল্টে পড়লো। দেওয়ালে মাথা ঠুকেও উঠে দাঁড়ালো শশাঙ্ক। সন্তু বসে বসেই হাসলো। 'জানতাম বাবা তুমি এমন করতে পারো। নাও। এবার ছুরিখানা দিয়ে দাও তো ভালো ছেলের মতো।

শশাঙ্ক মেঝেতে তাকিয়ে দেখলো, তার পায়ের ধাক্কাতেই ছুরিখানা তক্তপোশের এপাশে এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে টুক করে তা তুলে নিল।

সন্তু ভাবতেও পারেনি—শশাঙ্ক এত তাড়াতাড়ি এসব কাজ পারে। তাই গাঁঠরি ফেলে প্রায় স্প্রিংয়ের মতই সেও উঠে দাঁড়ালো। এখন তারা দু'জনই পুরোপুরি দু'কোটি বছর আগেকার মানুষ হয়ে গেল। কিংবা বনমানুষ। যখন শোক, রাগ, আনন্দ—খুব পরিষ্কার, স্পষ্ট ছিল।

শশাঙ্ক ডান হাতে ছুরি উঁচু করে বাঁ পা দিয়ে নোটের গাঁঠরিটায় লাথি দিল। যাতে তা সন্তুর আওতার বাইরে তক্তপোশের নিচে চলে আসে। এলোও খানিকটা।

তখনই—ঠিক তখনই সন্তুর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, 'তবে রে শালা। নিজের ডান পা খানা লাঠি করে দূর থেকেই শশাঙ্কর পেটে কোঁৎকা করে ঝাড়লো।

কোক্ করে বসে পড়তে পড়তে শশাঙ্ক তার হাতের ছুরি সন্তুর বুক পকেটের ওপর দিয়ে টেনে দিল।

এরপর সন্তু কিছুক্ষণ আর কিছু মনে রাখতে পারলো না। সে তখন গিরিশ পার্কের সন্তু।

দরজার বাইরে থেকে কেমন সন্দেহজনক আওয়াজ পেয়ে একদম লাগোয়া মেশিনের মেশিনম্যান ঘুর পথে দরজার কাছে আসছিল। প্রায় তার পায়ের কাছেই এক ঝাপটায় দরজা খুলে গিয়ে শশাঙ্কর শরীরটা টলে পড়লো। গায়ের জামা কোমর অব্দি খুলে পড়ছে। প্রায় দু' টুকরো। একটা ভ্রূ রক্তে টুবু টুবু। নাক, চোখ থ্যাঁতলানো। তবু তাকে চিনতে পারলো মেশিনম্যান। হাত দিয়ে তুলতে যাবে শশাঙ্ককে—এমন সময় টলতে টলতে সন্তু বেরিয়ে এল। তার জামার বুক-পকেটটা রক্তে কালো হয়ে গেছে।

মেশিনম্যান চমকে পিছিয়ে এল। দেখলো, ছোকরা মত ছেলেটা দত্তবাবুকে ছাড়িয়ে বেশিদূর এগোতে পারলো না। তার হাতের গাঁঠরিটাতেও রক্তের ছিঁটে। ধুলো। বোঝাটা ছেলেটার পাশে পড়ে গেল।

সবে ঘুম থেকে উঠে চা নিয়ে বসেছে রজনী। ফাঁকা গ্রীণরুম। স্টেজে সম্রাজ্ঞী যশোধরার রোলে নন্দনাকে মহলা দেওয়াচ্ছিল অমিয়। সঙ্গে বেহালায় ছড়ের টান। চায়ে চিনি কম হয়েছে। কিন্তু তবু কাউকে ডেকে একটু চিনি দিতে বলল না রজনী। সে নিজেই এখন তার নিজের গলা শুনতে পায়। কেমন খসখসে।

ঠিক করেছে রজনী বাইরে কোথাও যাবে। বিশ্বনাথ ক'দিনের জন্যে যাবে। এই বিশ্বনাথ একবার শরৎবাবুর কোন্ নাটকের কমবিনেশন নাইটে বল্লভ ডাক্তার সেজেছিল। নয়তো বিশ্বনাথ অমিয়র হয়ে পঞ্চমুখের উকিল, ইনকাম ট্যাক্স— এসব দেখে থাকে। নাটকটার নাম মনে পড়ে না কেন? আঃ! পেয়েছি। আমি ষোড়শী হয়েছিলাম। বিশ্বনাথ বল্লভ ডাক্তার।

মুখ তুলে তাকিয়ে রজনী দেখলো, অমিয় দাঁড়িয়ে। মুখখানা গম্ভীর।

—'কিছু বলবে?'

—'ঘরে চুপ চাপ বসে আছো। রেডি হয়ে নাও। একটু ঘুরে আসি।'

অনেকদিন পরে রজনী তার চোখের সামনে—একদম মণিব ওপর একটা অদৃশ্য প্রজাপতিকে উড়তে দেখলো। আনন্দে মনটা নেচে উঠলেই এই প্রজাপতি-টাকে দেখতে পায় রজনী। ফিবে ফিরে আসে। অনেকদিন পরে এইমাত্র আনন্দ হল বলে আবার দেখতে পেল রজনী ওকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে নতুন রঙ করা গাড়িতে বসলো। পেছনের সিটে। অমিয়র পাশে। শেয়ালদা ছাড়াবার পর রজনীর খেয়াল হল, লালুর পাশে একজন অজানা লোক বসে। লালু তো কাউকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালায় না। তবে কে?

লোকটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রজনী আস্তে অমিয়কে বলল, 'কে?'

অমিয় একটু হালকা না হয়ে পরিষ্কার গলায় বলল, 'পুলিশ হাসপাতালের সিভিল ড্রেস পুলিশ।'

—'পুলিশ?'

—'হ্যাঁ রজনী। আমরা এখন পুলিশ হাসপাতালে যাচ্ছি। শশাঙ্কবাবু অসুস্থ।'

—'তা পুলিশ হাসপাতালে কেন অমিয়। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি নে—। কি অসুখ?'

—'পুলিশ কেস্ তাই। জ্ঞান হারাবার আগে তোমার নাম করেছেন খুব। তাই শুনে এক হাউস সার্জেনের সন্দেহ হওয়ায় ওই পুলিশকে দিয়ে খবর

পাঠিয়েছেন। তবে না আমরা জানলাম। তোমায় একবারটি দেখতে চাইছিলেন নাকি শশাঙ্কবাবু।'

—'গাড়ি ঘোরা লালু। আমি যাবো না।'

এবার সামনের সিটের পুলিশটি ঘুরে বসে পেছনে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের ও সি আছেন হাসপাতালে। আপনার এভিডেন্স নেবেন বলে বসে আছেন।'

—'আমি যাবো না।'

—'দরকার পড়লে ডাইং ডিক্লারেশন নেবেন বলে ও সি সাহেব ওয়েট করছেন। আপনার কথাবার্তাও রেকর্ড করে নেবেন। ড্যাগার মারামারির কেস কিনা।'

—'আমি যাবো না। গাড়ি ঘোরা লালু।'

অমিয় বলল, 'না রজনী—তুমি যাবে। তোমার ছেলেও অসুস্থ।'

—'কে ? সন্তু ? কি করে ?'

—'ওরা তো বলছেন, দু'জনে ছুরি মারামারি হয়েছে—'

রজনী অমিয়র বাঁ হাতখানা দু'হাতে চেপে ধরলো। গলায় আর কোন আওয়াজ নেই। তার ভেতরে তবু অনেক কষ্টে গলা তুলে বলল, 'আমায় নিয়ে চল—'

অমিয় সেই হাতে রজনীকে কাছে টানলো। লালু এতদিন ওদের দু'জনকে পেছনে বসিয়ে কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। এই প্রথম এরকম একটা দৃশ্য ওর চোখের ওপরের ছোট আয়নায় দেখতে পেল।

বেণী নন্দন স্ট্রীটের গায়েই পুলিশ হাসপাতাল। লিফটে তেতলায় উঠে ডান হাতের তিন নম্বর ঘর। বাইরে লম্বা বেঞ্চে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার বসে। হাতে ফাইল। রজনীকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো। 'আপনি রজনী দত্ত ?'

অমিয় একটু রেগেই বলল, 'কেন ? সন্দেহ আছে ?'

—'না। ভুল বুঝবেন না আমায়। আপনাদের দু'জনকে দেখেই চিনেছি। কিন্তু একই নামে অনেকে থাকেন তো। বিশেষত এমন কেসে—'

রজনীকে থামানো গেল না। প্রায় আলুথালু অবস্থায় তিননম্বর ঘরে ঢুকে পড়লো। হাসপাতাল, পুলিশের লোকজন ছাড়াও সঙ্গে সঙ্গে অমিয় রজনীর পেছনে ছুটে গেল। যতটা জোরে রজনী ঢুকে পড়েছিল—ঠিক ততটাই থেমে পড়তে হল রজনীকে। স্যালাইন, অক্সিজেন—একই সঙ্গে চলছে সন্তুর। ভালো করে তাকিয়ে দেখলো, ব্লাডও হয়তো দেওয়া হচ্ছে। একটা বোতলের মুখ উল্টো করে ঝোলান। তার ভেতরে রক্ত।

রজনী জায়গায় দাঁড়িয়েই নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলো।

সেই ইউনিফর্ম পরা ভদ্রলোক—ও সি হবেন নিশ্চয়—আস্তে বললেন, 'পাঁচ নম্বরে যাবেন না?'

ওরা সবাই বাইরে এলে রজনী মাথা নেড়ে জানালো—সে পাঁচ নম্বরে যাবে না। তবু অমিয় একবার আস্তে বলল, 'শশাঙ্কবাবু গুরুতর অসুস্থ। তোমার স্বামী।'

একথায় রজনী জলে ঝাপসা চোখ দু'টো তুলে অমিয়র মুখে তাকালো একবার। অমিয় সে-চোখে চোখ রাখতে পারলো না। মাথা নামিয়ে নিয়ে নিজেই পাঁচ নম্বর ঘরের দিকে এগোলো।

সে ঘরেও একই দাবি। পার্থক্য যা তা হল—শশাঙ্কর বাঁ পায়ের হাঁটু থেকেই বিরাট ব্যাণ্ডেজ। শশাঙ্কও অজ্ঞান।

অমিয় করিডরে বেরিয়ে এসে দেখলো, পুলিশের সেই ভদ্রলোক প্রশ্ন করছেন আর লিখছেন। অমিয়কে দেখে পুলিশ অফিসার বললেন, 'এবার আপনারা একতলার অফিসঘরে চলুন একটু। দু'একটা জিনিস দেখে সই করে দিয়ে যাবেন।'

অফিসঘরে ঢুকে দু'জনেই ধাক্কা খেল। রজনী ধাক্কা খেল কিছু বেশি জোরে—।

পুলিশ অফিসার বললেন, 'শশাঙ্কবাবুর ঘরে একটা খোলা ট্রাঙ্কের পাশে ওই চাদরে রাখা নোটগুলো পাওয়া গেছে।'

অমিয় পুলিশ হাসপাতালের অফিসঘরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, শীতের সন্ধ্যেবেলা লংকোট গায়ে দু'জন কনেস্টবল হ্যাণ্ডকাপ লাগানো একজন পেশেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে সামনের মাঠে পায়চারি করছে। অফিসারের সব কথা কানে গেল না অমিয়র।

রজনী চোখ মুছে গাঁঠরিটার দিকে তাকালো। একটা সাধারণ শাদা চাদর। ধুলো মাখা। ফেরিওয়ালার বোচকার মত বাঁধা। তাতেও রক্তের কালো ছিটে।

অফিসার বললেন, 'আমরা গুণে দেখলাম—ওই বোঁচকায় কারেন্সি নোটে একলক্ষ সতেরো হাজার আটশো দশ টাকা রয়েছে। আপনি ইচ্ছে করলে গুণে দেখতে পারেন। মিলে গেলে সই দিন। টাকাটা এখন আমাদের কাছে জমা থাকবে—'

চমকে গিয়ে অমিয় বলল, 'কত টাকা?'

—'এক লক্ষ সতেরো হাজার আটশো দশ টাকা। গুণে দেখুন।'

রজনী পড়ে যাচ্ছিল। সামনের চেয়ারটার হাতল ধরে নিজেকে সামলালো।

তারপর তাতেই বসে পড়ল। চোখে আর একটুও জল নেই তার। পরিষ্কার গলায় বলল, 'আপনারা যখন দেখেছেন—তখন আর আমাদের শুণে দেখার কোন দরকার নেই। দিন কোথায় সই করতে হবে।'

অমিয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, অফিসঘরের ম্যাটমেটে আলোয় রজনী এক-খানা বড় লেজার খাতায় সই করছে। কালি ডোবালো কলমে। রজনীর হাত কাঁপছে বলে কলমের ডগাও কাঁপছে। অফিসারের হাতে ইংরাজিতে কথায় লেখা—রুপিজ ওয়ান ল্যাক সেভেনটিন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্রেড টেন ওনলি। তার পাশে বাংলায় রজনী লিখলো—শ্রীমতী রজনী দত্ত। অনেকদিন পরে ও দত্ত লিখলো। ইদানীং তো দেবীই থাকে ওর নামের পাশে।

অফিসার বললেন, 'শশাঙ্কবাবু কে হয় আপনার?'

রজনী চোখ নামালো।

অমিয় বলল, 'হাজব্যাণ্ড।' মনে মনে বলল, এ-সময় দত্ত লেখাই ঠিক হয়েছে রজনীর। বিশেষত অতবড় একটা অঙ্কের পাশে।

এমন সময় তিন-চারজন কনেস্টবল দু'টি রক্তমাখা মস্তান মত লোক নিয়ে হই-হই করে ঘরে ঢুকে পড়লো।

হাসপাতালের ওয়ার্ডার মত একজন রজনীদের বলল, 'আপনারা এখন একটু বাইরে বসুন। ভিড়টা কাটলেই আবার আপনাদের ডাকছি। একটু কাজ বাকি আছে।'

ওরা হাসপাতালের বারান্দার চওড়া বেঞ্চে এসে বসলো। গেট দিয়ে সন্ধ্যের হরিশ মুখার্জী রোড দেখা যায়। এবছর শীত কলকাতাকে ভালো রকম আক্রমণ করেছে। রজনী আঁচল দিয়েই গলাটা ঢাকলো। তাড়াহুড়ায় দু'জনের কেউই গরম চাদর বা কিছু আনেনি।

রজনীর চোখ একদম শুকনো। তবু মুখখানা খুলে গেছে। আস্তে বলল, 'খাতার ব্যবসা করবে বলে সামান্য কিছু টাকা চেয়েছিল সন্তু।'

—'দিলে পারতে।'

—'বুঝিনি।' তারপর রজনী একটু থেমে বলল, 'সেই টাকার জন্যে ওর কাছে গিয়েছিল। ওর বাবার ঠিকানা আমাদের বাড়িতে শুধু ওই জানতো। তারপর আচমকাই চেঁচিয়ে উঠলো রজনী। সব ভুলে গিয়ে সেই ফ্যাসফেসে গলায় উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, 'বুঝেছি আমি। সব বুঝতে পেরেছি। আমাদের কবিয়াল নাটকের সরানো টাকা। নয়তো কোত্থেকে অত টাকা পাবে শশাঙ্ক। আমার মুখের

রক্ত তোলা টাকা। যা সরানোর দরুন দেনা হয়েছিল। যে-কেনো তুমি আর আমি পঞ্চমুখে খেটে খেটে পাওনাদার শুধেছি অমিয়।' এখানে রজনীর গলা একদম চিরে গেল। 'আমি এক্ষুনি তেতলায় পাঁচ নম্বরে যাবো।'

অমিয় শক্ত করে হাত ধরে টেনে রজনীকে বেঞ্চে বসিয়ে দিল। 'কার কাছে যাবে। সে তো এখন সেনস্‌লেস্‌। অক্সিজেন চলছে।'

রজনী দু'হাত দিয়ে অমিয়র কাঁধ টেনে নিল কাছে। তারপর তাতে মাথা রেখে হুহু করে কেঁদে উঠলো।

অমিয়র মনে পড়লো ফ্রুট ক্র্যাশারে এইভাবেই আস্ত পাইনআপেল থেকে ফ্যানা ফুলে ওঠে। কিংবা পুরীর সী বিচে সমুদ্র এভাবেই ফেনা ফেলে রেখে যায়। রজনী তখন তার গায়ের ওপর থরথর করে কাঁপছিল।

—'এই সরানো টাকা দিয়েই দু'নম্বর সুজাতা চালু করেছে। অত পেপার পাবলিসিটি—'

অমিয় কোন জবাব দিল না।

রজনী মাথা তুলে বলল, 'এত টাকা লুকোনো কি তৃপ্তির বুদ্ধিতে?'

—'তা জানবো কি করে!'

—'আমার মনে হয় না। তৃপ্তিও কি জানতো?'

—'কি করে বলবো রজনী!'

—'আমার তো মনে হয় না। হাজার হোক সে তো আর্টিস্ট ছিল। স্ত্রী হয়ে আমিই পারিনি! আর সে কি করে শশাঙ্ককে ধরবে?'

এবারও অমিয় কোন জবাব দিল না।

অফিসঘরের মধ্যে হইচই চলছিল। রজনী অমিয়র কাঁধেই চোখ ঘষে মুছে নিল। 'অত টাকা ছিল ওর কাছে। একদিনের জন্যেও বুঝতে দেয়নি। আশ্চর্য!'

অমিয় এবারও কিছু বলার মত পেলো না।

রজনী নিজে থেকেই বলল, 'কাল ডক্টর সেনের কাছে যেতে হবে। আমার গলার বায়োপসি হবে।'

অমিয় এবারও কোন জবাব দিল না। গেটে এসে একটা ফিয়াট থামলো। দরজা খুলে নীলকমলের শংকর নামছে।

॥ ছাব্বিশ ॥

ঠিকে কাজের রাঁধুনি সন্ধ্যে সন্ধ্যে এসে পাড়ার টিউবয়েল থেকে খাবার জল তুলে দিয়ে যায়। ঘরদোর ঝাঁটপাট দেয়। যাবার আগে ওবেলার রান্নাগুলো কখনো-সখনো দরকারে গরম করে দিয়ে যায়। জলের কুঁজো নামিয়ে রেখে ঘরে ঢুকে রাঁধুনি বলতে গেল, 'চা করে দেব দাদাবাবু—'

ভেতরে ঢুকে আশ্চর্য। 'একি ? কখন এলে বৌদিমণি ?'

শীতকালের সন্ধ্যেবেলার মরা আলোয় ছোট ঘর। সিঙ্গিল খাটের অগোছালো বিছানায় অমিয় পিঠে বালিশ দিয়ে আধশোয়া। নন্দনা দরজার দিকে পেছন ফিরে 'পারোস' টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেট চড়াচ্ছিল। অমিয়র গলায় সম্রাটের ডায়ালগ। বাজিয়ে শোনাবে নন্দনা। জানলা দিয়ে দেখা যায়—খালধারের রাস্তা দিয়ে কলকাতার গৃহস্থরা আলোয়ান গায়ে চলাফেরা করছে। মাথার ওপরে আকাশ এখন হিম।

রাঁধুনির কথায় নন্দনা ফিরে তাকালো। অমিয় না তাকিয়েই বুঝলো—নন্দনা আর তাকে ফাঁকা বাড়িতে দেখে রাঁধুনি নিশ্চয় শক্ খেয়েছে। কিন্তু কোন উপায় নেই।

অমিয় কোলের ওপর রাফ খাতাখানায় স্টেজের পজিশন আঁকছিল আনমনে। সেই অবস্থাতেই বলল, 'তিন কাপ চা করো। বিস্কুট আছে বোর্ণভিটার কৌটোয়—'

ঘোমটা টেনে দিয়ে রাঁধুনির জিভ কেটে চলে যাওয়া নন্দনার চোখ এড়ালো না। ক্যাসেট থেকে গমগম করে অমিয়র গলা বেরিয়ে আসছিল। সশরীরে অমিয় কোলের ওপরের প্যাডে ডটপেনে আঁকিবুকি কাটছিল।

চা এলে দু'জনেই চুপচাপ বসে চা খেল। চায়ের কাপ রেখে নন্দনা বলল, 'সন্তুকে তো কাল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে।'

—'কাল নয়। আরও হপ্তা খানেক থাকতে হবে। সেরে এসেছে প্রায়। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি।'

—'কি দাদা ?'

অমিয় অন্যমনস্ক হয়ে জানালায় দাঁড়ালো। 'ভাবছি—'

নন্দনা উঠে এসে অমিয়র পেছনে দাঁড়ালো। এইমাত্র রাঁধুনি বাইরে থেকে

দোর টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেছে—সে-শব্দ চা খেতে খেতেই শুনেছে নন্দনা। এখন সে তার ডান হাতখানা অমিয়র পিঠে রাখলো। বিনা গেঞ্জিতে কোঁচকানো আদ্দির পাঞ্জাবি।

—'কি ভাবছো দাদা?'

—'ছেলেটা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে দেখবে—তার মা বাড়ি নেই। আবু পাহাড়ে হাওয়া পাল্টাতে গেছে।'

—'আচ্ছা! রজনীদি তো আর বেড়াতে যায় নি। যে ক'টা দিন আছে—কলকাতা থেকে, গোলমাল থেকে একটু দূরে নির্জনে থাকবে বলেই তো গেছে—'

—'তা তো আর জানে না ও। জানেও না—ওর মায়ের গলায় ক্যানসার—' বলতে বলতে অমিয় বুঝলো, নন্দনা পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে তার পিঠে হাত পাঠিয়েছে। এ কি সান্ত্বনার হাত! না সন্ধানের? কিছু না বলে অমিয় আস্তে বলল, 'বাড়ি ফিরেও তো স্বস্তি পাবে না সন্তু। ওর বাবার অবস্থা তো ভালো নয়।'

—'শশাঙ্কবাবু আজ কেমন আছেন?'

—'সকালের খবর— ফিরে অক্সিজেন দিতে হচ্ছে শশাঙ্ককে।'

—'রজনীদি জানে?'

—'না।'

—'জানালে পারতে।'

—'লাভ নেই কোন নন্দনা। জানালেও কি দেখতে যেত রজনী!' বলে অমিয় তার নিজের গলা শুনতে পেল। ক্যাসেট থেকে সম্রাটের ডায়ালগ লাফিয়ে বেরিয়ে আসছিল। 'আমি মৃত্যুর শিল্পী।'

—'নন্দনা। ক্যাসেটটা নামিয়ে রাখো। ভালো লাগছে না।'

—'আমায় রিহার্সেল দেওয়াবে বলে এলাম। দুপুর থেকে বসে আছি। এক লাইন ডায়ালগও তো আমার গলায় শুনলে না দাদা।'

—'এবার শুনবো।'

উৎসাহে নন্দনা লাফিয়ে উঠলো। তারপর যা করে বসলো, সেজন্যে অমিয় তৈরি ছিল না। তার পেছন থেকে দু'হাতে নন্দনা তাকে জড়িয়ে ধরেই ছেড়ে দিল।

রাস্তা থেকে এসব দেখা যায় না। নইলে জানলার নিচের ফুটপাথে ওপরমুখো লোকের ভিড় হয়ে যেত। অমিয় ভ্রূ কুঁচকে ঘরের ভেতরে ফিরে তাকালো।

নন্দনা খানিকটা অপরাধী—খানিকটা আনন্দে ফুটছে—সেই অবস্থায় মাথা নিচু ""র ঘরের ভেতর দাঁড়ালো।

—'কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোমার নন্দনা?'

অমিয়র এভাবে জানতে চাওয়ার ভেতরেই কোথাও প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ছিল। নন্দনা মাথা তুলতে পারলো না। আরও যেন নুয়ে পড়তে চাইছে মাথাটা তার। লজ্জা আর কান্না যখনই তাকে একসঙ্গে আক্রমণ করেছে—তখনই দেখেছে নন্দনা —সে প্রায় পাথর হতে শুরু করে।

—'আমার ভুল হয়েছে।'

অমিয় খুব কাছে এগিয়ে এল। একেবারে গায়ে গায়ে। তারপর দু'হাতে নন্দনার মুখখানা ফোটা স্থলপদ্ম করে তুলে ধরলো। 'কার্শিয়াং থেকে একখানাও চিঠি পাইনি নন্দনা। একখানা পোস্টকার্ডও নয়—'

অমিয়র এ-কথায় নন্দনার দু'চোখের কোণে জলের দুটি ফোঁটা এসে দাঁড়ালো। সেই অবস্থাতেই হেসে ফেলল নন্দনা। 'আমি হলে পারতুম না। লীলাবৌদির কি মন নেই!'

—'আছে! হয়তো বেশিই আছে। তাই—'

এমন সময় বুককেসের পাশে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। অমিয় ছুটে গিয়ে টেলিফোনের সামনে দাঁড়ালো। টেলিফোনটা বেজেই যাচ্ছিল।

নন্দনা বলল, 'তোলো। হয়ত কার্শিয়াংয়ের ট্রাংক কল। বিন্টুদের অ্যানুয়াল পরীক্ষা তো এসে গেল।'

—'তুমি ধরো।'

—'না। তোমার ফোন তোমাকেই ধরতে হবে দাদা।' নন্দনা রিসিভার তুলে দিল।

ওপাশ থেকে গলা ভেসে এল অমিয়র কানে। 'বুধবার সন্ধ্যের ফ্লাইটে টিকিট পেয়েছি।'

—'কেন? সকালের ফ্লাইট পেলে না? দিনে দিনে দিল্লি পৌঁছনোই ভালো ছিল। দিনের আলো থাকতে থাকতে হোটেল ঠিক করা—জয়পুর অব্দি টিকিট বুক করার সুবিধে হোত।'

নন্দনা বুঝলো, রজনীর ফোন।

রজনী তখন ফোনে বলছিল, 'বেস্পতিবার সকালের টিকিট ছিল। কাটিনি। বিশ্বনাথ বলল, সম্রাট নতুন নাটক। তুমি বেস্পতি-শনি-রবি শো নিয়ে থাকবেই

সারাদিন। এখন তোমায় ব্যস্ত করা ঠিক হবে না। তার ওপর নন্দনার নতুন রোল। ডায়ালগ ভালো করে রপ্ত হয়নি এখনো।'

—'ফ্লাইট ক্যানসেল করে বেস্পতিবাবের টিকিট নাও। বিশ্বনাথকে বলো—আমি বলেছি। সকালের ফ্লাইটে—'

—'না অমিয়। ওদিন টিকিট নিলে তোমার এয়ারপোর্টে আসতে কষ্ট হবে। শুধু শুধু হয়রানি। বুধবার কোন শো থাকবে না। আমি চাই তুমি এয়ারপোর্টে আসবে সেদিন। একটা রাত তো মোটে। কোনরকমে কাটিয়ে দেব দিল্লির হোটেলে। পরদিন ভোরেই তো জয়পুরের গাড়ি ধরবো। সেখান থেকে আবু —।'

অমিয় বুঝলো, একদমে অনেক কথা বলে রজনী লাইনের ওপাশে হাফাচ্ছে। ও এখনো জানে, ওর গলায় অ্যাকিউট ফেনিনজাইটিস। ডক্টর সেনের পরামর্শে কলকাতা থেকে অনেক দূরে—যেখানে কেউ ওর নাগাল পাবে না কথা বলতে হবে না কারও সঙ্গে—এমন জায়গায় রজনী ক'দিনের জন্মে রেস্ট নিতে যাচ্ছে। বিশ্বনাথকে অমিয়র বলা আছে—আবুতে পৌছেই গেস্ট হাউসের ঠিকানা, টেলি-ফোন নম্বর দিয়ে তাকে টেলিগ্রাম পাঠাবে। তাহলে এখন তখন হলে অমিয় ছুটে গিয়ে খুঁজে বের করতে পারবে রজনীকে।

—'তাহলে বুধবার সন্ধ্যেবেলা আসছো তো? ফ্লাইট নাম্বার ডি এল থার্টি-ওয়ান। সন্ধ্যে সাতটা কুড়িতে প্লেন ছাড়বে। ছ'টার ভেতর এসো কিন্তু। ডোমেস্টিক ট্রানজিট লাউঞ্জে বুকস্টলের সামনে থাকবো।'

টেলিফোনে এই লম্বা কথাবার্তার ভেতর নন্দনা পরিষ্কার বুঝলো, সে অমিয়র কোন পৃথিবীর ভেতরেই পড়ে না।

অমিয় তখন রিসিভার কানে লাগিয়ে বলে যাচ্ছিল, 'কোনরকম একজারসন করবে না। দরকার হলে দিল্লি থেকে আবু অব্দি প্রাইভেট কার ভাড়া করতে বলবে বিশ্বনাথকে।'

—'সে তো অনেক টাকা অমিয়। কি দরকার? এই কি কিছু কম খরচ হচ্ছে।'

—'অত হিসেবে তোমার কোন দরকার নেই রজনী। তুমি তো পঞ্চমুখের কাছে অনেক পাও। তা তো কোনদিন শোধ হবার নয়।'

—'তাই বুঝি! ওকথা বার বার বলতে নেই। হালকা হয়ে যায়। ভালো কথা। সন্তুকে আজ দেখতে গিয়েছিলে?'

—'অনেকক্ষণ ছিলাম। ভালো আছে। ঘা শুকোয়নি বলে মাঝে মাঝে সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে।'

—'হাসপাতাল থেকে রিলিজ হলে আমার কথা বলো ওকে। কোর্টে যেতে হলে যেয়ো।'

—'বলবো।' অমিয় একটু থামলো। তারপর বললো, 'দরকার হলে যাবো। আরেকজন তোমার নাম করছিল।'

নন্দনা দেখলো, অমিয় হ্যালো হ্যালো করলো দু'বার। তারপর নন্দনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রিসিভার নামিয়ে দিয়েছে।'

নন্দনা গম্ভীর হতে পারলো না। উদ্বিগ্ন হতে গিয়ে দেখলো—সে আদৌ সে-সব কিছু হচ্ছে না।

সন্ধ্যের মুখে মুখে ভি. আই. পি রোড্ আগাগোড়াই কুয়াশার গলি। মারকারি ল্যাম্পের নিচে ভুতুড়ে গাড়িগুলো এয়ারপোর্টে যাচ্ছিল। কলকাতা পাড়ি দিচ্ছিল।

নতুন এয়ারপোর্ট হোটেলটাকে গাড়ির জানলায় বসে রজনীর অবিশ্বাস্য দেশলাই বাক্স লাগলো।

বাঁয়ে ইণ্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের ট্রানজিট লাউঞ্জ, কাস্টমস্, এক্সচেঞ্জ কাউণ্টার। ডাইনে ডোমেস্টিক ফ্লাইটের একটা প্লেন আকাশে উঠলো এইমাত্র।

সারাটা পথই গাড়ি থামাতে থামাতে যেতে হচ্ছিল এক সময় রজনী ক্ষেপে বলল, 'গাড়ি থামাও। এটুকু আমি হেঁটে যাবো।'

বিশ্বনাথ বললো, 'পাগলামো করছো কেন দিদি। আজ তো সব গাড়ি চেক করে ছাড়বে।'

—'কেন?'

—'প্রাইম মিনিস্টার মরিশাস যাচ্ছেন। সিকিউরিটি চেক করবে না?'

—'ওঃ!' বলে রজনী থেমে গেল। ডোমেস্টিক টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল—প্রধানমন্ত্রীর দেখা পেতে শীতের এই সন্ধ্যেতেও রাস্তার দুধারে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। একবারটি শুধু চোখের দেখা।

—'প্রাইম মিনিস্টার কখন যাবেন?'

—'তা তো জানিনে।' বলে লালুকে ধমকালো 'পেছনের ডিকটা খুলে দে।'

লালু এসে খুলে দিতেই চাকা লাগানো পলকা ট্রলিতে কুলিরা বাক্স দুটো বসিয়ে দিয়ে ঠেলতে লাগলো।

একদিন প্রধানমন্ত্রী তাঁর কবিয়াল দেখতে এসেছিলেন। কথাছিল, অল্পক্ষণ থাকবেন। কলকাতায় এলে প্রধানমন্ত্রী প্রোগ্রামে ডুবে থাকেন। কিন্তু এতই ভালো লেগেছিল তার অভিনয়—প্রধানমন্ত্রী শেষ সিনের ড্রপ অব্দি বসেছিলেন। সেই শোয়ের পরেই করিডরে অমিয়র সঙ্গে দেখা। এইতো সেদিনের কথা। হাত তুলে ট্যাক্সি থামালো রজনী। তখনো মেকআপ তোলা হয়নি মুখ থেকে। অমিয়দের শো ছিল সেদিন। সেই বিকেলেই। ফেরিওয়ালার মৃত্যু। ত্রয়োদশ রজনী! থার্টিন্থ নাইট। সব মনে আছে রজনীর। ট্যাক্সির জানলায় বসে অমিয়র হাতে চারশো টাকা গুঁজে দিয়েছিল।

পায়ে কি লাগতে চমকে নিচের দিকে তাকালো রজনী। লালু তার পায়ে হাত দিয়ে সে-হাত মাথায় ঠেকালো।

—'থাক। হয়েছে।' বলে ধোঁয়াশায় বুজে আসা রাস্তাটার দিকে তাকালো রজনী। বেশি দূর দেখা যায় না। ভারি শীত নেমে এসে মারকারি ল্যাম্পগুলোকে চটকে চ্যাপ্টা করে ফেলেছে।

আরও তো একখানা গাড়ি আছে পঞ্চমুখের। এতক্ষণেও আসার সময় হল না অমিয়র। এয়ারপোর্টের রাস্তায় মারকারি ল্যাম্পের নকলে রজনীর চোখ দু'টোও ঝাপসা হয়ে এল।

হাত ঘড়িতে যখন ছ'টা চল্লিশ—তখন টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের সিলিং থেকে মাইক চেঁচাতে লাগলো। সবকথা রজনীর কানে যায় নি। ওর ভেতর শুধু এটুকু শুনতে পাচ্ছিল—ডি এল থার্টিওয়ান।

প্যাসেঞ্জাররা ঘেরা ঘরটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বিশ্বনাথও যাচ্ছিল। রজনী দাঁড়িয়ে পড়লো। লজ্জার মাথা খেয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলো। কোথায় অমিয়! ভোঁ ভাঁ। এই রুটে চা-বাগানের দোআঁশলা ম্যানেজার সাহেবরা তাদের মেম নিয়ে খুব যাতায়াত করে। অনেকবার বাগডোগরা হয়ে নর্থ বেঙ্গলে—ডুয়ার্সে সুজাতার শো করতে অমিয়র সঙ্গে প্লেনে যেতে হয়েছে রজনীর। ওই দিশী সাহেব মেম অনেক দেখেছে সে। সেরকমই দু'চারটি টেস্থ হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছিল। পাছে বিশ্বনাথ তাকে না দেখে থেমে পড়ে—তাই রজনী বেশ ছুটেই এগিয়ে গেল। এখানে কেউ তাকে চিনবে না। সে খোলাখুলি হাত তুলে চোখ রগড়ে মুছে নিল।

ঠিক এইসময় অমিয় শশাঙ্কর বেডের কাছ থেকে সরে এল। আজ শো নেই

বলে অনেকদিন পরে দুপুরে দোর আটকে ঘুমিয়ে ছিল। দরজার বেধড়ক কড়া নাড়া শুনে প্রায় লাফিয়ে এসেছিল অমিয়। কার্শিয়াংয়ের কোন খবর নেই।

হয় পিয়ন লীলার চিঠি নিয়ে এসেছে। কিংবা ছেলেমেয়েসুদ্ধ লীলা নিজেই এসে হাজির হয়েছে। আর তো দু'একদিনের ভেতর অ্যানুয়াল শুরু হবে। হয়তো তাকে দেখবে বলে অস্থির হয়ে ছোটো মেয়েটাই কড়া নাড়ছে। দরজা খুলেই ওকে কোলে তুলে নেবে ঠিক করলো অমিয়। পারলে ওকে গাড়িতে বসিয়ে সন্ধ্যের ঝোঁকে একবারটি এয়ারপোর্টে ঘুরে আসবে খানিকক্ষণের জন্যে।

দরজা খুলতে হাঁটু অব্দি পট্টি বাঁধা একজন পুলিশ অমিয়র হাতে একখানা খাম দিয়ে পিওনবুক সই করালো। ক্ষয়ে আসা ছোটো ভোঁতা পেন্সিলটা তার হাত দিয়ে ফসকে যাচ্ছিল।

খাম খুলে দেখলো, পুলিশ হাসপাতালের মেসেজ। শশাঙ্ক দত্ত ভালো নেই।

কাঁচা ঘুমে জেগে উঠে অমিয়রও ভালো লাগছিল না। এখন যদি ফোন করে রজনীকে জানায়—তাহলেও সে শশাঙ্ককে দেখতে যাবে না। মাঝখান থেকে এই ফল হতে পারে– টেনশনে থেকে রজনী তার বাইরে যাওয়া বাতিল করে দিয়ে বসতে পারে। তাই—

কাকে আর বলবে অমিয়। একা একাই হাসপাতালে এসেছিল। এসে শুনেছে শশাঙ্কর মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসছে। আর তখনই দু'দফায় দু'বার অকসিজেনের নল ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখেও দেখলো, অ্যাটেণ্ডাণ্ট বেহুঁশ শশাঙ্কর দু'খানা হাতই হসপিটাল কটের রেলিংয়ে বেঁধে দিয়েছে। শশাঙ্ক তখন চোখ বুজে নিজের বুকের ভেতরে নেমে পড়ে অন্ধকারে একটা লড়াই লড়ছিল। একা একা। স্থির হয়েও আসছিল একটু একটু করে।

শশাঙ্কর বেড থেকে সরে বাইরে এসে অমিয় অনেকদিন পরে যার মুখোমুখি হল—সে শংকর। অমিয়কে দেখে বলল, 'দিদি জানে?'

—'না। জানলেও কি আসতো? তুমি তো সবই জানো।'

—'তবু এইসময় একটা খবর দিতে হয় দিদিকে—'

—'খবর। কাকে খবর দেবে? রজনী তো এখন প্লেনে—'

প্রথমে অমিয়—একটু পরেই শংকর—দু'জন ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় টানা সিমেণ্টের বেঞ্চে পাশাপাশি পা ঝুলিয়ে বসলো। অনেকটা পঞ্চমুখের কাউণ্ডার মেম্বারদের মত।

রজনী কিন্তু তখনো প্লেনে ওঠে নি। টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের মাইক কিছুক্ষণ

অন্তর অনেক কথার ভেতর একটা কথাই বারবার বলছিল। ডি এল থার্টিওয়ান। থার্টিওয়ান। থার্টিওয়ান। নাইন্টিন টোয়েন্টি আওয়ার্স—

একটি মেয়ে এইমাত্র তার সারা গা তল্লাশি করেছে। আগেকার দিন হলে রজনী হেসে ফেলতো। তাকে কি স্মাগলার কিংবা হাইজ্যাকারদের মত দেখতে লাগে। সবই রজনীর দীর্ঘ লাগছিল। বিশেষ করে মেয়েটির তল্লাশির ভঙ্গী। ওর তাকাবার কায়দাটা নন্দনার মত।

এবার রজনী যেখানে এসে দাঁড়ালো—তার সামনেই রানওয়ে। দূরে দু'তিনটে ঢাউস প্লেন দাঁড়িয়ে। নীল, লাল আলো। চাকা লাগানো গ্যাংওয়ে ঠেলে ঠেলে ক'জনে মিলে প্লেনের দরজায় গিয়ে লাগালো।

সামনের কোলাপসিবল্ গেট তখনো খোলা হয় নি। তার ওপাশেই চকচকে বাস প্যাসেঞ্জারদের জন্যে দাঁড়িয়ে। গেট খুললেই সবাইকে নিয়ে গ্যাংওয়ের সিঁড়ি অব্দি পৌঁছে দেবে।

মাইক আবার বলল, ডি এল থার্টিওয়ান। নাইন্টিন টোয়েন্টি আওয়ার্স—আরও কি সব বলল।

এখন এসে পৌঁছলেও অমিয়কে এখানে আসতে দেওয়া হবে না। ট্রানজিট লাউঞ্জ থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় না। মাঝখানে কয়েকটা দেওয়াল। ইচ্ছে করলে বড়জোর অমিয় এখন তার ফাইটের প্লেনকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে আকাশে উঠতে দেখতে পারে। কিন্তু সেটা যে দিল্লির প্লেন বুঝবে কি করে অমিয়।

রজনী জানে—অমিয় আসেনি। এলে অনেক আগেই সে এসে দেখা করতো। এই শীতের ভেতর অ্যাকিউট ফেনিনজাইটিস নিয়ে রজনী আবু অব্দি যেতে রাজি ছিল না কিছুতেই। বরং কোন হট স্প্রিং কিংবা সমুদ্রের ধারে। যেখানে শীত কখনো তেমন নয়।

শুধু অমিয়র কথাতেই। দূরে গেলে নাকি কলকাতা তাকে ধরতে পারবে না। আর আবুর বাছাই গেস্ট হাউসে সাবধানে থাকলে—সে তো আর যে-কোন জায়গার মতই নিরাপদ। সঙ্গে বিশ্বনাথ থাকছে—চিন্তা কিসের।

আমার জন্যে এত চিন্তা তোমার—অথচ তুমি এলে না অমিয়। রজনী চোখ বুজে চেপে বললো। খোলা রানওয়ের ওপর দিয়ে হিমেল বাতাস ছুটে এসে এখানে ঢুকে পড়ছিল।

নিশ্চয় রিহার্সেলের নামে নন্দনা অমিয়কে আটকে ফেলেছে বিকেলের দিকে এই একটা দিন নন্দনা তুই ওকে ছেড়ে দিলে পারতিস।